কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট

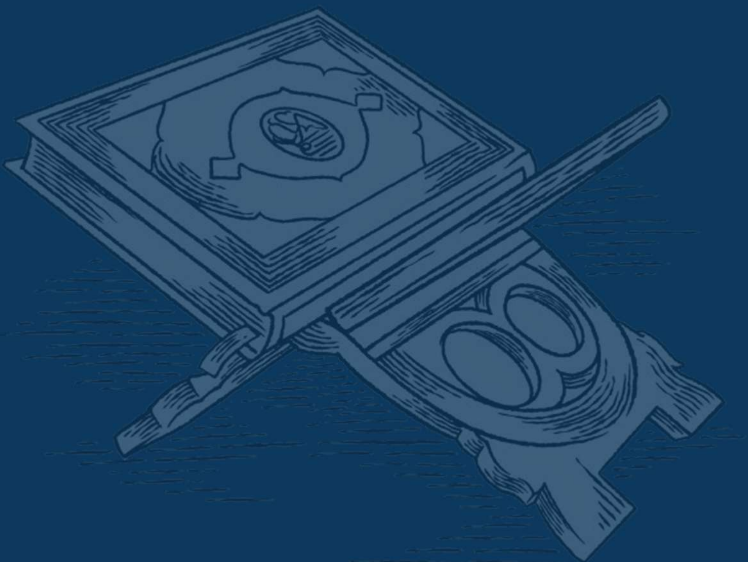

মাউন ফাউন্ডেশন

সূচীপত্র

নোট-১: উলুমুল কুরআন	৪
নোট-২: ইলমুত তাজওঈদ	৭
নোট-৩: লুগাতুল কুরআন	১০
নোট-৪: সূরা আলাক্ব	১১
নোট-৫: সূরা তীন	২১
নোট-৬: সূরা ইনশিরাহ	২৯
নোট-৭: সূরা দোহা	৩৬
নোট-৮: সূরা লাইল	৪৪
নোট-৯: সূরা শামস	৫৫
নোট-১০: সূরা বালাদ	৬৪
নোট-১১: সূরা মূলক ১-১৪ আয়াত	৭৬
নোট-১২: সূরা মূলক ১৫-৩০ আয়াত	৮৭
নোট-১৩: সূরা মুনাফিকুন	৯৪
নোট-১৪: সূরা যুমার ১-৯ আয়াত	১০৯
নোট-১৫: সূরা যুমার ১০-২১ আয়াত	১২২
নোট-১৬: সূরা যুমার ২২-৩১ আয়াত	১২৮
নোট-১৭: সূরা আম্বিয়া ৭৬-৮২ আয়াত	১৩৭
নোট-১৮: সূরা আম্বিয়া ৮৩-৯৩ আয়াত	১৪৬
নোট-১৯: সূরা আলে ইমরান ১০-২০ আয়াত	১৫৯
নোট-২০: সূরা আলে ইমরান ১৩০-১৪৩ আয়াত	১৭১
নোট-২১: সূরা বাকারাহ- ২৭৪-২৮১ আয়াত	১৮১
নোট-২২: সূরা বাকারাহ- ২৮২-২৮৩ আয়াত	১৯২
নোট-২৩: সূরা বাকারাহ- ২৮৪-২৮৬ আয়াত	১৯৯
নোট-২৪: সূরা ফাতিহা	২০৬

ভূমিকা

একটি আর্দশিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন নিয়ে কুরআন এসেছে। এই কুরআন বুঝার ও অধ্যয়ন ব্যাপারে বেশিভাগই মানুষ গাফিল। কুরআন তিলাওয়াত আমরা প্রায় সময় করে থাকলেও কুরআন অধ্যয়ন অনেক সময় হয়ে উঠে না। কুরআন অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা ও কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির দৃঢ় আকাংখা থাকেই সম্ভব নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করা। কুরআন অধ্যয়নের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আমাদের কর্মসূচী - **কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা।**

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতার কিছু অর্জন হলো-

• বিগত দুই বছরে প্রায় ৫ হাজার কুরআন প্রেমী মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন।

• কুরআন বুঝা কতটা সহজ ও উপভোগ্য তা আমরা সফলতার সাথে তুলে ধরতে পেরেছি।

• ৫টি তাফসীরের সমন্বয়ে আমরা নোট করে প্রদান করেছি যার থেকে সবাই খুব বেশী উপকৃত হয়েছেন।

• অনুবাদ, তাফসীর, নামকরণ, ফুটনোট, সূরাগুলো পারস্পারিক সম্পর্ক ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক আমরা একটি স্যান্ডার্ড ফরমেট দিয়েছি কুরআন অধ্যয়নের জন্য।

• বাছাইকৃত সূরা ও আয়াত দিয়ে সিলেবাস তৈরী করার কারণে কুরআন অধ্যয়নে আগ্রহী করতে পারছি পিপাসার্ত কুরআন প্রেমীদের।

• সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো শুধুমাত্র সময় অপচয় না করে কিভাবে এর উত্তম ব্যবহারে জ্ঞানার্জনের উপায়ে ব্যবহার করা যায় এই উদাহরণ স্থাপন করেছে- কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা।

রামাদান মাস এক মহা সুযোগ। তাই রামাদান মাসে ঘিরে আমাদের আয়োজন- কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা। আমরা চেষ্টা করছি এমন একটা প্ল্যার্টফর্ম দিতে যাতে কুরআন অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং এটি পরিণত হয় অভ্যাসে। আমরা প্রতি রামাদানেই এমন আয়োজন করে থাকি। তারই ধারাবাহিকতায়- বিগত প্রতিযোগিতার সাড়া, আগ্রহ এবং উচ্ছ্বাস দেখে আমাদের মনে হয়েছে আমাদের আয়োজন বিফলে যায় নি। কুরআন অধ্যয়নের তৃষ্ণা মানুষের মধ্যে আছে। একটু মোটিভেশন, গাইডলাইন এবং সহযোগিতা পেলে নিয়মিত কুরআন অধ্যয়নে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। তাই প্রতিবারের ন্যায় ২০২৩ সালেও ভিন্ন সিলেবাস নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে- **'কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা-২০২৩'**

প্রতিযোগীদের অধ্যয়ন সহজ করে দিতে এবং রিসোর্স সমস্যা কাটিয়ে উঠতে আমরা তৈরী করে দিয়েছি **'প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট'।** প্রস্তুতি সহায়ক এই নোট তৈরী করতে তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে যাকারিয়া, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, তাফহীমুল কুরআন, তাফসীরে আহসানুল বায়ান, ফাতহুল মাজীদ, তাফসীরে জালালাইন সহ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে হুবহু তথ্য নেওয়া হয়েছে। আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে রেফারেন্সগুলো সঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারি পারিনি এজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এছাড়াও বিভিন্ন ভাই-বোনের তৈরী করা দারস/নোট এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্ব-১

উলুমুল কুরআন বা কুরআন বিষয়ক মৌলিক জ্ঞান

সাত হরফ, সাত কেরাআত ও সাত কারী-

কুরআন প্রথমে আরবীতে কুরাইশদের আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল হচ্ছিল, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ(সা.) একাধিক উপায় কুরআন পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এর প্রেক্ষিতে কুরআন সাত হরফে নাযিল হতে থাকে।

কুরআন মাজীদের কালেমাগুলো উচ্চারণ ও তা আদায়ের সঠিক পদ্ধতিকে কেরাআত বলে। সাত কেরাআত বলতে প্রসিদ্ধ সাত জন কারীর প্রতি সম্পর্কিত কেরাআতকে বুঝায়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেন, "জিব্রাইল (আঃ) আমার কাছে এক হরফে কুরআন তিলাওয়াত করলেন, আর আমি তাকে ভিন্ন ভিন্ন হরফে তিলাওয়াত করতে বলতে লাগলাম যতক্ষণ না, তিনি সাতটি ভিন্ন হরফে তিলাওয়াত করলেন।" [সূত্র: সহিহ বুখারি, ৩২১৯]

কিরাতের বিখ্যাত সাত ইমামদের নাম নিম্নরুপঃ-

১. নাফে মাদানী (র.)
২. ইবনে কাছীর (র.)
৩. আসিম কুফী (র.)
৪. হামযা বিন হাবীব আল কুফী (র.)
৫. আলী বিন হামযা আল কিসাঈ (র.)
৬. আবূ আমর আল মাযিনী (র.)
৭. ইবনে আমির আশ শামী (র.)

তাফসীরের উৎস

১. আল কুরআনুল কারীম
২ আল হাদীস
৩. সাহাবায়ে কেরামদের মতামত।
৪. তাবেয়ীনদের মতামত।
৫. আরবী ভাষা।
৬. ইজতেহাদ/ *আক্বলে সালিম (শান্ত ও পরিশুদ্ধ বিবেক বুদ্ধি)*

তাফসীরের শর্ত

তাফসীরের শর্ত বলতে বুঝায় যিনি তাফসীর করবেন তার কি কি জিনিস জানা থাকতে হবে।

কুরআনের তাফসীর বিষয়ের পণ্ডিতগণ কুরআনের ব্যাখ্যা করতে ও এর তাফসীর করার জন্য পনের প্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া জরুরী ।

১। ইলমুল লুগাহ (علم اللغة) ভাষা জ্ঞান।
২। ইলমুস সরফ (علم الصرف) আরবী শব্দ প্রকরণ সম্পর্কীয় জ্ঞান।
৩। ইলমুন নাহু (علم النحو) আরবী বাক্য প্রকরণ সম্পর্কীয় জ্ঞান।
৪। ইলমুল ইশতিকাক (علم الاشتقاق) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত জ্ঞান।
৫। ইলমুল মা'আনী (علم المعانى) শাব্দিক অলংকরণ।
৬। ইলমুল বয়ান (علم البيان) বাক্য প্রয়োগ অলংকরণ।
৭। ইলমুল বদী (علم البديع) ছন্দ প্রয়োগ অলংকরণ।
৮। ইলমুল কিরাআত (علم القرأة) আল কুরআন পঠনরীতি জ্ঞান।
৯। উছুলুদ্দীন (علم اصول الدين) দীনের মৌলিক ভিত্তি ও মূলনীতির জ্ঞান।
১০। উসুলুল ফিকহ (علم اصول الفقه) ফিকহের মূলনীতির জ্ঞান।
১১। আসবাবুন নুযূল ওয়াল কাসাস (اسباب النزول و القصص) সুরা ও আয়াত সমূহ নাযিল হওয়ার কাল-প্রেক্ষিত, কারণ ও ঘটনাবলীর সম্পর্কীত জ্ঞান।
১২। আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ (الناسخ و المنسوخ) রহিতকারী আয়াত ও রহিত আয়াত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ।
১৩। ইলমুল ফিকহ (علم الفقه) আইন বিষয়ক জ্ঞান।
১৪। উলুমুল হাদীস (علوم الحديث) হাদীস সম্পর্কীয় জ্ঞান।
১৫। ইলমুল মাওহাবাহ (علم الموهبة) আল্লাহ প্রদত্ত সরাসরি জ্ঞান যার অপর নাম ইলমুল লাদুন্নী (علم اللدنى)

তাফসীর গ্রন্থের প্রকারভেদঃ

পৃথিবীর সকল তাফসীর গ্রন্থকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়;

১। তাফসীর বির-রিওয়ায়াহ বা তাফসীর বিল-মা'ছুর; (অর্থাৎ তাফসীরের মূলনীতি অনুসরণ করে যে সকল তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়)

২। তাফসীর বিদ-দিরায়াহ বা তাফসীর বির-রায়। (অর্থাৎ তাফসীরের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে কিংবা নব উদ্ভাবিত কোনো পদ্ধতি অনুযায়ী যে সকল তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়)

সত্তাগত দিক থেকে তাফসীর চার প্রকার । যথা:

০১. যে তাফসীর সকলের জন্য জানা ফরজ বা আবশ্যক ।

০২. যে তাফসীর আরবীভাষি ব্যক্তিবর্গ সাধারণভাবে জানেন ।

০৩. যে তাফসীর আলিমগন বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ জানেন ।

০৪. যে তাফসীর আল্লাহ ব্যতিত আর কেউ জানেন না ।

প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কয়েকটি তাফসীর গ্রন্থ

সাহাবাদের পরবর্তী যুগ সমূহে তাফসীরের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এককভাবে বেশকিছু তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়।

১। জামিউল বায়ান ফী তাফসিরুল কুরআন: আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারি (মৃত্যু ৩১০ হি:) এটি "তাফসীর আত-তাবারী" নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে যেসকল তাফসীর বিদ্যমান রয়েছে, তন্মধ্যে এই তাফসীরটি সবচেয়ে প্রাচীন।

২। আল-মুহাররার আল-ওয়াজিয: ইবনে আতিয়া (মৃত্যু ৫৪০ হি:) এটি "তাফসীর ইবনে আতিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। ২০ খন্ডে রচিত গ্রন্থটির তাফসীরে সঠিক পদ্ধতি অনুসারে রচিত হয়েছে।

৩। বাহরুল উলূম: আবু লাইস সামারকান্দী (মৃত্যু ৩৭২ হি:) এটি চার খন্ডে রচিত, "তাফসীরে আবু লাইস সামারকান্দী" নামে প্রসিদ্ধ।

৪। আল-কাশফু ওয়াল বায়ান আন তাফসিরুল কুরআন: ইমাম আবু ইসহাক (মৃত্যু ৪২৭ হি:) এটি "তাফসীরে আবূ ইসহাক" নামে প্রসিদ্ধ

৫। মা'আলিমুত তানযীল: ইমাম বাগাবী (মৃত্যু ৫১০ হি:) এটি "তাফসীরে বাগাবী" নামে প্রসিদ্ধ।

৬। তাফসীরুল কুরআনুল আযীম: ইমাম ইবনে কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হি:) এটি "তাফসিরে ইবনে কাসির" নামে প্রসিদ্ধ।

৭। আল জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসিরুল কুরআন: ইমাম সা'লাবী (মৃত্যু ৮৭৭ হি:) এটি "তাফসীরে সা'লাবী" নামে প্রসিদ্ধ।

৮। আদ-দুররুল মনসূর ফী তাফসিরুল বিল-মা'ছূর: জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১০ হি:) এটি "আদ-দুররুল মনসূর" নামে প্রসিদ্ধ।

৯। ফাতহুল কাদীর: ইমাম আশ-শাওকানী (মৃত্যু ১২৫৫ হি:) এটি "তাফসির আশ-শাওকানী" নামেও পরিচিত।

১০। তাফসীরে ইবনে আব্বাস: এ তাফসীরটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র:) নিজে কিংবা তাঁর ছাত্ররা কেউ সংকলন করেননি। বরং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র:) থেকে বিভিন্ন রেওয়াতের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেগুলোকে সংকলন করে, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব ফিরোজাবাদী (মৃত্যু ৮১৭ হি:) "তাফসীরে ইবনে আব্বাস" নামে তাফসীর গ্রন্থটি রচনা করেন।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্ব-২
ইলমুত তাজওঈদ

তাজওঈদ

আভিধানিক অর্থ : তাহসিন التحسين । অর্থাৎ কোনো কিছু শুদ্ধ ও সুন্দর করা।

পারিভাষিক অর্থ: কুরআনের প্রতিটি হারফকে তার যথাযথ হক আদায় করে মাখরাজ ও সিফাত ঠিক রেখে সঠিক ও শুদ্ধ নিয়মে উচ্চারণ করাকে তাজওইদ বলে।

হুকুম: সামর্থ্যানুযায়ী তাজওইদসহ তিলাওয়াত করা প্রত্যেক মুসলিম ও মুসলিমার জন্য ফরজে আইন।

উদ্দেশ্য : পবিত্র কুরআনুল কারিম সঠিক ও শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে শেখা।

কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন।
১. তারতীল ২. হদর এবং ৩. তাদবীর।

১. তারতীল: মদ ও গুন্নাহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, ধীর- স্থীরে কোরআন মজীদ পড়াকে তারতীল বলে।
২. হদর: তাজবীদের নিয়ম কানুন রক্ষা করে, একটু দ্রুত কোরআন মজীদ পড়াকে হদর বলে।
৩. তাদবীর: তারতীল এবং হদরের মাঝামাঝি ধরনের পড়াকে তাদবীর বলে।

লাহন
তাজবীদের বিপরীত কোরআন মজীদ পড়াকে লাহন বলে। উহা দুই প্রকার:
১) লাহনে জালী (বড় ভুল)
২) লাহনে খাফী (ছোট ভুল)

১) লাহনে جلي জালী বড় ভুল হলো- প্রকাশ্য ভুল- যা সাধারণ মানুষ এবং কুরআনের আলিম সকলেই বুঝতে পারেন। যথা- :

১) এক হরফের জায়গায় অন্য হরফ পড়া।
২) কোন হরফকে বাড়িয়ে দেয়া।
৩) কোন হরফকে কমিয়ে দেয়া।
৪) যের, যবর, পেশ এবং জযম থেকে একটিকে অপরটির জায়গায় পড়া। এ জাতীয় মারাত্মক ভুলসমূহকে লাহনে জালী বলে। লাহনে জালী পড়া হারাম। অনেক জায়গায় লাহনে জালীর কারণে অর্থ বিকৃত হয়ে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়।

২) লাহনে خفي খফী ছোট ভুল হলো- তিলাওয়াতের সৌন্দযের্র বিষয়ে ভুল করা বা উচ্চারণ করার নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের বিপরীত পড়াকে লাহনে খাফী বলে। যথা- ر কে তাকবীর করে পড়া এবং হরকতের স্থানে থামা ইত্যাদি। এ রকম পড়া মাকরুহ; তাই এ থেকেও বেচে থাকা উচিৎ।

■ **ওয়াজিব গুন্নাহঃ** ن এবং م বর্ণের উপর তাশদীদ (ّ) থাকলে বাংলা চন্দ্র বিন্দুরমত গুন্নাহ করে পড়াকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। ওয়াজিব গুন্নাহ না করলে কবীরা গুনাহ হয়। যেমনঃ إن الله

নুন সাকিন ও তানবীন

■ **নুন সাকিনঃ** যে নুনের উপর যযম থাকে তাকে নুন সাকিন বলে।

■ **তানবীনঃ** দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ কে তানবীন বলে।

■ **নুন সাকিন ও তানবীন পড়ার নিয়ম চারটিঃ**

১. ইযহারঃ নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইজহারের ছয় হরফের (ء ه ع ح غ خ) কোন একটি আসলে ঐ নুন সাকিন ও তানবীনকে গুন্নাহ ব্যতিত স্পষ্ট করে পড়তে হয়। যেমনঃ من أجل

২. ইক্বলাবঃ নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইক্বলাবের হরফ (ب) আসলে তখন ঐ নুন সাকিন ও তানবীনকে ( ) م দ্বারা পরিবর্তণ করে পড়তে হয়। যেমনঃ من بعد

৩. ইদগামঃ নুন সাকিন ও তানবীনকে ইদগামের বর্ণের সহিত মিলিয়ে পড়তে হয়।

■ **ইদগাম দুই প্রকার। যথাঃ**

১. ইদগামে বা গুন্নাহঃ নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামে বা গুন্নাহর চার হরফের (ى ن و م) কোন একটি আসলে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ من يشاء

২. ইদগামে বেলা গুন্নাহঃ ইদগামে বেলা গুন্নাহর দুই হরফের (ل ر) যে কোন একটি আসলে গুন্নাহ ব্যতিত মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ من ربهم

৪. ইখফাঃ নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইখফার ১৫ হরফের যে কোন একটি আসলে উহাকে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। ইখফার হরফঃ ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

মীম সাকিন

■ **মীম সাকিনঃ** যে মীমের (م) উপর সাকিন/যযম (ْ) থাকে তাকে মীম সাকিন বলে।

ইহা পড়ার নিয়ম তিনটিঃ

১. ইখফাঃ মীম সাকিনের পর যদি ب হরফ থাকে তখন উহাকে গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

২. ইদগামঃ মীম সাকিনের পর যদি মীম থাকে তবে উভয় মীমকে গুন্নাহ সহ পড়তে হয়।

৩. ইযহারঃ ب ও م ব্যতীত বাকী ২৭ বর্ণের যে কোন একটি বর্ণ যদি মীম সাকিনের পর থাকে তবে তাকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়তে হয়।

ওয়াকফর চিহ্নসমূহেহের বিবরণ

[ط] - এই চিহ্ন কে 'ওয়াকফে মতলাক্ব' বলে । এই চিহ্নিত স্থানের ওয়াকফ করা উত্তম, ওয়াক্ফ নাকরা ভাল নহে। য়াকফ করা না করা উভয় জায়েজ, তবে ওয়াক্ফ করা ভাল।

[ز] এই চিহ্ন কে 'ওয়াক্ফে মুজাওয়ায' বলে। এইরূপ স্থানে ওয়াকফ করা না করা উভয় জায়েজ, তবে, না করা ভাল।

[ص]- এই চিহ্ন কে 'ওয়াকফে মুরাখখাস' বলে। এই রুপ স্থানে ওয়াক্ফ না করিয়া পরের শব্দের সহিত মিলাইয়া পড়া ভাল। কিন্তু নিঃশ্বাস শেষ হইয়া গেলে ওয়াক্ফ করা যায়।

[قف]- এই চিহ্নকে 'ওয়াক্ফে আমর' বলে। ইহা ওয়াক্ফ করার জন্য নির্দেশ করে।

[م]-এই চিহ্ন কে ' ওয়াকফে লাযেম' বলে। এই م চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ না করিলে বিপরীত অর্থ হইয়া যাইতে পারে। তাই ওয়াকফ করা অবশ্যই দরকার।

[لا] - এই চিহ্নে ওয়াকফ করা নিষেধ।

[ج] - এই চিহ্নে ওয়াকফ করা জায়েজ। ইচ্ছা হলে ওয়াকফ করবে না করলেও সমস্যা নেই।

[صلے] - এই চিহ্নের নাম ওয়াকফ সিলা। এই চিহ্নে ওয়াকফ করার পর আবার তিলাওয়াত শুরু করলে আগের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করতে হবে।

[قلے]- এই চিহ্নের নাম ওয়াকফ ক্বিলা। ওয়াকফ করার পর আবার তিলাওয়াত শুরু করতে চাইলে আগের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করবে, না হয় যেখানে ওয়াকফ করা হয়েছে তার পর থেকে শুরু করবে।

[س]- এই চিহ্ন দুই জায়গায় থাকে। একটি থাকে আয়াতের ওপর দুই শব্দের মাঝখানে। এর অর্থ সাকতাহ। অর্থাৎ এমন চিহ্নে নিঃশ্বাস না ফেলেই চুপ থেকে আবার তিলাওয়াত শুরু করতে হবে।

[۩] সিজদাওয়ালা আয়াতে এই চিহ্ন থাকে।

[ۛ - ۛ] এই চিহ্নগুলোর মাঝে যেকোনো একটায় ওয়াকফ করতে হবে। দুইটাতে করা যাবে না।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্ব-৩
লুগাতুল কুরআন

কুরআনে সর্বাধিক ব্যবহৃত কিছু শব্দার্থ

لَا	না, নয়, নেই	إِلَّا	তাছাড়া
إِنَّ	নিশ্চয়ই	إِلَى	দিকে
الَّذِي	যা, যে/যিনি, তিনি	الَّذِينَ	যারা
فِي	মধ্যে	مِنْ	হতে, থেকে
قَالَ	বলা	عَلَى	উপরে
أُولَٰئِكَ	ঐ সকল, তারা	ثُمَّ	অতঃপর
ذَٰلِكَ	তা	حَمْدٌ	প্রশংসা
عَذَابٌ	শাস্তি	خَيْرٌ	উত্তম/ভালো
نَارٌ	আগুন	قَوْمٌ	জাতি
يَوْمٌ	দিন	مَالٌ	সম্পদ
كِتَابٌ	বই	فَضْلٌ	অনুগ্রহ
مَلَكٌ	ফেরেশতা	اَرْضٌ	পৃথিবী
سَبِيلٌ	পথ	كَثِيْرٌ	অনেক
أَحَدٌ	এক	حَقٌّ	হক
سَمَاءٌ	আকাশ	عَالَمِيْنَ–عَالَم	মহাবিশ্ব

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৪

সূরা আলাক্ব

আল আলাক্ব কুরআনের ৯৬ তম সূরা। সূরা আলাক্বের আয়াত সংখ্যা ১৯। এতে একটি রূকু রয়েছে। সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আলাক শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। আলাক্ব অর্থ জমাটবাঁধা রক্ত।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরাটির দু'টি অংশ । প্রথম থেকে পঞ্চম আয়াত আর দ্বিতীয় অংশটি ৬ষ্ঠ থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহী এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলেম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ ,বুখারী ,মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা)থেকে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য । এ হাদীসে হযরত আয়েশা নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ওহী শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ইবনে আব্বাস (রা) ,আবু মূসা আশ'আরী (রা) ও সাহাবীগণের একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে ,রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের এই আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল । আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হারম শরীফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু

সূরাটিতে চারটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এক- মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টি কৌশল বর্ণনা (*১-২ আয়াত*)। দুই- পড়া ও লেখার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন কৌশল শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে মানুষের উপর আল্লাহ যে বিরাট অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তার বর্ণনা (*৩-৫ আয়াত*)। তিন- অগণিত নে'মত পেয়েও মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা করে, যার পরিণতি হয় জাহান্নাম (*৬-১৮ আয়াত*)। চার- পাপীদের আনুগত্য না করে আল্লাহর প্রতি অনুগত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(১৯ আয়াত)*।

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের ৯৫ নং সূরা আত ত্বীন এ আল্লাহর নবীদের বড়ত্বের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ১-৩) আর ৯৬ নং সূরা আল আলাক্ব এ আল্লাহর বড়ত্বের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৩)। সূরা আত ত্বীন এ মানুষকে উত্তম করে সৃষ্টি করা হয়েছে তা বর্নিত হয়েছে (আয়াত ৪), সূরা আল আলাক্ব এ মানুষ যে উত্তম তাঁর নমুনা (শিক্ষাগ্রহন) বর্ননা করা হয়েছে (আয়াত ৪-৫)। ত্বীন এ মানুষকে নিচু থেকে নিচু স্তরে নামিয়ে দেওয়ার

বিষয়টি এসেছে আয়াত ৫ এ অন্যদিকে আলাক্ব এ নিচু থেকে নিচু স্তরে নেমে যাওয়ার কারন বর্নিত হয়েছে আয়াত ৬-১৪ তে। প্রথমে (আত্মিক) ঈমান ও পরে (দৈহিক) কাজ এর কথা এসেছে (আয়াত ৬) ত্বীন এ যার বিপরীতে প্রথমে (দৈহিক) কাজ ও পরে (আত্মিক) ঈমান এর কথা এসেছে আলাক্ব এ আয়াত ১৯ তে।

এই সূরা আল আলাক্ব এ আল্লাহর ওহি কিভাবে এসেছিলো তার বর্ননা আছে। পরের (৯৭ নং) সূরা আল ক্বদর এ ওহি কখন নাযিল হয়েছে তার বর্ননা এসেছে। সূরা আল আলাক্ব এবং সূরা আল ক্বদর; উভয়ই আল কুরআনের কথা দিয়ে শুরু হয়েছে। ৯৬ নং সূরায় পড়তে বলা হয়েছে, আর ৯৭ নং সূরায় কি পড়তে হবে তা বলা হয়েছে।

তাফসীর

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

১. পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন

এটাই সর্বপ্রথম অহী যা নবী (সাঃ)-এর উপর ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন তিনি হিরা গুহায় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। ফিরিশতা (জিবরীল) তাঁর নিকট এসে বললেন, 'পড়।' তিনি বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' ফিরিশতা তাঁকে জড়িয়ে ধরে শক্তভাবে চেপে ধরলেন এবং বললেন, 'পড়।' তিনি পুনর্বার একই উত্তর দিলেন। এইভাবে ফিরিশতা তিনবার করলেন।

اِقْرَأْঅর্থাৎ, যা আপনার প্রতি অহী করা হয়েছে তা পড়।

বান্দার প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় নে'মতটির অবতরণের সূচনা করা হ'ল তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহর পবিত্র নামে। এতে একথাও বুঝানো হ'ল যে, যে কোন শুভ কাজের সূচনা আল্লাহর নামে ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করতে হবে। অত্র আয়াতে আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহের মধ্য থেকে প্রধান দু'টি ছিফাত উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে সবাই মানে। যেমন তিনি বলে- 'আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তুমি বল সকল প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু ওদের অধিকাংশ কোন জ্ঞান রাখে না' (*লোকমান ৩১/২৫*)। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে মানলেও পালনকর্তা বা 'রব' হিসাবে মানতে অনেকে অস্বীকার করে। যেমন ফেরাঊন প্রকাশ্যে নিজেকে 'বড় রব' বলে দাবী করে বলেছিল, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى 'আমি তোমাদের বড় পালনকর্তা (*নাযে'আত ৭৯/২৪*)। সম্ভবতঃ সেকারণেই আল্লাহ প্রথমে 'রব' এবং পরে 'খালেক' ছিফাতটি এনেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বান্দাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, প্রকৃত 'রব' একমাত্র আমিই। আমিই তোমাদেরকে আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, পানি দিয়ে, খাদ্য-শস্য দিয়ে, রোগে আরোগ্য দান করে, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি দিয়ে দুনিয়ার এ মুসাফিরখানায় লালন-

পালন করে থাকি। আমার এ পালনকার্যে আমি একক। আমার কোন শরীক নেই। রুবূবিয়াতের সকল ক্ষমতা কেবলমাত্র আমারই হাতে।

এই আয়াতে শুধু বলা হয়েছে , "সৃষ্টি করেছেন।" কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি স্রষ্টা , যিনি সমগ্র বিশ্ব - জাহান এবং বিশ্ব - জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে।

কুরআনে কোথাও মানুষকে 'শুকনো ঠনঠনে মাটি' থেকে *(রহমান ৫৫/১৪)*, কোথাও 'মাটির নির্যাস' থেকে *(মুমিনূন ২৩/১২)*, কোথাও 'পানি' থেকে *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)* সৃষ্টি বলা হয়েছে। এর দ্বারা সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বুঝানো হয়েছে। তবে মানব সৃষ্টির মূল উপাদান হ'ল 'মাটি' *(সাজদাহ ৩২/৭)*। তারপর তাতে পানি ঢেলে চটকানো কাদা *(হিজর ১৫/২৬)* বানানো হয়েছে। কিছুদিন পর ঠনঠনে শুকনো মাটি *(রহমান ৫৫/১৪)* হয়েছে। অতঃপর অবয়ব সৃষ্টি করে তাতে রূহ ফুঁকে দিয়ে তাকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করা হয়েছে *(ছোয়াদ ৩৮/৭১-৭২)*। অতঃপর আদম থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করে উভয়ের মিলনে মানব বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তোমাদের নানা পর্যায়ে সৃষ্টি করেছি' *(নূহ ৭১/১৪)*।

তিনি বলেন, 'হে মানবমন্ডলী! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো, (তাহ'লে একবার ভেবে দেখ) আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে ... *(হজ্জ ২২/৫)*। বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং মায়ের গর্ভে মানব সৃষ্টির একটি স্তর বর্ণিত হয়েছে মাত্র। যা সকলের বোধগম্য বিষয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু কাছ থেকে আসত, তাহ'লে এতে তারা অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত' *(নিসা ৪/৮২)*।

এখানে মানুষকে খাছ করার মাধ্যমে সকল সৃষ্টির মধ্যে তার মর্যাদাকে সমুন্নত করা হয়েছে। অতঃপর তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সেরা সৃষ্টি হ'লেও তুমি একথা ভুলে যেয়ো না যে, তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নিকৃষ্ট 'জমাট রক্তপিন্ড' হ'তে। 'জমাট রক্তপিন্ড' হ'ল মধ্যবর্তী অবস্থা। এর পূর্বে সে ছিল সূক্ষ্ম একটি পানি বিন্দু। পিতার শুক্রাণু ও মায়ের ডিম্বাণু যদি আল্লাহর হুকুমে মিলিত হয়, তবেই সেটা পরে রক্তবিন্দুতে পরিণত হয়। অতঃপর চার মাস বয়সে সন্তানের রূপ ধারণ করে এবং আল্লাহর হুকুমে তাতে রূহ আগমন করে। এখানে 'জমাট রক্ত' বলে সৃষ্টির পূর্বাপর অবস্থা সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টি কৌশল নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়। আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যাবলী উপস্থাপন করেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের মিলিত ব্যাখ্যায় একথা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য হবে স্রষ্টাকে জানা এবং তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহ অবগত হওয়া। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সেটাই যা খালেক্ব-এর জ্ঞান দান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক

জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সম্মুখে যদি অহি-র জ্ঞানের অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকে, তাহ'লে যেকোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে।

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

৩. পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত

এখানে পড়ার আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথম আদেশটি নিজে পাঠ করার আদেশ, আর দ্বিতীয়টি অন্যকে পাঠ করানো বা অন্যের নিকট প্রচারের নির্দেশ। অতঃপর মহান রব আল্লাহর সাথে أَكْرَم বিশেষণ যোগ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টি করা এবং তাদের শিক্ষাদান করার নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই; বরং এগুলো তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই দান। তিনি সর্বমহান দানশীল ও মহামহিমান্বিত।

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন

অর্থাৎ তাঁর অশেষ মেহেরবানী। এই হীণতম অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করেছেন এটি সৃষ্টি সবচেয়ে বড় গুণ হিসেবে স্বীকৃত। আর তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানের অধিকারীই করেননি , কলম ব্যবহার করে তাকে লেখার কৌশল শিখিয়েছেন। এর ফলে কলম জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার , উন্নতি এবং বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি ইলহামী চেতনায় সাহায্যে মানুষকে কসম ব্যবহার করার ও লেখার কৌশল না শেখাতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানগত যোগ্যতা স্তব্ধ ও পংগু হয়ে যেতো। তার বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার এবং বংশানুক্রমিক অগ্রগতি তথা এক বংশের জ্ঞান আর এক বংশে পৌঁছে যাবার এবং সামনের দিকে আরো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করার সুযোগই তিরোহিত হতো।

বিদ্বানগণ বলেন, কলম তিন প্রকার : এক- সর্বপ্রথম সেই কলম যাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেন এবং লেখার নির্দেশ দেন। দুই- ফেরেশতাদের কলম, যা আল্লাহ তাদের হাতে দিয়েছেন বান্দার আমলনামা ও সবকিছুর তাক্বদীর লেখার জন্য। তিন- মানুষের ব্যবহৃত কলম। যা আল্লাহ তাদের হাতে দিয়েছেন জ্ঞানার্জনের জন্য ও অন্যান্য কাজের জন্য।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা'আলা যখন প্রথম সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তার কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।” [বুখারী: ৩১৯৪, ৭৫৫৩, মুসলিম: ২৭৫১] হাদীসে আরও বলা হয়েছে, “আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে।

এতে বুঝা যায় যে, দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্র কলমের সাহায্যেই সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়। কলম আল্লাহ পাকের দেয়া এক অপূর্ব নে'মত। যা মানুষের মনের কথা অবলীলাক্রমে লিখে ফেলে। মনের সাথে কলমের এই সংযোগ, মনের কথা কলমে প্রকাশের ক্ষমতা, আল্লাহর দেয়া এমন এক অমূল্য নে'মত, যার কোন তুলনা নেই, যার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। যদি কলম না থাকতো, তাহ'লে দ্বীন-ধর্ম, সমাজ-রাষ্ট্র, আইন-আদালত, সাহিত্য-বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য কোন কিছুই ধরে রাখা সম্ভব হতো না। সবই বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যেত। কলম হ'ল মনের ও যবানের প্রতিনিধি। আল্লাহর হুকুমে মানুষের মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, সেটাই মুখের ভাষায় বর্ণিত হয় ও কলমে লিখিত হয়।

আল্লাহ বলেন, -الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 'রহমান! যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন' (*রহমান ৫৫/১-৪*)। অর্থাৎ আল্লাহর রহমানিয়াতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হ'ল মানুষকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া। যা তিনি অন্য কোন সৃষ্টিকে দেননি। কলম উক্ত ভাষারই প্রতিনিধিত্ব করে। নুযূলে অহি-র শুরুতেই আল্লাহ এভাবে কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তা'আলা। মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকেই সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। কলমের সাহায্যে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি এমন সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষ জানত না। কেউ কেউ বলেন, এখানে মানুষ বলে আদম আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভিন্ন বস্তুর নাম ও গুণাগুণ শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনটি সূরা আল-বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা এখান পর্যন্ত শেষ। যেমন হযরত আয়েশার (রা) হাদীস থেকে জানা যায় : এই প্রথম অভিজ্ঞাতটি খুব বেশী কঠিন ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাইতে বেশী বরদাশত করতে পারতেন না। তাই তখন কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে , তিনি যে রবকে প্রথম থেকে জানেন ও মানেন তিনি সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অহীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাঁকে তিনি নিজের নবী বানিয়ে নিয়েছেন। এর বেশ কিছুকাল পরে সূরা আল মুদদাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে, নবুওয়াত লাভ করার পর এখন কি কি কাজ করতে হবে।

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ

৬. বাস্তবেই, মানুষ সীমালঙ্ঘনই করে থাকে,

১১কবলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, حقا বা বাস্তবেই, অবশ্যই হয় এমন।

অর্থাৎ যে মেহেরবান আল্লাহ এত বড় মেহেরবানী করেছেন তাঁর মোকাবেলায় মূর্খতার বশবর্তী হয়ে কখনো এমন কর্মনীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ
৭) কারণ সে নিজেকে দেখে অভাবমুক্ত।

দুনিয়ায় ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি যা কিছু সে চাইতো তার সবই সে লাভ করেছে। এ দৃশ্য দেখে সে কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে এবং সীমালজ্ঘন করতে শুরু করেছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, একবার আবু জাহল বলল, যদি মুহাম্মদকে কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে দেখি তবে আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করতে আসলে আবু জাহল তাকে বলল, তোমাকে কি আমি সালাত আদায় করতে নিষেধ করিনি? তোমাকে কি আমি এটা থেকে নিষেধ করিনি? রাসূল তার কাছ থেকে ফিরে আসলেন, আবু জাহলের সাথে তার বিতণ্ডা হলো, তখন আবু জাহল বলল, আমার চেয়ে বড় সভাসদের অধিকারী কি কেউ আছে? তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন যে, "সে যেন তার সভাসদদের ডাকে, আমরাও অচিরেই যাবানিয়াদের ডাকব"। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর শপথ, যদি সে তার সভাসদদের ডাকত। তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহর যাবানিয়া পাকড়াও করত। [বুখারী: ৪৯৫৮, তিরমিযী: ৩৩৪৯, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৫৬, ৩২৯, ৩৬৮]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবু জাহল বলেছিল, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে মাটিতে মুখ ঘসে? তাকে বলা হল যে, হ্যাঁ, তখন সে বলল, লাত ও উযযার শপথ! যদি আমি তাকে তা করতে দেখি তবে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পা দিয়ে দাবিয়ে দিব, অথবা তার মুখ মাটিতে মিশিয়ে দেব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। সে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তার ধারণা অনুসারে সে তার মাথা গুড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কাছে যাওয়ার পর সে পিছনের দিকে ফিরে আসতে বাধ্য হলো এবং হাত দিয়ে বাধা দিচ্ছিল। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, আমার ও তার মাঝে আগুনের একটি খন্দক দেখতে পেলাম এবং ভীতিপ্রদ ও ডানবিশিষ্টদের দেখতে পেয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে নিকটবর্তী হতো। তবে ফেরেশতাগণ তাকে টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেলত। তখন আল্লাহ নাযিল করেন, "কখনও নয়, মানুষ তো সীমালজ্ঘন করে থাকে, যখন সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়..." [মুসলিম: ২৭৯৭]

আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী মনে না করে, ততদিন সে সীমালজ্ঘন করে না। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং সীমালজ্ঘন প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অথচ, আল্লাহ তা'আলাই তাকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে, তাকে তার মায়ের গর্ভে যত্নে রেখেছেন, বেড়ে ওঠার যাবতীয় উপায়-পদ্ধতির ব্যবস্থা করে দেন; তারপরেও যখনই সে নিজেকে ধন-সম্পদ বা ক্ষমতার অধিকারী মনে করা শুরু করে, তখনই সে এমনকি তার রবের সাথেও সীমালজ্ঘন করে।

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ

৮. নিশ্চয় আপনার রবের কাছেই ফিরে যাওয়া।

দুনিয়ায় সে যাই কিছু অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার ভিত্তিতে অহংকার ও বিদ্রোহ করে ফিরুক না কেন, অবশেষে তাকে তোমার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে । তখন এই মনোভাব ও কর্মনীতির পরিণাম সে জানতে পারবে।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ

৯) তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ

১০. এক বান্দাকে—যখন তিনি সালাত আদায় করেন।

বান্দা বলতে এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কুরআনের কয়েক জায়গায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন “পবিত্র সেই সত্তা যিনি তার বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার দিকে।” [সূরা আল-ইসরা: ১]। আরও এসেছে, “সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব।” [সূরা আল-কাহফ: ১] আরও বলা হয়েছে, “আর আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।” [সূরা আল-জিন্ন: ১৯]

أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ

১১. তুমি কি মনে কর, যদি সে সৎপথে থাকে।

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ

১২. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়?

أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

১৩. আমাকে বল! যদি সে (নিষেধকারী) মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়,

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

১৪. সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ দেখেন?!

বাহ্যত মনে হয়, এখানে প্রত্যেকটি ন্যয়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তুমি কি সেই ব্যক্তির কর্যকলাপ দেখেছো যে আল্লাহর এক বান্দাকে ইবাদাত করা থেকে বিরত রাখছে ? যদি সেই বান্দা সঠিক পথে থাকে অথবা মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখায় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, আর এই ইবাদাতে বাধা প্রদানকারী সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তার তকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার এই তৎপরতা সম্পর্কে তুমি কি মনে করো। যে ব্যক্তি এই কর্মনীতি অবলম্বন করেছে সে যদি জানতো, যে বান্দা নেকীর কাজ করে আল্লাহ তাকেও দেখেন আবার যে সত্যের প্রতি মিথ্যা আরো করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট তাকেও দেখেন তাহলে সে কি এই কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারতো? আল্লাহ জালেমের জুলুম দেখছেন এবং মজলুমের মজলুমীও দেখছেন । তাঁর এই দেখা এ বিষয়টিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে যে, তিনি জালেমের শাস্তি দেবেন এবং মজলুমের ফরিয়াদ শুনবেন।

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

১৫. কখনো নয়, সে যদি বিরত না হয় তবে আমরা তাকে অবশ্যই হেঁচড়ে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের গুচ্ছ ধরে

নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ ও দুশমনী করা হতে এবং তাঁকে নামায পড়া থেকে বাধা দেওয়া হতে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার কপালে উপরিভাগের কেশগুচ্ছ ধরে টান দেব। হাদীসে বর্ণিত যে, একদা আবু জাহল বলেছিল যে, 'যদি মুহাম্মাদ কা'বার নিকট নামায পড়া হতে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার গর্দানে পা রেখে দেব।' অর্থাৎ, তাকে পদদলিত করব এবং দস্তরমত লাঞ্ছিত করব। নবী (সাঃ) এর কানে এ কথা পৌঁছলে তিনি বললেন, "যদি সে তা করত, তাহলে ফিরিশতা তাকে ধরে ফেলতেন।"

কপালের চুল ধরে হেঁচড়ানোর কথা বলেছেন আল্লাহ। কপালের নিচেই থাকে মাথার খুলি; আর তাঁর নিচেই মানুষের ব্রেইন। ব্রেইনের সামনের অংশকে Frontal Lobe বলা হয়। ব্রেইনের এই অংশ মূলত চলাচল, নড়াচড়া, সত্য মিথ্যার বিচার, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি কিছু বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই নির্দিষ্ট অংশই কথা যেহেতু চলাচল, নড়াচড়া (দৈহিক বিরুদ্ধাচরন এর কাজ) এবং মিথ্যা বলা, পাপ কাজ এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন (মানসিক বিরুদ্ধাচরন) এর সাথে সংশ্লিষ্ট তাই মাথার বা ব্রেইনের অন্য অংশের কথা না বলে এই অংশের কথাই আল্লাহ বলেছেন এবং এই অংশকেই হেঁচড়ানোর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেছেন। আল কুরআন নাযিলের সময় এই বিষয়টি বোঝা না গেলেও বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে কত সুন্দরভাবে তা বোঝা যাচ্ছে! কি নিখুত আল্লাহর শব্দচয়ন!

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

১৬. মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠ সম্মুখ-চুলের-গুচ্ছ।

এটি 'বদল' হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্য হ'তে। অর্থাৎ 'আবু জাহলের মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ, যে তার কথায় মিথ্যুক ও কাজে পাপিষ্ঠ'।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

১৭. অতএব সে তার পারিষদকে ডেকে আনুক!

এখানে ل এসেছে التحدّى (চ্যালেঞ্জ)-এর জন্য। অর্থ 'যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয়, তাহ'লে তার দলবল ডাকুক'।

একদিন রাসূল (ছাঃ) কা'বা চত্বরে ছালাত আদায় করছিলেন। তখন আবু জাহল সেখানে গিয়ে তিনবার রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا ؟ 'আমি কি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করিনি'? জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) তাকে পাল্টা ধমক দিলেন। তখন আবু জাহল বলল, أَتُهَدِّدُنِى أَمَا وَاللهِ إِنِّى لَأَكْثَرُ أَهْلِ الْوَادِى نَادِياً 'তুমি আমাকে ধমকাচ্ছো?

অথচ আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় আমার মজলিস অর্থাৎ আমার দলই সবচেয়ে বড়'। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। অতএব দলগর্বী যালেমরা সাবধান!

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

১৮. শীঘ্রই আমরা ডেকে আনব যাবানিয়াদেরকে।

হাদীসে এসেছে যে, একদা নবী (সাঃ) কা'বাগৃহের পাশে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় আবু জাহল তাঁর পাশ দিয়ে পার হয়ে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে নামায পড়া হতে নিষেধ করিনি?' অনুরূপ সে আরো তাঁর সাথে কঠিনভাবে ধমক দিয়ে কথা বলল। নবী (সাঃ) তার কথার কড়া জওয়াব দিলেন। তখন সে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে কিসের ভয় দেখাচ্ছ? আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় সব থেকে আমার পারিষদ ও পৃষ্ঠপোষক বেশী আছে।' তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি আবু জাহল নিজের পারিষদবর্গকে আহবান করত, তাহলে তাদেরকে তখনই শাস্তিদাতা ফিরিশতাগণ পাকড়াও করতেন। (তিরমিযী, তাফসীর সূরা ইকরা পরিচ্ছেদ, মুসনাদে আহমাদ ১/৩২৯ ও তাফসীর ইবনে জারীর)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এইভাবে রয়েছে যে, সে অগ্রসর হয়ে তাঁর গর্দানে পা রাখার মনস্থ করেছিল। ইতি অবসরে সে উল্টা পা ফিরে গেল এবং নিজ হাত দ্বারা নিজেকে বাঁচাতে লাগল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কি ব্যাপার? সে বলল, 'আমার ও মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের পরিখা, ভয়ংকর দৃশ্য এবং বহু পাখা দেখলাম!' রসূল (সাঃ) বললেন, "যদি সে আমার নিকটবর্তী হত, তাহলে ফিরিশতাগণ তার এক একটা অঙ্গকে নুচে নিত।"

الزَّبَانِية শব্দের অর্থ হল দারোগা এবং পুলিশ (বা প্রহরী)। অর্থাৎ, এমন শক্তিশালী সৈন্য যার কেউ মুকাবিলা করতে পারে না।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩

১৯. কখনো নয়! আপনি তার অনুসরণ করবেন না। আর আপনি সিজদা করুন এবং নিকটবর্তী হোন।

এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে যে, আবু জাহলের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও সালাতে মশগুল থাকুন। সিজদা করা মানে সালাত আদায় করা। অর্থাৎ হে নবী! আপনি নির্ভয়ে আগের মতো সালাত আদায় করতে থাকুন। এর মাধ্যমে নিজের রবের নৈকট্য লাভ করুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বান্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশী পরিমাণে দোআ কর।" [মুসলিম: ৪৮২, আবু দাউদ: ৮৭৫, নাসায়ী: ২/২২৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৭০]

- **এই আয়াত তিলাওয়াতে সিজদাহ এর আয়াত।**

তাফসীর সমাপ্ত

ফুটনোট

- এই সূরার প্রথম ৫টি আয়াত সর্বপ্রথম ওহী হিসাবে নাযিল হয়েছে।
- আল্লাহর বানীর ১ম নির্দেশই ছিলোঃ "পড়ো"। কিন্তু তখন মুহাম্মাদ (স) সহ বেশিরভাগ মানুষই পড়তে জানতো না। এমন একটি অশিক্ষিত জাতির কাছে পড়ার এই আহবান সত্যিই তাৎপর্যপূর্ন। সেই পড়ার নির্দেশের বাস্তবায়নের কারনে সেই মুসলিমরাই এক সময় হয়ে ওঠে সবচাইতে শিক্ষিত জাতি।
- আল্লাহ মানুষকে শেখার ও লেখার জ্ঞান দিয়েছেন। এটি অনেক বড় একটা দান। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী; তিনি যেহেতু তাঁর কিছু জ্ঞান মানুষকে দিয়েছেন তাই মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে সেরা হয়েছে। লিখিত বিদ্যা যুগ যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থাকে, আর মানুষ পড়ার মাধ্যমে তা জানতে পারে। এভাবে লেখা (অন্যরাও উপকৃত হওয়ার মাধ্যম) ও ১ম আয়াতে বর্নিত পড়া (নিজে উপকৃত হওয়ার মাধ্যম) এই দুয়ের সমন্বয় এর মাধ্যমে জ্ঞান টিকে থাকে।
- আল্লাহর বিরুদ্ধাচরন কারীর সমর্থক, সঙ্গী সাথীদের বিপরীতে আল্লাহর বাহিনীর কথা বলা হয়েছে। তাঁর এই অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বেপরোয়া ভাবের পিছনে শক্তি হিসাবে কাজ করছিল তাঁর গোত্র, বড় বড় নেতাদের সমর্থন। কিন্তু এখানে আল্লাহ ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে তাঁর/তাদের যাকে ইচ্ছা হয় ডেকে নিক কিন্তু আল্লাহর বাহিনী ফেরেশতাদের মোকাবেলায় তারা অতি তুচ্ছ, নগন্য বিবেচিত হবে।
- আল্লাহর বিরুদ্ধাচরন না করে বরং তার অনুগত, নিকটবর্তী বান্দা হওয়ার জন্য সিজদা করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে সূরার সমাপ্তি হয়েছে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৫

সূরা ত্বীন

সূরা **আত-ত্বীন** আল-কুরআনের ৯৫ তম সূরা। এর মোট আটটি আয়াত বা বাক্য রয়েছে। ত্বীন শব্দের অর্থ আঞ্জির বা ডুমুর। সূরা তীন মক্কায় অবতীর্ণ।

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আততীন কে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। একটি বক্তব্য একে মক্কী এবং অন্যটিতে মাদানী বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে মক্কী গণ্য করেছেন। এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, এই সূরায় মক্কা শহরের জন্য (الْبَلَدِ أَمِنًا) (এই নিরাপদ শহরটি) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যদি মদীনায় এটি নাযিল হতো তাহলে মক্কার জন্য "এই শহরটি "বলা ঠিক হতো না। তাছাড়াও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে এটিকে মক্কা মু'আযযমারও প্রথম দিকে সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত বলে মনে হয়। কারণ এর নাযিলের সময় কুফর ও ইসলামের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল এমন কোন চিহ্নও এতে পাওয়া যায় না। বরং এর মধ্যে মক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরাগুলোর মতো একই বর্ণনাভংগী পাওয়া যায়। এই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য এবং একান্ত যুক্তিসঙ্গত।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্যঃ

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তির স্বীকৃতি। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মহান মর্যাদাশালী নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানসমূহের কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তব বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা হয়েছে। যেমন কোথাও বলা হয়েছে : মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে তার সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়েছেন। (আর বাকারাহ ৩০ - ৩৪, আর আরাফ ১১, আল আন'আম ১৬৫, আল হিজর ২৪-২৯, আন নামল ৬২, সাদ ৭১-৭৩ আয়াত) কোথাও বলা হয়েছে : মানুষ আল্লাহর এমন একটি আমানতের বাহক হয়েছে যা বহন করার শক্তি পৃথিবী, আকাশ ও পাহাড় কারো ছিল না। (আল আহযাব ৭২ আয়াত) আবার কোথাও বলা হয়েছে : আমি বনী আদমকে মর্যাদাশালী করেছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (বনী ইসরাঈল ৭০ আয়াত) কিন্তু এখানে বিশেষ করে নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানগুলোর কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মানুষকে

সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় , মানুষকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফরে তার মধ্যে নবুওয়াতের মত সর্বাধিক উন্নত পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক জন্ম নিয়েছে। আর এই নবুওয়াতের চাইতে উঁচু পদমর্যাদা আল্লাহর অন্য কোন সৃষ্টি লাভ করেনি।

এরপর বলা হয়েছে , দুনিয়ায় দুই ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। এক ধরনের মানুষ এই সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার পর দুষ্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নৈতিক অধপতনের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে একেবারে সর্বনিম্ন গভীরতায় পৌঁছে যায়। সেখানে তাদের চাইতে নীচে আর পৌঁছতে পারে না। দ্বিতীয় ধরনের মানুষ ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতন থেকে রক্ষা পায়। তাদেরকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার অপরিহার্য দাবী যে উন্নত স্থানে সে স্থানেই তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব জাতির মধ্যে এই দুই ধরনের লোকের অস্তিত্ব এমন একটি বাস্তব সত্য যাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। কারণ মানুষের সমাজে সব জায়গায় সবসময় এটি দেখা যাচ্ছে।

সবশেষে এই বাস্তব সত্যটির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে , মানুষের মধ্যে যখন এই দু'টি আলাদা আলাদা এবং পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ পাওয়া যায় তখন কাজের প্রতিদানের ব্যাপারটি কেমন করে অস্বীকার করা যেতে পারে?
অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন মানুষের ঈমান ও সৎকর্মের উত্তম প্রতিদান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে *(৬-৮ আয়াত)*।

সূরার ফযিলত

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করেছি। তিনি তাতে ওয়াত তীন ওয়ায যায়তুন পড়েছেন। (বুখারি হাঃ ৭৫৪৬, মুসলিম হাঃ ৯৩২)

আমর ইবনু মায়মূন বলেন, আমি একদিন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে মক্কায় এশার ছালাত আদায় করি। তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা তীন পড়লেন এবং বায়তুল্লাহর সম্মানে তাঁর স্বর উঁচু করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফীল ও কুরায়েশ একত্রে পাঠ করেন (*কুরতুবী*)।

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের সূরা ইনশিরাহে মুহাম্মদ সাঃ এর আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর এ সূরায় পুরো মানবজাতির উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ দানের কথা উল্লেখ আছে যে, তিনি মানুষকে উত্তর গঠন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সুন্দরতম গঠনের পাশাপাশি সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের তাকিদ রয়েছে এ সূরায়।
৯৫ নং সূরা আত ত্বীন এ আল্লাহর নবীদের বড়ত্বের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ১-৩), ৯৬ নং সূরা আল আলাক্ব এ আল্লাহর বড়ত্বের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৩)। সূরা আত ত্বীন এ মানুষকে উত্তম করে সৃষ্টি করা হয়েছে তা বর্নিত

হয়েছে (আয়াত ৪), সূরা আল আলাক্ব এ মানুষ যে উত্তম তাঁর নমুনা (শিক্ষাগ্রহন) বর্ননা করা হয়েছে (আয়াত ৪-৫)। ত্বীন এ মানুষকে নিচু থেকে নিচু স্তরে নামিয়ে দেওয়ার বিষয়টি এসেছে আয়াত ৫ এ অন্যদিকে আলাক্ব এ নিচু থেকে নিচু স্তরে নেমে যাওয়ার কারন বর্নিত হয়েছে আয়াত ৬-১৪ তে। প্রথমে (আত্মিক) ঈমান ও পরে (দৈহিক) কাজ এর কথা এসেছে (আয়াত ৬) ত্বীন এ যার বিপরীতে প্রথমে (দৈহিক) কাজ ও পরে (আত্মিক) ঈমান এর কথা এসেছে আলাক্ব এ আয়াত ১৯ তে। সূরা আত ত্বীন এ এমন ব্যক্তির বিষয় এসেছে যে সব জানা সত্ত্বেও আখিরাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (আয়াত ৭) আর সূরা আল আলাক্ব এ আখিরাতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তির চরিত্র ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (আয়াত ৬-১৪)। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং জ্ঞানী এ কথাটি বলা হয়েছে সূরা আত ত্বীন এর আয়াত ৮ এ এবং আল্লাহর বিচারের ও জ্ঞানের প্রয়োগের বিষয়টি এসেছে আয়াত ৩-৫, ১৫ এ।

তাফসীর

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
১. শপথ তীন ও যায়তুন-এর,

আল্লাহ এখানে তীন ও যয়তূনের কসম করেছেন এর অধিক উপকারিতার জন্যে এবং আরবদের নিকট এ দু'টি বৃক্ষের ব্যাপক পরিচিতির কারণে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আববাস, ইকরিমা, মুজাহিদ প্রমুখ বিদ্বান বলেন যে, 'এটা হ'ল ঐ তীন বা ডুমুর যা তোমরা খেয়ে থাক এবং ঐ যয়তূন বৃক্ষ যা থেকে তোমরা তেল বের করে থাক' (*কুরতুবী, ইবনু কাছীর*)। মুফাসসিরগণ তীন ও যয়তূনের বহু কাল্পনিক অর্থ বলেছেন। অথচ প্রকাশ্য অর্থ থেকে দূরতম অর্থে নিতে গেলে যে দলীল প্রয়োজন, তা সেখানে নেই। আল্লাহপাক যয়তূনকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করে এর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'প্রদীপটি প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা' (*নূর ২৪/৩৫*)। আল্লাহ পাক তীন ও যয়তূনের শপথ করার মাধ্যমে এই দু'টি বৃক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকারিতার প্রতি বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ডুমুর ও যয়তূন তৈল তথা এ দু'টি বৃক্ষের উপকারিতাসমূহ এবং রোগ নিরাময় ক্ষমতা অন্যান্য বৃক্ষের তুলনায় অনেক বেশী বলে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ আবিষ্কারে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর প্রথম কৃষিকাজ শুরু হয় ফিলিস্তীন ভূখন্ডে এবং সে কৃষিজ বৃক্ষ ছিল তীন বা ডুমুর গাছ। সম্প্রতি ফিলিস্তীনের মাটির তলে শুকনা তীন ফলের যে ফসিল পাওয়া গেছে, তা দশ হাযার বছর পূর্বেকার। মানুষের বসবাস ও জীবনযাত্রা তখন থেকেই পৃথিবীতে শুরু হয়েছে। হিসাবে দেখা গেছে যে, পৃথিবীতে আদম (আঃ)-এর আগমন ঘটেছিল দশ হাযার বছর পূর্বে। তিনি যে তীন বৃক্ষের প্রথম আবাদ করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে। হয়ত ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী প্রকাশিত হবে।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ের ইঙ্গিত এতে রয়েছে যে, তীন ও যয়তূন যেখানে প্রথম ও বেশী পরিমাণ উৎপন্ন হয়, সেই ফিলিস্তীনের বা সিরিয়ার মাটিতে মানব সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল। বলা চলে যে, আদম থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত প্রায় সকল প্রধান নবীর আগমন ও বাসস্থান শাম ও তার আশপাশ এলাকাতেই ছিল। বিশেষ করে

বনু ইস্রাঈলের সর্বশেষ রাসূল হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম বায়তুল মুক্বাদ্দাস এলাকাতেই হয়েছিল। অতএব তীন ও যয়তূনের শপথ করে আল্লাহ ফিলিস্তীন ভূখন্ডের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও তার আশপাশ তথা শাম অঞ্চলকে বরকতমন্ডিত বলে ঘোষণা করেছেন (*ইসরা ১৭/১*)।

وَطُورِ سِينِينَ

২. শপথ তূরে সীনীন-এর

তূর পাহাড়ের পাদদেশে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ কথা বলেন এবং তাঁকে নবুঅত প্রদান করেন। সেকারণ তূর পাহাড়ের এমন এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যা পৃথিবীর কোন পাহাড়ের নেই। সিনাইকে আল্লাহ স্বয়ং 'পবিত্র উপত্যকা' বলে ঘোষণা করেছেন (*ত্বোয়াহা ২০/১২*)। সে হিসাবে সিনাই উপত্যকার মর্যাদা অতীব উচ্চে। মুজাহিদ বলেন, সুরিয়ানী ভাষায় 'সীনীন' অর্থ 'মুবারক' বা পবিত্র। মুক্বাতিল ও কালবী বলেন, 'ফলবন্ত বৃক্ষসমৃদ্ধ পাহাড়কে 'সীনীন' বলা হয়, যাকে নাবাত্বী (نبطى) ভাষায় 'সীনা' (سِيْنَاءُ) বলা হয়'। سِيْنِيْنَ -কে سِيْنَاء ও سَيْنَاء দু'ভাবে পড়া হয়েছে (*কুরতুবী*)। যেমন আল্লাহ বলেন, وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِيْنَ 'এবং আমরা সৃষ্টি করেছি সেই বৃক্ষ, যা জন্মে সিনাই পাহাড়ে, যা আহারকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে' (*মুমিনূন ২৩/২০*)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) পড়তেন وَطُوْرِ سِيْنَاءَ (*কুরতুবী*)

وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

৩. শপথ এই নিরাপদ নগরীর

অর্থাৎ মক্কা মু'আযযামার শপথ। এই নগরীকে আল্লাহ 'নিরাপদ' বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তারা কি দেখেনা যে, আমরা (মক্কাকে) নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যারা আছে, তাদের উপরে আক্রমণ করা হয়ে থাকে...' (*আনকাবূত ২৯/৬৭*)।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহর হুকুমে দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে মক্কার বিরানভূমিতে রেখে যান, তখন সেটাকে আবাদ করার জন্য ও শস্য-ফলাদি দ্বারা সমৃদ্ধ করার জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করেছিলেন (*ইবরাহীম ১৪/৩৭*)। অতঃপর সেই ভবিষ্যৎ নগরীকে 'নিরাপদ' ও শান্তিময় করার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেছিলেন (*ইবরাহীম ১৪/৩৫; বাক্বারাহ ২/১২৬*)। শুধু তাই নয়, উক্ত নগরীতে একজন রাসূল প্রেরণের জন্য তিনি ও পুত্র ইসমাঈল খাছভাবে দো'আ করেছিলেন (*বাক্বারাহ ২/১২৯*)।

ফলে আল্লাহপাক উক্ত নিরাপদ ও পবিত্র নগরীতে ইসমাঈল বংশের একমাত্র নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেন (*জুম'আ ৬২/২*)। অতঃপর আল্লাহ মক্কার কুরায়েশদের নির্দেশ দেন, তারা যেন এই গৃহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর ইবাদত করে। তিনি বলেন, 'অতএব তারা যেন এই গৃহের পালনকর্তার ইবাদত করে। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি হ'তে নিরাপদ করেছেন' (*কুরায়েশ ১০৬/৩-৪*)।

লক্ষণীয় যে, চারটি বস্তুর শপথে আল্লাহ তিনজন শ্রেষ্ঠ রাসূলের পুণ্যস্মৃতিবাহী তিনটি পবিত্র স্থানকে বেছে নিয়েছেন। যেমন 'তীন ও যয়তূন' বলে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ইঙ্গিত করেছেন, যা ছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর

আবির্ভাবস্থল। ‘তূরে সীনীন’ বলে তূর পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে, যেখানে তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন ও তাঁকে ‘তাওরাত’ প্রদান করেছিলেন। অতঃপর ‘আল-বালাদুল আমীন’ বলে মক্কা মু‘আযযামাকে বুঝানো হয়েছে, যা ছিল সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্মস্থান ও কর্মস্থল এবং পিতা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর স্মৃতিভূমি।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আলোচ্য তিনটি আয়াতে তিনটি মহান ও পবিত্র স্থানের শপথ করা হয়েছে। যেখানে আল্লাহর নূর ও হেদায়াত প্রকাশিত হয়েছে এবং সেখানে আল্লাহর তিনটি মহাগ্রন্থ তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিল হয়েছে। যেমন তাওরাতে উক্ত তিনটি স্থান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, ‘আল্লাহ তূর পাহাড় থেকে এলেন (যেখানে তিনি মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেন)। অতঃপর (বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) ‘সাঈর’ পাহাড়ে চমকিত হলেন (যেখান থেকে তিনি ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন)। অতঃপর ‘ফারান’ অর্থাৎ মক্কার পাহাড় সমূহ থেকে ঘোষণা জারি করলেন (যেখান থেকে তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেন)’।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
৪. অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে

পূর্বোক্ত তিনটি আয়াতে বর্ণিত চারটি বস্তুর শপথের জওয়াব হিসাবে অত্র আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এখানে মানুষকে সুন্দরতম দৈহিক কাঠামো ও সুসমন্বিত শক্ত-সমর্থ অবয়ব বিশিষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন আশরাফুল মাখলূক্বাতরূপে সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই কেবল জানেন সৃষ্টিসেরা কে? তাই আল্লাহ শপথ করে বলছেন সর্বোত্তম অবয়বে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদামন্ডিত করেছি। আমরা তাদেরকে স্থলে ও পানিতে চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং তাদেরকে আমাদের অনেক সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি’ (*ইসরা ১৭/৭০*)।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি দু’দিক দিয়ে বিবেচনাযোগ্য। এক- সুন্দরতম অবয়ব, উন্নতরুচির খাদ্যাভ্যাস এবং কামনা-বাসনা ও বুদ্ধি-চেতনার দিক দিয়ে। দুই- ঈমান ও সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে।

প্রথমোক্ত দিক দিয়ে মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অন্যান্য প্রাণীকুল ও ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। প্রাণীকুলের মধ্যে কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি-চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যে বুদ্ধি-চেতনা আছে, কিন্তু কামনা-বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই দু’টি বস্তু একত্রে আছে। সে তার বুদ্ধি-চেতনার সাহায্যে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরাভূত করে এবং এভাবে সে সকল সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

দুই- ঈমান ও সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সবার উপরে নির্ধারিত। কিন্তু কাফির-মুশরিক ও পাপিষ্ঠ মানুষ ফেরেশতার চাইতে উত্তম হওয়া দূরের কথা, এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে নিকৃষ্ট। এরা জ্ঞান থাকতেও বুঝে না, চোখ থাকতেও দেখেনা, কান থাকতেও শোনে না (*আ‘রাফ ৭/১৭৯*)। এর কারণ মানুষের সামনে যখন আল্লাহ প্রেরিত শাশ্বত সত্য কোন আদর্শ থাকে না, তখন নিজের সীমিত জ্ঞান নিয়ে খেয়াল-খুশীমত চলতে গিয়ে সে পদে পদে হোঁচট খায়। নিজের আবেগ-অনুভূতির কাছে সর্বদা সে পরাজিত হয়। অবশেষে শয়তানী ফাঁদে

পড়ে পশুত্বের নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। এমনকি গর্ব ও অহংকারে স্ফীত হয়ে সে নিজেকেই একসময় ‘রব’ বলে দাবী করে বসে। ফেরাঊন ছিল যার বাস্তব নমুনা’ (*নাযে‘আত ৭৯/২৪*)।

যুগে যুগে ফেরাঊনের অনুসারীরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে জেঁকে বসে আছে। এরাই মানবতার সর্বোচ্চ স্তর হ’তে পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে পতিত হয়েছে। বলা চলে যে, এইরূপ লোকদের নেতৃত্বের কারণেই বিশ্বসমাজ সর্বদা কলুষিত হয়। ফলে একদিন আসবে চূড়ান্ত ধ্বংস- ক্বিয়ামত।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানুষ শুরু থেকেই সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট মানুষ ছিল। সে কখনোই বানর বা অন্য কিছু ছিল না। বস্ত্ততঃ কুরআনী সত্যের সামনে ডারউইনের বিবর্তনবাদের কাল্পনিক থিওরী একেবারেই অচল ও অগ্রহণযোগ্য।

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

৫. তারপর আমরা তাকে হীনতাগ্রস্তাদের হীনতমে পরিণত করি

মুফাস্‌সিরগণ সাধারণত এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, আমি তাকে যৌবনের পর বার্ধক্যের এমন এক অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি যেখানে সে কিছু চিন্তা করার, বুঝার ও কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে; ছোট শিশুর মত হয়ে যায়। দুই. আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন পর্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার পর যখন মানুষ নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলোকে দুস্কৃতির পথে ব্যবহার করে তখন আল্লাহ তাকে এর উপযুক্ত প্রতিদান হিসেবে জাহান্নামকে তার আবাসস্থল বানিয়ে দেন।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

৬. কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

অর্থাৎ মানবতার সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তরে পতিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেনা ঐ ব্যক্তিগণ, যারা আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছে এবং তাঁরই দেখানো পথে সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে। যেমন সূরা আছরে আল্লাহ বলেন- ‘কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কেবলমাত্র তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে’। ‘যারা পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দিয়েছে’।

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ‘তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার’। غَيْرُ مَمْنُونٍ অর্থ غير مقطوع অবিচ্ছিন্ন বা অশেষ *(ইবনু কাছীর)*। আল্লাহ বলেন- ‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে, তাদের পালনকর্তা তাদের পথ প্রদর্শন করবেন তাদের ঈমানের মাধ্যমে এমন নে‘মতপূর্ণ জান্নাতের দিকে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ’ (*ইউনুস ১০/৯*)।

অর্থাৎ ঈমানই হ’ল মূল। ঈমান সঠিক হ’লে আমল ভাল হবে। আমল ত্রুটিপূর্ণ হ’লে বুঝতে হবে তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ ছিল। শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে এবং জীবনের চলার পথে তাকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করে। যেমন হাযারো ঢেউয়ের মধ্যে নোঙর তার নৌকাকে শক্তভাবে ধরে রাখে।

তাওহীদ থাকলে ইত্তেবায়ে সুন্নাত থাকবেই। ইত্তেবায়ে সুন্নাত ব্যতীত স্রেফ আল্লাহতে বিশ্বাস জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। ইত্তেবা ব্যতীত তাওহীদের দাবী কপটতা বৈ কিছুই নয়। ঈমান ও আমল যার সঠিক হবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার পুরস্কার অফুরন্ত ও অসীম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'যদি কেউ পীড়িত হয় বা সফরে থাকে, তা'হলে বাড়ীতে সুস্থ অবস্থায় সে যে নেক আমল করত, সেইরূপ ছওয়াব তার জন্য লেখা হবে'। অর্থাৎ সুস্থ অবস্থার নেকী পীড়িত অবস্থায়ও জারি থাকবে। যদি তার মধ্যে ঐ নেকী উপার্জনের আকাংখা থাকে।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ

৭. কাজেই (হে মানুষ!) এরপর কিসে তোমাকে কর্মফল দিন সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে?

এতে কেয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরাতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্যে আখেরাত ও কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে? তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে হীনতম ও নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন, তারপরও কেন তোমরা তা অস্বীকার করবে? এর আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে, এসব প্রমাণের পর (হে রাসূল) শাস্তি ও পুরষ্কারের ব্যাপারে কে আপনাকে মিথ্যা বলতে পারে? এই কথাটিকেই কুরআনের অন্যান্য স্থানে এভাবে বলা হয়েছে, "আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়ে গেছে? তোমরা কেমন ফয়সালা করছো? [সূরা আল-কলম: ৩৫–৩৬] আরো এসেছে, "দুষ্কৃতকারীরা কি একথা মনে করেছে, আমি তাদেরকে এমন লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? উভয়ের জীবন ও মৃত্যু এক রকম হবে? খুবই খারাপ সিদ্ধান্ত যা এরা করছে। [সূরা আল-জাসিয়াহ: ২১]

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

অর্থাৎ যখন দুনিয়ার ছোট ছোট শাসকদের থেকেও তোমরা চাও এবং আশা করে থাকো যে, তারা ইনসাফ করবে, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবে এবং ভালো কাজ যারা করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে তখন আল্লাহ ব্যাপারে তোমরা কি মনে করো? তিনি কি সব শাসকের বড় শাসক নন? যদি তোমরা তাঁকে সবচেয়ে বড় শাসক বলে স্বীকার করে থাকো তাহলে কি তাঁর সম্পর্কে তোমরা ধারণা করো যে, তিনি ইনসাফ করবেন না? তাঁর সম্পর্কে কি তোমরা এই ধারণা পোষণ করো যে, তিনি মন্দ ও ভালোকে একই পর্যায়ে ফেলবেন? তোমরা কি মনে করো তাঁর দুনিয়ায় যারা সবচেয়ে খারাপ কাজ করবে আর যারা সবচেয়ে ভালো কাজ করবে তারা সবাই মরে মাটির সাথে মিশে যাবে। কাউকে তার খারাপ কাজের শাস্তি দেয়া হবে না এবং কাউকে তার ভালো কাজের পুরস্কারও দেয়া হবে না?

তাফসীর সমাপ্ত

ফুটনোট

- এই সূরায় চারটি বিষয়ের মাধ্যমে তিনটি স্থানের ইঙ্গিত রয়েছে –
  - ‘তীন ও যয়তূন’ বলে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ইঙ্গিত করেছেন
  - ‘তূরে সীনীন’ বলে তূর পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে,
  - ‘আল-বালাদুল আমীন’ বলে মক্কা মু‘আযযামাকে
- প্রথম তিনটি আয়াতে তিনটি মহান ও পবিত্র স্থানের শপথ করা হয়েছে। যেখানে আল্লাহর তিনটি মহাগ্রন্থ তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিল হয়েছে।
- মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি দু’দিক দিয়ে বিবেচনাযোগ্য। এক- সুন্দরতম অবয়ব, উন্নতরুচির খাদ্যাভ্যাস এবং কামনা-বাসনা ও বুদ্ধি-চেতনার দিক দিয়ে। দুই- ঈমান ও সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে।

- ঈমানই হ’ল মূল। ঈমান সঠিক হ’লে আমল ভাল হবে। আমল ত্রুটিপূর্ণ হ’লে বুঝতে হবে তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ ছিল। শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে এবং জীবনের চলার পথে তাকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করে।
- ঈমান ও সৎকর্মের ফলে মানুষ মানবতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয় এবং তার বিপরীত হ’লে সে পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে পতিত হয়। দুনিয়ার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রতিদান ও প্রতিফল মানুষ যথাযথভাবে আখেরাতে প্রাপ্ত হবে। আর এটাই হ’ল ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত দাবী।

সূরা ইনশিরাহ

সূরা ইনশিরাহ পবিত্র কুরআনের ৯৪ তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৮, এটি মক্কায় অবতীর্ন তাই ইনশিরাহ মক্কি সূরা।

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ দু'টিকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময় - কাল

সূরা আদ দুহার সাথে এর বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এ সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন , মক্কা মু'আযযমায় আদ্ দুহার পরেই এই সূরাটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির উদ্দেশ্যও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করা । নবুওয়াত লাভ করার পর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই তাঁকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় , নবুওয়াত লাভের আগে তাঁকে কখনো তেমনি অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর নিজের জীবনে এটি ছিল একটি মহাবিপ্লব । নবুওয়াতে পূর্ব জীবনে এ ধরনের কোন বিপ্লবের ধারণা ছিল না। তিনি ইসলাম প্রচারে কাজ শুরু করার সাথে সাথেই দেখতে দেখতে সমগ্র সমাজ তাঁর দুশমন হয়ে যায়। অথচ পূর্বে এই সমাজে তাঁকে বড়ই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো।যেসব আত্মীয় -স্বজন , বন্ধু - বান্ধব ,গোত্রীয় লোকজন ও মহল্লাবাসী ইতিপূর্বে তাঁকে মাথায় তুলে রাখতো তারাই এখন তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকে। মক্কার এখন আর কেউ তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। পথে তাঁকে দেখলে লোকেরা শিস দিতো,যা তা মন্তব্য করতো। প্রতি পদে পদে তিনি সংকটের সম্মুখীন হতে থাকেন। যদিও ধীরে ধীরে এসব অবস্থার মোকাবেলা করতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তবুও এই প্রথম দিকের দিনগুলো তাঁর জন্য ছিল বড়ই কঠিন এবং এগুলো তাঁর মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এই সূরায় মহান আল্লাহ প্রথমেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন ,আমি তোমাকে তিনটি বিরাট বিরাট নিয়ামত দান করেছি । এগুলোর উপস্থিতিতে তোমার মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই । তার মধ্যে একটি হচ্ছে হৃদয়দেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার নিয়ামত । দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যে ভারী বোঝা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল তা কি আমি তোমার ওপর থেকে নামিয়ে দেইনি ? তৃতীয়টি হচ্ছে,সুনাম ও সুখ্যাতিকে উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করার নিয়ামত । এই নিয়ামতাটি তাঁর চেয়ে বেশী আর কাউকে দেয়া তো দূরের কথা তাঁর সমানও কাউকে কখনো দেয়া হয়নি। সামনের দিকের ব্যাখ্যার আমি এ তিনটি নিয়ামত বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং এগুলো কত বড় নিয়ামত ছিল তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

এরপর বিশ্ব - জাহানের প্রভু তাঁর বান্দা ও রসূলকে এই র্মমে নিশ্চন্ততা দান করেছেন যে ,সমস্যা ও সংকটের যে যুগের মধ্য দিয়ে তুমি এগিয়ে চলছো এটা কোন সুদীর্ঘ যুগ নয় । বরং এখানে সমস্যা ,সংকট ও সংকীর্ণতার সাথে সাথে প্রশস্ততার যুগও চলে আসছে। এই এক কথাই সূরা আদ্ দুহায় এভাবে বলা হয়েছে : তোমার জন্য প্রত্যেকটি পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো হবে এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমন সবকিছু দেবেন যাতে তোমার মন খুশীতে ভরে যাবে।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে , প্রাথমিক যুগের এসব কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে একটি মাত্র জিনিসের সাহায্যে । সেটি হচ্ছে : নিজের কাজ - কর্ম থেকে ফুরসত পাবার সাথে সাথেই তুমি পরিশ্রম পূর্ণ ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধানায় লিপ্ত হয়ে যাও । আর সমস্ত জিনিসের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এটি সেই একই উপদেশের পুনরাবৃত্তি যা সূরা মুয্যামমিলের ৯ আয়াতে আরো বেশী বিস্তারিতভাবে তাঁকে দান করা হয়েছে।

আগের সূরা ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

বিষয়বস্তুর দিক থেকে আগের (৯৩ নং) সূরা আদ দুহা এর সাথে এই (৯৪ তম) সূরা আল ইনশিরাহ এর গভীর মিল রয়েছে। ১ম ভাগে আল্লাহর দেয়া বিষয়বস্তু বর্নিত হয়েছে, পরের ভাগে পাওয়ার পর বিনিময়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সূরা আদ দুহার ৬ নং আয়াতের গঠন ও বিষয়বস্তুর সাথে সূরা আল ইনশিরাহ এর ১ নং আয়াতের গঠন ও বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে। এভাবে ৭, ৮ এর সাথে ২; ১১ এর সাথে ৮ এর মিল রয়েছে। এক কথায় ২ টি সূরার গঠন, বিষয়বস্তু, ধারা-বর্ননাতে গভীর মিল বিদ্যমান।

সূরা ইনশিরাহে মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত ও মর্যাদা কথা উল্লেখ আছে আর ৯৫ নং সূরা আত ত্বীন এ আল্লাহর অন্যান্য নবীদের বড়ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন (আয়াত ১-৩),

তাফসীর

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

১. আমরা কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি?

شرح শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, “কাজেই যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।” [সূরা আল-আন’আম: ১২৫] আবার কোথাও বলা হয়েছে, “আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের দেয়া আলোতে রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহর স্মরণে পরাঙ্মুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তি তে আছে।” [সূরা আয-যুমার: ২২]

এই উভয় স্থানে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করার অর্থই হচ্ছে, সব রকমের মানসিক অশান্তি ও সংশয়মুক্ত হওয়া, জ্ঞান ও সত্য উপলব্ধি করার উপযুক্ত করা এবং বক্ষকে প্রজ্ঞার আধার করার জন্য প্রস্তুত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে বাহ্যত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষ বিদারণ করে তাকে যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে পরিষ্কার করে তাতে জ্ঞান ও তত্ত্বকথা দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। [মুসলিম: ১৬৪, তিরমিযী: ৩৩৪৬] উপরোক্ত সব কয়টি অর্থই এ আয়াতে হওয়া সম্ভব, আর একটি অপরটির পরিপূরক।

অনেক বিদ্বান আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন, 'আমরা কি তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করি নাই'? এর দ্বারা শিশুকালে ধাত্রী হালীমার গৃহে থাকা অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর বক্ষ বিদারণ এবং মে'রাজের রাত্রিতে রাসূল (সাঃ)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অত্র আয়াতের তাফসীরে ইমাম তিরমিযী মালেক বিন ছা'ছা'আহ ও আবু যার গিফারী (রাঃ) বর্ণিত আনাস বিন মালেক (রাঃ) প্রমুখাৎ মে'রাজের বহুল প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসগুলি এনেছেন। হাফেয ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর বক্ষ উন্মুক্ত করার মধ্যে মে'রাজের রাত্রির বক্ষ বিদারণ এবং নবুঅত ও রিসালাতের গুরুভার বহনের জন্য বক্ষ উন্মুক্ত করণ দুই-ই শামিল হয়েছে *(তাফসীর ইবনু কাসীর)*।

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

২. আর আমরা অপসারণ করেছি আপনার ভার,

এই ভার বা বোঝা নবুঅতের পূর্বে তাঁর চল্লিশ বছর বয়সকালের সাথে সম্পৃক্ত। এই জীবনে যদিও আল্লাহ তাঁকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন; সুতরাং তিনি কোন মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাননি, কখনো মদ্য পান করেননি এবং এ ছাড়া অন্যান্য পাপাচরণ থেকেও তিনি সুদূরে ছিলেন। তবুও প্রসিদ্ধ অর্থে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কে তিনি জানতেন না; আর না তিনি তা করেছেন। এই জন্য বিগত চল্লিশ বছরে ইবাদত ও আনুগত্য না করার বোঝ তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কে সওয়ার ছিল; যা সত্যিকারে কোন বোঝ ছিল না। কিন্তু তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধি তা বোঝ বানিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই বোঝকে নামিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন। এটা {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} আয়াতের অর্থের মত। (সূরা ফাৎহ ২ আয়াত)

কোন কোন আলেমগণ বলেন, এটা নবুঅতের বোঝ ছিল যেটাকে আল্লাহ হালকা করে দিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ এই রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সরলতা সৃষ্টি করলেন।

الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

৩. যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

যে দুঃসহ বোঝার চাপে তোমার পিঠ নুইয়ে যাচ্ছিল। এর দ্বারা 'অহি' অতরণকালের ভার বহনের কষ্টকর অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বোঝা বহন অসাধ্য হ'লে মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে যে শব্দ বের হয়, তাকে نقيض বলা হয় । সেখান থেকে أَنْقَضَ ক্রিয়াপদ এসেছে। প্রথম দিকে 'অহির' ভার বহনে রাসূল (সাঃ)

অনুরূপ দৈহিক কষ্ট অনুভব করতেন। তবে ক্বাসেমী এর দ্বারা রাসূল (সাঃ)-এর মনোবেদনার কষ্ট বুঝিয়েছেন। কেননা প্রথমদিকে তাঁর দাওয়াত কেউ কবুল করত না। বরং নানাবিধ অপবাদ ও মিথ্যারোপের মাধ্যমে তাঁকে লোকেরা কষ্ট দিত। পরে এই কষ্ট দূর হয়ে যায় *(ক্বাসেমী)*। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ প্রথম ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

৪. আর আমরা আপনার (মর্যাদা বৃদ্ধির) জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি

নবুঅত ও রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে তোমার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছি। এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী নবীগণের কাছ থেকে তোমার ব্যাপারে ওয়াদা নেওয়ার ফলে (*আলে ইমরান ৩/৮১*) পূর্ব থেকেই তোমার আলোচনা পূর্ববর্তী উম্মতগণের নিকটে যেমন ছিল, তেমনি তোমার জীবদ্দশায় তো বটেই ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাতে তোমার নাম সর্বত্র মুখে মুখে সর্বক্ষণ প্রচারিত হয়, তার ব্যবস্থা করেছি। যেমন আযানের মধ্যে, ইক্বামতের মধ্যে, তাশাহহুদের মধ্যে, জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবায়, হজ্জের খুৎবায়, আইয়ামে তাশরীক্বের দিনগুলিতে, ছাফা-মারওয়ায় ও হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে, বিবাহের খুৎবায়, এমনকি বক্তৃতা ও ভাষণের শুরুতে হামদ ও দরূদের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র সর্বদা তোমার প্রশংসিত নাম অত্যন্ত সম্মানের সাথে উচ্চারিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যদি একজন ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুঅতকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কাফের। তোমার দ্বীন আসার পর বিগত সকল দ্বীন রহিত করা হয়েছে। তোমার দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করা হয়েছে। তোমাকে সকল নবীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। পৃথিবীতে মুমিনের হৃদয়ে তোমাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। আখেরাতে তোমাকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান 'মাক্বামে মাহমূদ' দান করা হয়েছে। আসমান জগতে সকল ফেরেশতা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে এবং তাদের নিকটে আমরা তোমার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে হে রাসূল তোমার সুনাম-সুখ্যাতিকে আমরা সর্বদা উচ্চকিত করেছি। এই সৌভাগ্য দুনিয়ার কোন মানুষের হয়নি।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

৫. সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে ও তাঁর উম্মতকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং একই কথা পরপর দু'বার বলে বিষয়টিকে যোরদার ও তাকীদপূর্ণ করেছেন। এটা আরবদের অন্যতম বাকরীতি।

দু'টি আয়াতেই الْعُسْرِ এসেছে معرفة বা নির্দিষ্টবাচক এবং يُسْراً এসেছে نكره বা অনির্দিষ্টবাচক। যার অর্থ একটি কষ্টের বিনিময়ে একাধিক স্বস্তি। অতএব একটি কষ্ট কখনো একাধিক স্বস্তির উপরে জয়লাভ করে না। বুঝা গেল যে, কষ্টের পরে স্বস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং তা হবে একাধিক। যেমন মক্কা থেকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একাকী আবুবকরকে নিয়ে হিজরত করেছিলেন কষ্টের সাথে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তিনি সেখানে ফিরে এসেছিলেন দশ হাযার মুসলমানকে সাথে নিয়ে উচ্চতম মর্যাদা ও পাহাড় প্রমাণ সম্মান নিয়ে। এটির উদাহরণ ইবাদতেও রয়েছে। যেমন, ছালাতের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর। না পারলে বসে, না পারলে কাৎ হয়ে। ছিয়ামের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, ছিয়াম রাখ। অসুখে বা কষ্টবোধ করলে ছেড়ে দাও। সফরে গিয়ে ছিয়াম ছেড়ে

দাও ইত্যাদি। অতঃপর এটি স্বাভাবিক (حسّى) জীবনেও রয়েছে। যেমন দারিদ্রের পরে সচ্ছলতা, রোগমুক্তির পর সুস্থতা, বিপদমুক্তির পর স্বস্তি বহু আনন্দের বারতা নিয়ে হাযির হয়। বিষয়টি মানসিক জীবনেও (معنوى) হ'তে পারে। যেমন কষ্টে ছবর করার যে অসীম ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন, তা মানুষকে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী করে এবং যেকোন বিপদ হাসিমুখে মোকাবিলা করার শক্তি দান করে। যা তার বিপদকে সহজ করে দেয়।

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

৭. অতএব আপনি যখনই অবসর পান তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হোন।

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

৮. আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন।

অর্থাৎ যখনই তুমি দুনিয়াবী ঝামেলা থেকে মুক্ত হবে, তখনই আল্লাহর ইবাদতে রত হও এবং একান্ত মনে তোমার প্রভুর সন্তুষ্টি কামনায় তার দিকে রুজূ হও।

এখানে فَانْصَبْ বলা হয়েছে, যা نَصَبٌ থেকে এসেছে। যার অর্থ কষ্ট করা, চেষ্টা করা। অতএব فَانْصَبْ-এর অর্থ হবে فاتعب فى العبادة شكرًا لأنعمه 'ইবাদতের কষ্টে রত হও তাঁর নে'মত সমূহের শুকরিয়া আদায়ের জন্য'। দুনিয়াবী আকর্ষণ থেকে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরানোটাই মূলতঃ কষ্টের বিষয়। নফসের তাবেদার যারা, তারা এটা পারে না। যারা প্রবৃত্তির গলায় লাগাম দিতে পারে এবং নফসের চাহিদাকে দমন করতে পারে, কেবলমাত্র তারাই দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর ইবাদতে রত হ'তে পারে।

ফরয ইবাদতের পরে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ'ল রাতের ছালাত, যা তাহাজ্জুদ নামে পরিচিত। এটি রাসূল (সাঃ)-এর উপরে অতিরিক্ত কর্তব্য ছিল। নিঃসন্দেহে এটা ছিল আরও কষ্টকর। সারা দিন কাফির-মুশরিকদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মুকাবিলা, এরপর ভীত-সন্ত্রস্ত রাত্রির শেষভাগে উঠে আল্লাহর ইবাদতে রত হওয়া সন্দেহাতীতভাবে ছিল অতীব ক্লেশকর। মাক্কী জীবনে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা ছিল আরও করুণ। এই কষ্ট ও তার পুরস্কার বিষয়ে মাক্কী সূরা সাজদায় আল্লাহ বলেন,

'তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে। এমতাবস্থায় তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আকাংখায় এবং আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে'। 'অতঃপর কেউ জানে না নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্ত লুক্কায়িত রয়েছে' (*সাজদাহ ৩২/১৬-১৭*)।

এটাতো হ'ল সাধারণ মুমিন-মুত্তাক্বী ইবাদতগুযার নর-নারীর জন্য। এক্ষণে রাসূল (সাঃ)-এর জন্য বিশেষভাবে কি পুরস্কার রয়েছে? সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوْدًا- 'রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ ছালাতে রত থাক। এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। সত্বর তোমার প্রভু তোমাকে 'প্রশংসিত স্থানে' পৌঁছাবেন' (*বনী ইস্রাঈল ১৭/৭৯*)। 'মাক্বামে মাহমূদে' দাঁড়িয়ে রাসূল (সাঃ) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফা'আত করবেন। আর এই শাফা'আতের পরেই আল্লাহ বিচারকার্য শুরু করবেন। যাকে 'শাফা'আতে কুবরা' বলা হয়। এই মহা সম্মান কেবল মুহাম্মাদ (সাঃ)-কেই দেয়া হবে, অন্য

কোন নবীকে নয়। কারণ তিনিই একমাত্র বিশ্বনবী। ফরয ছাড়াও অতিরিক্ত রাতের ইবাদতের প্রতিদান স্বরূপ এটা ছিল রাসূল (সাঃ)-এর জন্য জান্নাত ছাড়াও অতিরিক্ত মহা সম্মান।

বস্তুতঃ আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া ব্যতীত মানুষের মানবিক মূল্যবোধ তার প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করতে পারে না। ইসলাম সেই প্রশিক্ষণই দিয়েছিল তার অনুসারীদের। তাই হাযারো নির্যাতনেও মুসলমানগণ পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়নি। বরং তাদের সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যবোধ তৎকালীন প্রবৃত্তিপরায়ণ সমাজনেতাদের উপরে সহজে জয়লাভ করে এবং তা বিশ্বজয়ী ইসলামী খেলাফতের সূচনা করে। অতএব জনশক্তি বা অস্ত্রশক্তি নয় বরং প্রধানতঃ নৈতিক ও আদর্শিক শক্তির জোরেই ইসলাম সেযুগে জয় লাভ করেছিল। এ যুগেও জয়লাভ করতে পারে সকল পার্থিব শক্তির উপরে।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, শত নির্যাতনের মধ্যেও রাসূল (সাঃ)-কে পাল্টা নির্যাতন প্রতিরোধের পথ বেছে নেবার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং তাঁকে ও তাঁর সাথী নির্যাতিত-নিপীড়িত নও মুসলিমদেরকে খালেছ অন্তরে আল্লাহর প্রতি রুজূ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমাজ বিপ্লবের মৌলিক দর্শন এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ যা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। তবে এটি ছিল মাক্কী জীবনের ঘটনা। যখন তিনি প্রতিরোধে সক্ষম ছিলেন না। অতঃপর মাদানী জীবনে সক্ষমতা অর্জন করলে তাঁকে সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় *(হজ্জ ২২/৩৯)* এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় *(আনফাল ৮/৬০)*। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ও বস্তুগত সক্ষমতা অপরিহার্য। নইলে সর্বদা ইসলামের বিজয়ের জন্য ঈমানী শক্তিই মুখ্য। বৈষয়িক শক্তি হ'ল ঢালস্বরূপ। যাকে কখনোই মুখ্য হিসাবে গণ্য করা হয়নি।

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ বাক্যের মধ্যে এ ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, হে মুহাম্মাদ! কাফেরদের লোভনীয় প্রস্তাবসমূহে কর্ণপাত করো না এবং তাদের দেওয়া কষ্ট ও নির্যাতনে ভীত ও দুর্বল হয়ে পড়ো না। কারু কাছে কিছু চেয়ো না। বরং আল্লাহর কাছেই সবকিছু চাও এবং তাঁর দিকেই একান্তভাবে মনঃসংযোগ কর। কারণ তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। তিনিই তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কষ্টের পরে স্বস্তি দেবেন। পরকালীন পুরস্কার ছাড়াও পার্থিব বিজয় ও স্বস্তিলাভ কেবল আল্লাহর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। অতএব সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল তোমার পালনকর্তা আল্লাহর দিকে রুজূ হও।
পিতা ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাইতে অধিক অসহায়। স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূত ব্যতীত তাঁর প্রকাশ্য সাথী কেউ ছিল না। নমরূদের মত দুর্ধর্ষ শাসক ও একটি প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে একাই তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে আদর্শিকভাবে। শত নির্যাতনের মুখেও তিনি সেদিন বলেছিলেন,

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفاً وَّمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'আমি আমার চেহারাকে সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি একনিষ্ঠভাবে, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' (*আন'আম ৬/৭৯*)। মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন ইবরাহীমের বংশধর এবং শ্রেষ্ঠ রাসূল। অতএব তাঁকেও একইরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 'তোমার প্রতিপালকের দিকে রুজূ হও'। *সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী*।

এখানে وَإِلَى رَبِّكَ আগে আনা হয়েছে, যেটা পরে হওয়ার কথা। অর্থাৎ فَارْغَبْ إِلَى رَبِّكَ (তুমি রুজূ হও তোমার প্রভুর দিকে)। কিন্তু আগে আনার উদ্দেশ্য আল্লাহকে নির্দিষ্ট (الحصر) করা। إِلَى رَبِّكَ لاَ اِلَى غَيْرِهِ 'কেবল তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও, অন্যদিকে নয়'। অতএব কোন কাজের পূর্বে প্রথমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে, অন্যের কাছে নয়। কেননা কেবল তিনিই কাজটি সহজ করে দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমি রাসূল (সাঃ)-এর সওয়ারীর পিছনে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস! আল্লাহর বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল, তিনিই তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে চল, তাহ'লে তুমি তাঁকে সর্বদা তোমার সম্মুখে পাবে। তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর নিকটেই চাইবে। যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই চাইবে।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সেই অতুল্য নৈতিক শক্তি অর্জনের জন্য রাসূল (সাঃ)-কে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফুটনোট

- এই সূরা রাসূল (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত তিনটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
    - বক্ষ উন্মুক্ত,
    - নবুওয়তের গুরুভার অন্তর থেকে সরিয়ে দেয়া ও তা সহজ করে দেয়া,
    - সুনাম ও সুখ্যাতি
- আল্লাহ যখন কাউকে দিয়ে বড় কোন খিদমত নিতে চান ও করাতে চান, তখন উক্ত কাজের জন্য তার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন এবং তাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি অনুগত রাখেন।
- একটি কষ্টের বিনিময়ে একাধিক স্বস্তি রয়েছে।
- যখনই দুনিয়াবী ঝামেলা থেকে মুক্ত হবে, তখনই আল্লাহর ইবাদতে রত হওয়া এবং একান্ত মনে প্রভুর সন্তুষ্টি কামনায় তার দিকে রুজূ হও। দুনিয়াবী আকর্ষণ থেকে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরানোটাই মূলতঃ কষ্টের বিষয়। নফসের তাবেদার যারা, তারা এটা পারে না। যারা প্রবৃত্তির গলায় লাগাম দিতে পারে এবং নফসের চাহিদাকে দমন করতে পারে, কেবলমাত্র তারাই দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর ইবাদতে রত হ'তে পারে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৭

সূরা দোহা

সূরা দোহা পবিত্র কোরআন শরীফের ৯৩ নং সূরা দুহা। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ১১টি এবং ১টি রুকুর সংখ্যা। মক্কায় অবতীর্ণ হয় সূরা আদ-দুহা। উজ্জ্বল সকাল বা উজ্জ্বল দিবা এই সূরার নামের অর্থ । রাতের মোকাবেলায় ব্যবহার করা হয়েছে যা।

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াদদুহা কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার বক্তব্য বিষয় থেকে একথা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এটি মক্কা মু' আযযমার প্রথম যুগে নাযিল হয়। হাদীস থেকে ও জানা যায় , কিছুদিন অহীর অবতরণ বন্ধ ছিল। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বারবার তাঁর মনে এই আশংকার উদয় হচ্ছিল , হয়তো তাঁর এমন কোন ত্রুটি হয়ে গেছে যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এ জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কোন প্রকার অসন্তুষ্টির কারণে অহীর সিলসিলা বন্ধ করা হয়নি। বরং এর পেছনে সেই একই কারণ সক্রিয় ছিল যা আলোকোজ্জ্বল দিনের পরে রাতের নিস্তব্ধতা এ প্রশান্তি ছেয়ে যাবার মধে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ অহীর প্রখর কিরণ। যদি একনাগাড়ে তাঁর প্রতি বর্ষিত হতো তাহলে তাঁর স্নায়ু তা বরদাশত করতে পারতো না। তাই মাঝখানে বিরতি দেয়া হয়েছে। তাঁকে আরাম ও প্রশান্তি দান করাই এর উদ্দেশ্য । নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থার মুখোমুখি হন। সে সময় অহী নাযিলের কষ্ট বরদাশত করার অভ্যাস তাঁর গড়ে ওঠেনি। তাই মাঝে মাঝে ফাঁক দেবার প্রয়োজন ছিল। সূরা মুদদাসসিরের তাফসীরে এবিষয়ে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা আছে।

বিষয়বস্তু ও মুল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া আর এই সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্য ছিল অহী নাযিলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাঁর মধ্যে যে পেরেশানী দেখা দিয়েছিল তা দূর করা। প্রথমে আলো ঝলমল দিনের এবং রাতের নীরবতা ও প্রশান্তির কসম খেয়ে তাঁকে এই মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করা হয়েছে যে , তার রব তাঁকে মোটেই পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। এরপর তাঁকে সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে , ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এগুলো মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। তাঁর জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে উন্নততর হয়ে যেতেই থাকবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এমনভাবে তাঁর দান বর্ষণ করতে থাকবেন যার ফলে তিনি খুশী হয়ে যাবেন। কুরআনের যেসব সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় এটি তার অন্যতম। অথচ যে সময় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন যেসব অসহায় সাহায্য

- সম্বলহীন ব্যক্তি মক্কায় সমগ্র জাতির জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল তারা যে কোনদিন এত বড় বিস্ময়কর সাফল্যের মুখ দেখবে এর কোন দূরবর্তী আলামতও কোথাও দেখা যায়নি।

তারপর মহান আল্লাহ তাঁর বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি - এ ধরনের পেরেশানীতে তুমি ভুগছো কেন ? আমি তো তোমার জন্মের দিন থেকেই তোমার প্রতি অবিরাম মেহেরবানী করে আসছি। তুমি এতিম অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলে। আমি তোমার প্রতিপালন ও রক্ষাণাবেক্ষণের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা করেছি। তুমি অনভিজ্ঞ ছিলে। আমি তোমাকে পথের সন্ধান দিয়েছি। তুমি অর্থ - সম্পদহীন ছিলে। আমি তোমাকে বিত্তশালী করেছি। এসব কথা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিচেছ যে, তুমি শুরু থেকেই আমার প্রিয়পাত্র আছো এবং আমার মেহেরবানী, অনুগ্রহ দান স্থায়ীভাবে তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সূরা ত্বা- হা'র ৩৭ থেকে ৪২ পর্যন্ত আয়াতগুলোও সামনে রাখতে হবে। এই আয়াতগুলোতে হযরত মূসাকে ফেরাউনের মতো শক্তিশালী জালেমের বিরুদ্ধে পাঠাবার সময় আল্লাহ তাঁর পেরেশানী দূর করার জন্য তাঁর জন্মের পর থেকে কিভাবে আল্লাহর মেহেরবানী তাঁকে ঘিরে রেখেছিল সে কথা তাঁকে বলেন। এই সংগে তাঁকে একথাও বলেন যে এ অবস্থায় তুমি নিশ্চিত থাকো, এই ভয়াবহ অভিযানে তুমি একাকী থাকবে না বরং আমার মেহেরবানীও তোমার সাথে থাকবে।

সবশেষে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তার জবাবে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তাঁর কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করতে হবে একথা তাঁকে জানিয়ে দেন।

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরা আল লাইলে মূলত ভালো মানুষের একটি স্তর (সাহাবী) এর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পরের ২ টি সূরায় সরাসরি মুহাম্মাদ (স) এর কথা এসেছে। এই সূরা দুহায় মুহাম্মাদ (স) কে সান্তনা দেওয়া হয়েছে ও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ বর্ননা করা হয়েছে এবং পরের সূরা আল ইনশিরাহ তে মুহাম্মাদ (স) কে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে (৯৩ নং) সূরা আদ দুহা এর সাথে এই (৯৪ তম) সূরা আল ইনশিরাহ এর গভীর মিল রয়েছে। ১ম ভাগে আল্লাহর দেয়া বিষয়বস্তু বর্নিত হয়েছে, পরের ভাগে পাওয়ার পর বিনিময়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সূরা আদ দুহার ৬ নং আয়াতের গঠন ও বিষয়বস্তুর সাথে সূরা আল ইনশিরাহ এর ১ নং আয়াতের গঠন ও বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে। এভাবে ৭, ৮ এর সাথে ২; ১১ এর সাথে ৮ এর মিল রয়েছে। এক কথায় ২ টি সূরার গঠন, বিষয়বস্তু, ধারা-বর্ননাতে গভীর মিল বিদ্যমান।

তাফসীর

وَالضُّحَىٰ

১. শপথ পূর্বাহ্নের,

এখানে 'দুহা' শব্দটি রাতের মোকাবেলায় ব্যবহার করা হয়েছে তাই এর অর্থ উজ্জ্বল দিবা । সূরা আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে এর নজীর হিসেবে পেশ করা যায় :

যেমন আল্লাহ বলেন, -أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ 'আর জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, তাদের উপর আমার আযাব এসে পড়বে দিনের বেলায়, যখন তারা থাকবে খেলাধুলায় মত্ত' (*আ'রাফ ৭/৯৮*)।

এই আয়াতগুলোতে ও "দুহা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রাতের মোকাবেলায়। আর এর অর্থ চাশত এর সময় নয়, বরং দিন।

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

২. শপথ রাতের যখন তা হয় নিঝুম

سَجَا يَسْجُوْ سَجْوًا 'রাত্রি নিথর হওয়া'। إِذَا سَجَى অর্থ إذا سكن أهله وأصواتهم فيه 'যখন এর অধিবাসীগণ ও তাদের আওয়াযসমূহ নীরব হয়ে যায়' (*তানতাভী*)। অর্থাৎ রাত্রি যখন গভীর হয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا 'এবং রাতকে করেছেন নিথর' (*আন'আম ৬/৯৬*)।

সূরার শুরুতে ১ম আয়াতে আল্লাহ শপথ করেছেন- 'দুহা' বলতে এমন একটা সময় বোঝায় যখন দিনের কর্মব্যস্ততা শুরু হয় এবং সূর্যের আলোও প্রখর নয়। ২য় আয়াতের 'লাইল' বলতে রাত বোঝায়। এখানে বলা হয়েছে যখন তা গভীর ও নিঝুম হয়। তখন শান্তি ও বিশ্রাম নেয় মানুষ। সূর্যের আলোর উপস্থিতি (দুহা) ও অনুপস্থিতি (লাইল) এর মাধ্যমে ওহী এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। দুটিই প্রকৃতির অংশ এবং দুটিরই দরকার আছে। সবসময় দিনের আলো থাকলে যেমন শান্তি পাওয়া যেত না তেমনি সবসময় ওহীর আগমনও শান্তিদায়ক নয়। দিনের পর রাত আসে আবার রাতের পর দিন; এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। তেমনি কিছু সময় ওহীর অনুপস্থিতি ও উপস্থিতিও তেমন একটি প্রক্রিয়া। সূর্যের কষ্টদায়ক প্রখর রোদের সময়ের শপথ না করে 'দুহা' এর শপথ করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ এমন বেশি কষ্ট দিতে চান না যেন তার নবী অতিরিক্ত ওহীর ভার সহ্য করতে না পারেন। এজন্যই ওহীর বিরতি। আলোকে সাধারনত আশা হিসাবে বিবেচনা করা হয়; বলা হয় আশার আলো। তাই আল্লাহ শুরুতেই আশার বানী শুনিয়েছেন। আবার প্রশান্তির রাতের কথা বলে আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে প্রশান্ত করেছেন।

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

৩. আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং শত্রুতাও করেন নি।

অর্থাৎ কাফেরদের মিথ্যাচার ও অপপ্রচার অনুযায়ী তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার উপরে রুষ্ট হননি। এখানে ইবনু আববাস ও ইবনু যুবায়ের (রাঃ) 'তাশদীদ' ছাড়াই مَا وَدَعَكَ পড়েছেন। যার অর্থ مَا تَرَكَكَ 'তোমাকে পরিত্যাগ করেননি'। তবে অন্য সবাই مَا وَدَّعَكَ তাশদীদযুক্ত পড়েছেন। যার অর্থ مَا قَطَعَكَ قَطْعَ المودِّع 'তোমাকে ছাড়েননি বিদায় দানকারীর বিদায়ের ন্যায়' *(কুরতুবী)*।

وَمَا قَلَى অর্থ وما أبغضك 'তোমার প্রতি রুষ্ট হননি'। আসলে হওয়া উচিত ছিল وَمَا قَلاَكَ কিন্তু পূর্বের ক্রিয়ায় ك উল্লেখিত হওয়ায় এবং আয়াতের শেষে হওয়ায় অলংকার শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী এখানে ك কর্মপদ বিলুপ্ত করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْراً وَّالذَّاكِرَاتِ 'আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও নারীগণ' (*আহযাব ৩৩/৩৫*)। এখানে শেষে الله কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি পূর্বে উল্লেখিত হওয়ার কারণে।

এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-কে এ বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যখন থেকে আল্লাহ তোমাকে ভালবেসেছেন এবং তোমার উপরে 'অহি' নাযিল শুরু হয়েছে, তখন থেকে আল্লাহ কখনোই তোমার উপরে রুষ্ট বা বিরূপ হননি। বরং সর্বদা তোমার উপরে তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত হ'তে থাকবে। দিবস ও রাত্রির শপথের মধ্যে এ গূঢ় রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যে, যে রাসূল সারা দিন কঠিন বিরোধিতার মুখে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং রাতের বেলায় আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে তাহাজ্জুদের ছালাতে মগ্ন থাকেন, দয়ালু আল্লাহ কি কখনো সেই রাসূলকে পরিত্যাগ করতে পারেন?

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

৪. আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে শ্রেয়।

এখানে الآخِرَة এবং الأُولَى শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ আখেরাত ও দুনিয়া নেয়া হলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, আমি আপনাকে আখেরাতে নেয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে দুনিয়া অপেক্ষা অনেক বেশী নেয়ামত দান করা হবে।

তাছাড়া الآخِرَة কে শাব্দিক অর্থে নেয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তীর্ণ অবস্থা; যেমন الأُولَى শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। তখন আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে জ্ঞানগরিমা ও আল্লাহর নৈকট্যে উন্নতি লাভ সহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত। আর আপনার জন্য আখেরাত তো দুনিয়া থেকে অনেক, অনেক বেশি উত্তম হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছাটাইতে শোয়ার কারণে তার পার্শ্বদেশে দাগ পড়ে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য একটি কিছু তৈরী করে দিতাম যা আপনাকে এরূপ কষ্ট দেয়া থেকে হেফাজত করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমার আর এ দুনিয়ার ব্যাপারটি কি? আমি ও দুনিয়ার উদাহরণ তো এমন যেমন কোন সওয়ারী কোন গাছের নীচে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিল তারপর সেটা ছেড়ে চলে গেল।" [ইবনে মাজাহঃ ৪১০৯, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৯১]

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

৫. আর অচিরেই আপনার রব আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দিবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের ও কুরআনের উন্নতি, সারা বিশ্বে হিদায়াতের প্রসার, শত্রুর বিরুদ্ধে তার বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কালেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। আর তার মৃত্যুর পর হাশরের ময়দানে ও জান্নাতেও তাকে আল্লাহ তা'আলা অনেক অনুগ্রহ দান করবেন।

হাদীসে আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পরবর্তীতে যে সমস্ত জনপদ বিজিত হবে তা একটি একটি করে পেশ করা হচ্ছিল। এতে তিনি খুশী হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা "অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমন দান করবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন" এ আয়াত নাযিল করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে হাজার প্রাসাদের মালিক বানালেন। প্রতিটি প্রাসাদে থাকবে প্রাসাদ উপযোগী খাদেম ও ছোট ছোট বাচ্চারা।

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন

এখান থেকে পরপর তিনটি আয়াতে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাঁকে দুনিয়াতে যেসব নে'মত ইতিমধ্যে দান করেছেন, সেগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রথম যে বড় অনুগ্রহ তাঁর উপর তিনি করেছিলেন, সেটি এই যে, তিনি পিতৃহীন ইয়াতীমরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর মাতৃহারা হন। সেই অসহায় অবস্থায় আল্লাহ তাঁর বৃদ্ধ দাদা ও পরে তাঁর চাচা আবু তালেবের আশ্রয়ে তাঁকে লালন-পালন করেন। দাদা ও চাচার অন্তরে আল্লাহ এমন মহববত ঢেলে দিয়েছিলেন যে, নিজের সন্তানের চাইতে ইয়াতীম মুহাম্মাদের প্রতি তাদের স্নেহ ছিল অপার ও অপরিসীম। এমনকি নবুঅত লাভের পরে প্রচন্ড বিপদ-মুছীবতের মধ্যেও বৃদ্ধ চাচা আবু তালেব-এর মধ্যে সেই স্নেহের সামান্যতম ঘাটতি দেখা যায়নি। কেবলমাত্র ভাতিজার মহববতে চাচা আবু তালেব তিনটি বছর কুরায়েশদের কঠিন বয়কট ও অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহ্য করেছেন। তথাপি ভাতিজাকে ছাড়েননি। সেই সাথে বনু হাশেম গোত্র ইসলাম কবুল না করা সত্ত্বেও রাসূল (সাঃ)-এর নিরাপত্তায় তারা ছিল অটুট দেওয়ালের মত। বস্তুতঃ এসবই ছিল আল্লাহর অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার ফল। এখানে কোন যুক্তি বা বস্তুগত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

৭. আর তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।

এখানে ضَالاً অর্থ غير عالم 'অনবহিত'। কেননা অহি নাযিলের পূর্বে রাসূল (সাঃ) শরী'আতের কিছুই জানতেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ 'এবং তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন, যা তুমি জানতে না' *(নিসা ৪/১১৩)*। فَهَدَى অর্থ فَأَرْشَدَكَ 'অতঃপর তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন' *(কুরতুবী)*।

অর্থাৎ ইতিপূর্বে তুমি ইসলামী শরী'আত বিষয়ে অবগত ছিলে না। অতঃপর আল্লাহ তোমাকে নবুঅতের মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করেছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيْمَانُ 'তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি?' (*শূরা ৪২/৫২*)। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা ইউসুফের শুরুতে উক্ত কাহিনী বর্ণনার সূচনায় আল্লাহপাক

স্বীয় রাসূলকে বলছেন, وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ 'যদিও তুমি ইতিপূর্বে ছিলে এ বিষয়ে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত' (*ইউসুফ ১২/৩*)। অর্থাৎ তুমি এ বিষয়ে কিছু জানতে না।

অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতে وَوَجَدَكَ ضَالاًّ অর্থ তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন সঠিক পথ সম্পর্কে অনবহিত। অতঃপর তিনি তোমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেন।
এখানে ضَالاًّ অর্থ 'পথভ্রষ্ট' নয়। কেননা পথভ্রষ্ট সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি পথ পেয়েও পথ হারান। কোন রাসূলের জীবনে এমন কিছু ঘটার প্রশ্নই ওঠে না।

فَهَدَى অর্থ فَهَدَاكَ 'অতঃপর তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন'। তবে এর অর্থ আরও ব্যাপক। وَهُدِىَ بِكَ فَهَدَاكَ 'তিনি তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন ও তোমার মাধ্যমে অন্যকে পথ দেখিয়েছেন'। ফলে তিনি هَادٍ وَمَهْدِىٌّ 'পথ প্রদর্শক ও পথপ্রাপ্ত'।

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

৮. আর তিনি আপনাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৈতৃক সূত্রে উত্তরাধিকার হিসেবে শুধুমাত্র একটি উটনী ও একটি বাঁদী লাভ করেছিলেন। এভাবে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সূচনা হয়। তারপর এমন এক সময় আসে যখন মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা হযরত খাদীজা (রা) প্রথমে ব্যবসায়ে তাঁকে নিজের সাথে শরীক করে নেন।তারপর তিনি তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন। এভাবে তাঁর সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্বও তিনি নিজের হাতে তুলে নেন।এই সুবাদে তিনি কেবল ধনীই হননি এবং তাঁর ধনাঢ্যতা নিছক স্ত্রীর ধনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না বরং তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানে তাঁর নিজের যোগ্যতা ও শ্রম বিরাট ভূমিকা পালন করে।

এখানে أَغْنَىٰ বলতে দুটি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ, তিনি আপনাকে ধনশালী করেছেন। অপর অর্থ, তিনি আপনাকে তাঁর নেয়ামতে সন্তুষ্ট করেছেন।

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

৯. কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না।

পূর্বের তিনটি আয়াতে তিনটি নে'মতের বর্ণনা দেওয়ার পর এক্ষণে রাসূল (সাঃ)-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। যার প্রথমটি হ'ল, তুমি কোন ইয়াতীমের উপরে কঠোর হবে না। যেহেতু তুমি নিজে এতিম ছিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন এবং এতিম অবস্থায় সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তোমাকে সাহায্য - সহায়তা দান করেছেন ,তাই আল্লাহর এই সাহায্যের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি কখনো কোন এতিমের প্রতি জুলুম করবে না।

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

১০. আর প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করবেন না।

দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, অর্থগত ও জ্ঞানগত প্রার্থীকে ধমক বা ভর্ৎসনা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিষেধ করা হয়েছে। যদি 'প্রার্থী' বলে এখানে সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, তাকে সাহায্য করতে পারলে করুক আর না করতে পারলে কোমল স্বরে তাকে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়ে দিন। কিন্তু কোনক্রমে তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করবেন না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই নির্দেশটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে "আপনি অভাবী ছিলেন তারপর আল্লাহ আপনাকে ধনী করে দিয়েছেন।" আর যদি 'প্রার্থীকে' জিজ্ঞেসকারী অর্থাৎ দ্বীনের কোন বিষয় বা বিধান জিজ্ঞেসকারী অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, এই ধরনের লোক যতই মূর্খ ও অজ্ঞ হোক না কেন এবং যতই অযৌক্তিক পদ্ধতিতে সে প্রশ্ন করুক বা নিজের মানসিক সংকট উপস্থাপন করুক না কেন, সকল অবস্থায়ই স্নেহশীলতা ও কোমলতা সহকারে তাকে জবাব দিন এবং ধমক দিয়ে বা কড়া কথা বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই বাণীটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে "আপনি পথের খোঁজ জানতেন না তারপর তিনিই আপনাকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন।" আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, সাহায্য প্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ।

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

১১. আর আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দিন।

'তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ সমূহের শুকরিয়া আদায় কর'। এটি হ'ল তৃতীয় বিষয়, যা আল্লাহ আদেশ করেছেন। এখানে নির্দেশ নবীর প্রতি হ'লেও তা সকলের প্রতি প্রযোজ্য। আল্লাহর অনুগ্রহে মানুষ দুনিয়াতে এসেছে ও চলাফেরা করছে। মানুষের উপরে আল্লাহর অনুগ্রহের শেষ নেই। অতএব প্রত্যেক মানুষের উপরে অবশ্য কর্তব্য হ'ল প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

মুজাহিদ বলেন, এখানে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ হ'ল- নবুঅত ও কুরআন *(ইবনু কাছীর)*, যা কেবল রাসূল (সাঃ)-এর জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম নে'মত। এই নে'মতের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার-প্রসার করাই হ'ল আল্লাহর সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা বর্ণনা। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, - 'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে তোমার নিকটে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তুমি পৌঁছে দাও। যদি তুমি তা না কর, তাহ'লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না' (*মায়েদাহ ৫/৬৭*)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শেখায়'। তিনি আরও বলেন, 'একটি আয়াত জানলেও তা তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও'।

কুরআন ও হাদীছ ছাড়াও অন্যান্য নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা যরূরী। আমর বিন মায়মূন তার কোন বিশ্বস্ত ভাইকে পেলে বলতেন, গতকাল আল্লাহ আমাকে ছালাত আদায়ের তাওফীক দিয়েছেন বা অমুক নেকীর কাজ

করার অনুগ্রহ দান করেছেন'। এমনিতরো অভ্যাস আবু ফেরাস আব্দুল্লাহ বিন গালিব সহ অনেক মনীষীর ছিল (*কুরতুবী*)। উদ্দেশ্য ছিল উক্ত আয়াতের হুকুম অনুযায়ী আল্লাহর নে'মতের শুকরিয়া বর্ণনা করা।

মালেক বিন নাযলাহ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে যে, একদিন জনৈক ব্যক্তি জীর্ণবস্ত্র পরিধান করে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এলো। রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মাল-সম্পদ আছে'? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সকল প্রকারের মাল আছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, 'যখন আল্লাহ তোমাকে মাল দিয়েছেন, তখন তার নিদর্শন তোমার উপরে প্রকাশ পাওয়া উচিত'।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন এবং স্বীয় বান্দার উপরে তাঁর নে'মতের নিদর্শন দেখতে ভালবাসেন'।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না' ।অর্থাৎ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটা হ'ল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পূর্বশর্ত।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কিছু দান করল, অতঃপর সে তা পেল। তার উচিত হ'ল বিনিময়ে কিছু প্রদান করা (অর্থাৎ দো'আ করা)। যদি কিছু না পায়, তাহ'লে তার উচিত প্রশংসা করা। কেননা যে ব্যক্তি প্রশংসা করল, সে ব্যক্তি শুকরিয়া আদায় করল। আর যে ব্যক্তি চুপ থাকল, সে অকৃতজ্ঞ হলো'।

ফুটনোট

- এই সূরায় দুইটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে- সূর্যের আলোর উপস্থিতি (দুহা) ও অনুপস্থিতি (লাইল)।
- রাসূল সাঃ কে দেওয়া আল্লাহ্র তিনটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ সূরায়-
    - ইয়াতীম অবস্থায় পেয়ে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন
    - সঠিক পথের হেদায়াত দিয়েছেন
    - নিঃস্ব অবস্থায় পেয়ে অভাবমুক্ত করেছে।
- এই সূরায় রাসূল সাঃ কে তিনটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে-
    - ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর না হওয়া
    - প্রার্থীকে ভর্ৎসনা না করা
    - রবের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দেওয়া

আপনি যদি আল্লাহর জন্য আত্মনিবেদন করেন, আল্লাহ তাকে কখনো আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না। দিনের আলোর মত কখনো আল্লাহ্র নিয়ামতগুলো সুস্পষ্ট থাকবে কখনো রাতের অন্ধকারে নিঝুম (আল্লাহ পরীক্ষা নিবেন) থাকবে। কিন্তু ঠিকই অচিরেই আপনার রব আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৮

সূরা লাইল

সূরা আল লাইল আল-কুরআনের ৯২ তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ২১টি এবং এর রূকুর সংখ্যা ১টি। লাইল শব্দের অর্থ রাত্রি। আল লাইল সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এটি মাক্কী সূরা।

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াল লাইল কে এই সূরার নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

পূর্ববর্তী সূরা আশ শামসের সাথে এই সূরাটির বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এদিক দিয়ে এদের একটিকে অপরটির ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একই কথাকে সূরা আশ শামসে একভাবে বলা হয়েছে আবার সেটিকে এই সূরার অন্যভাবে বলা হয়েছে। এথেকে আন্দাজ করা যায়, এ দু'টি সূরা প্রায় একই যুগে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু

তিনটি বিষয়ের শপথ করে আল্লাহ বলছেন যে, কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে পৃথিবীতে মানুষ দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের লোক তারাই, যাদের সত্তাকে সরলপথে চলার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এরাই সফলকাম এবং তাদের তিনটি গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে (১-৭ আয়াত)। আরেক ধরনের লোক আছে, যাদের সত্তাকে বক্রপথে চলার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এরা ব্যর্থকাম এবং এদের তিনটি দোষ চিহ্নিত করা হয়েছে। অতঃপর তাদের পরিণতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৮-১৬)। সবশেষে আল্লাহর সন্তোষভাজন ব্যক্তিদের চরিত্র ও তাদের প্রতিদান বিবৃত করা হয়েছে (১৭-২১ আয়াত)।

আগের সূরা ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

৯১ তম সূরা আশ শামছ এর শুরুর দিকে দিনের প্রকাশ হওয়া ও রাতের ঢেকে যাওয়া বিষয়টা এসেছে। ৯২ তম সূরা আল লাইল এও প্রায় একই ভাবে বিষয় দুটি এসেছে একটু ভিন্নভাবে।

সূরা আশ শামছ এ আকাশ ও পৃথিবী এর কথা এসেছে কিন্তু পরের সূরায় পুরুষ ও নারীর কথা এসেছে। এই দুই ধরনের বিষয়ের মধ্যে বেশ মিল বিদ্যমান। আকাশ হতে বৃষ্টি আকারে পানি পড়ে এবং তার কারনে পৃথিবীতে জীবন (মানুষ ও গাছপালা) এর ধারা চলতে থাকে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী একসাথে কাজ করে জীবন এর ধারাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। তেমনিভাবে পুরুষ ও নারী একসাথে কাজ করে জীবন এর ধারাকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

সূরা আশ শামছ এর ৯ নং আয়াতে নাফসের পরিশুদ্ধির কারনে সফলতার কথা বলা হয়েছে এবং পরের সূরা আল লাইল এ সেই পরিশুদ্ধি কারীদের বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল বর্নিত হয়েছে (আয়াত ৫,৬,৭)। এই সরার ১০ নং আয়াতে নাফসকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার সুফল ও না করার কারনে ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে এবং সূরা আল লাইল এ সেই সফলতা ও ব্যর্থতার কারন বিস্তারিতভাবে বর্নিত হয়েছে ৮,৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে।

সূরা আশ শামছ এ অবাধ্যতা, বিদ্রোহ পতনের অন্যতম কারন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে (আয়াত ১১) এবং পরের সূরায় অর্থ লোভ পতনের অন্যতম কারন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে (আয়াত ১১)। সূরা আশ শামছ এ আল্লাহর নিদর্শন (উটনী) থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে কিন্তু অপরাধীরা কাছে এসে তা লঙ্ঘন করেছে। আর পরের সূরায় আল্লাহর নিদর্শন (আল কুরআন/হেদায়াত) এর কাছে আসতে বলা হয়েছে কিন্তু অপরাধীরা দূরে চলে গিয়ে তা লঙ্ঘন করেছে।

৯১ তম সূরায় আল্লাহর নবী সামূদ জাতির অপরাধীদের সতর্ক করেছেন (আয়াত ১৩) আর পরের সূরায় আল্লাহ নিজেই মুহাম্মাদ (সঃ) ও তার পরবর্তি জাতিদের সতর্ক করেছেন (আয়াত ১৪)। আশ শামছ এ হতভাগ্য ব্যাক্তির চরিত্র বর্নিত হয়েছে (আয়াত ১২) এবং দুনিয়ায় তার পরিনতির কথা বলা হয়েছে (আয়াত ১৪)। পরের সূরা আল লাইল এ হতভাগ্য ব্যাক্তির চরিত্র ও আখিরাতে পরিনতির কথা বর্নিত হয়েছে (আয়াত ১৫, ১৬)

৯১ তম সূরা আশ শামছ এর শেষে আল্লাহ শাস্তি দেওয়ার কথা বলেছেন ক্ষোভের সাথে (আয়াত ১৪,১৫) কিন্তু পরের সুরায় আল্লাহ শাস্তি থেকে দূরে রাখার ফলে বাঁচিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন সন্তুষ্টির সাথে (আয়াত ১৮)। সূরা আশ শামছ এ আল্লাহর শাস্তির ক্ষেত্রে পরিমান ও ভয়াবহতার কথা বলা হয়েছে (আয়াত ১৪) কিন্তু পরের সূরায় পুরষ্কারের ক্ষেত্রে কোন পরিমান এর কথা বলা হয়নি, অর্থাৎ মানুষ আসলে চিন্তাও করতে পারে না সেই পুরস্কারের পরিমানের কথা কারন আল্লাহ অশেষ পুরষ্কার দানকারী।

সূরা আল লাইলে মূলত ভালো মানুষের একটি স্তর (সাহাবী) এর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পরের ২ টি সূরায় সরাসরি মুহাম্মাদ (স) এর কথা এসেছে। ৯৩ তম সূরা দুহায় মুহাম্মাদ (স) কে সান্তনা দেওয়া হয়েছে ও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ বর্ননা করা হয়েছে।

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

১. শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে,

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

২. শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়

এখানে রাত্রি ও দিবসের শপথ করার মাধ্যমে এ দু'টির গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। এখানে উভয়ের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। যে দু'টি বৈশিষ্ট্য সকলের নিকটে স্পষ্ট। অর্থাৎ রাত্রির বৈশিষ্ট্য হ'ল 'আচ্ছন্ন করা'। আর দিনের বৈশিষ্ট্য হল 'অন্ধকার ঠেলে দিন প্রকাশিত হওয়া'। কিন্তু কেবল এটুকু বুঝানোর জন্য শপথ করা হয়নি। বরং এতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে গভীর তাৎপর্য এবং রয়েছে সৌরবিজ্ঞানের মূল্যবান উৎস। কেবল এখানেই নয়, বরং কুরআনে বর্ণিত সকল শপথই বিজ্ঞানের উৎস কেন্দ্র। যেমন এখানে রাত্রির শপথ করা হয়েছে 'আচ্ছন্নকারী' হিসাবে। এর তাৎপর্য কি?

প্রথমতঃ রাত্রি ও দিনের প্রতিটিই কিছু বস্তুকে আচ্ছন্ন করে ও কিছু বস্তুকে প্রকাশ করে। যেমন রাত্রি আকাশের চাঁদ ও নক্ষত্ররাজিকে প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে। পক্ষান্তরে দিন আকাশের নক্ষত্ররাজিকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে প্রকাশ করে দেয়। এর মধ্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতির বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান রয়েছে। যা ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজের অক্ষের উপরে ঘুরে থাকে। লাটিমের মত ঘূর্ণনের সময় পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে পড়ে, সেই অংশে দিন হয় এবং অপরাংশে রাত হয়। সেকারণ আচ্ছন্নকারী হল রাত্রি, দিন নয়। কেননা দিন অর্থাৎ সূর্য সদা প্রকাশিত। বস্তুতঃ এটি কুরআনের বিস্ময়কর তথ্যসমূহের অন্যতম।

দ্বিতীয়তঃ রাতের বেলায় যা কিছু প্রকাশিত হয় ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিসমূহের সারৎসার মাত্র। কিন্তু দিনের বেলায় যা আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, তা হল ঐসব সৃষ্টির তুলনায় সরিষাদানা সমতুল্য। আর তা হল পৃথিবী নামক এই ছোট্ট গ্রহটি। যার সবকিছু আমরা বড় ও স্পষ্ট দেখি হাতের কাছে থাকার কারণে। পক্ষান্তরে আকাশের বড় বড় নক্ষত্ররাজিকে আমরা ছোট দেখি, দূরে এবং নাগালের বাইরে থাকার কারণে।

দিবস ও রাত্রির এই আসা-যাওয়ার মধ্যে মানুষের দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনের দৃষ্টান্ত লুকিয়ে রয়েছে। মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে, ততক্ষণ সে কূয়ার ব্যাঙের মত কেবল তার আশপাশের ছোট্ট দুনিয়াটুকু দেখে। কিন্তু মৃত্যুর পরে বিশাল এক জগতের দৃশ্য তার সামনে ভেসে ওঠে, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। যার সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। ঠিক যেমন সূর্যাস্তের পর রাতের পর্দা উন্মোচিত হলে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে লক্ষ-কোটি নক্ষত্রশোভিত সীমাহীন আকাশের এক অনিন্দ্যসুন্দর ক্যানভাস। একথাটাই আল্লাহ বলেছেন এভাবে- 'তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন আমরা তোমার থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ' (ক্বাফ ৫০/২২)।

ঘুমের স্বপ্নজগত থেকে জেগে উঠে মানুষ যেমন সবকিছু নতুন দেখে, দুনিয়ার এ স্বপ্নজগত শেষে মৃত্যুর পরে সে দেখবে নতুন এক বিস্ময়কর জগত। সে তখন পরকালের অনন্ত জীবনের বাসিন্দা হবে। ইহকালের সাথে তার কোনই সম্পর্ক থাকবে না। যেমন সূর্য ডুবে গেলে দিনের সাথে রাতের কোন সম্পর্ক থাকে না। আল্লাহ বলেন, 'তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' (মুমিনূন ২৩/১০০)। কবরের ঐ জগতকে এজন্যই বলা হয় 'বরযখী জগত'। অর্থাৎ পর্দার জগত। ওখানে গিয়ে দুনিয়ার কারুর কোন উপকার বা ক্ষতি কেউ করতে পারে না। যারা ছবি-মূর্তি, প্রতিকৃতি বা কবরপূজা করে এবং মৃত ব্যক্তির নিকটে বা তার অসীলায় কিছু কামনা করে, তারা অলীক কল্পনার পিছনে ছুটে মাত্র। তারা কুরআনের বিরোধিতা করে এবং প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হয়। রাত্রির আচ্ছন্ন করা এবং দিবসের আলোকিত হওয়ার শপথ করে আল্লাহ এই দুয়ের কল্যাণকারিতার বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার প্রতি যেমন বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তেমনি দুনিয়ায় নেক আমলের মাধ্যমে আখেরাতে মুক্তি হাছিলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

৩. শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।

এখানে রাত্রি ও দিবসের শপথ করার মাধ্যমে এ দু'টির গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। এখানে উভয়ের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। যে দু'টি বৈশিষ্ট্য সকলের নিকটে স্পষ্ট। অর্থাৎ রাত্রির বৈশিষ্ট্য হল 'আচ্ছন্ন করা'। আর দিনের বৈশিষ্ট্য হল 'অন্ধকার ঠেলে দিন প্রকাশিত হওয়া'। কিন্তু কেবল এটুকু বুঝানোর জন্য শপথ করা হয়নি। বরং এতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে গভীর তাৎপর্য এবং রয়েছে সৌরবিজ্ঞানের মূল্যবান উৎস। কেবল এখানেই নয়, বরং কুরআনে বর্ণিত সকল শপথই বিজ্ঞানের উৎস কেন্দ্র। যেমন এখানে রাত্রির শপথ করা হয়েছে 'আচ্ছন্নকারী' হিসাবে। এর তাৎপর্য কি?

প্রথমতঃ রাত্রি ও দিনের প্রতিটিই কিছু বস্তুকে আচ্ছন্ন করে ও কিছু বস্তুকে প্রকাশ করে। যেমন রাত্রি আকাশের চাঁদ ও নক্ষত্ররাজিকে প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে। পক্ষান্তরে দিন আকাশের নক্ষত্ররাজিকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে প্রকাশ করে দেয়। এর মধ্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতির

বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান রয়েছে। যা ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজের অক্ষের উপরে ঘুরে থাকে। লাটিমের মত ঘূর্ণনের সময় পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে পড়ে, সেই অংশে দিন হয় এবং অপরাংশে রাত হয়। সেকারণ আচ্ছন্নকারী হল রাত্রি, দিন নয়। কেননা দিন অর্থাৎ সূর্য সদা প্রকাশিত। বস্ততঃ এটি কুরআনের বিস্ময়কর তথ্যসমূহের অন্যতম।

দ্বিতীয়তঃ রাতের বেলায় যা কিছু প্রকাশিত হয় ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিসমূহের সারৎসার মাত্র। কিন্তু দিনের বেলায় যা আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, তা হল ঐসব সৃষ্টির তুলনায় সরিষাদানা সমতুল্য। আর তা হল পৃথিবী নামক এই ছোট্ট গ্রহটি। যার সবকিছু আমরা বড় ও স্পষ্ট দেখি হাতের কাছে থাকার কারণে। পক্ষান্তরে আকাশের বড় বড় নক্ষত্ররাজিকে আমরা ছোট দেখি, দূরে এবং নাগালের বাইরে থাকার কারণে।

দিবস ও রাত্রির এই আসা-যাওয়ার মধ্যে মানুষের দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনের দৃষ্টান্ত লুকিয়ে রয়েছে। মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে, ততক্ষণ সে কূয়ার ব্যাঙের মত কেবল তার আশপাশের ছোট্ট দুনিয়াটুকু দেখে। কিন্তু মৃত্যুর পরে বিশাল এক জগতের দৃশ্য তার সামনে ভেসে ওঠে, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। যার সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। ঠিক যেমন সূর্যাস্তের পর রাতের পর্দা উন্মোচিত হ'লে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে লক্ষ-কোটি নক্ষত্রশোভিত সীমাহীন আকাশের এক অনিন্দ্যসুন্দর ক্যানভাস। একথাটাই আল্লাহ বলেছেন এভাবে- 'তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন আমরা তোমার থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ' (ক্বাফ ৫০/২২)।

ঘুমের স্বপ্নজগত থেকে জেগে উঠে মানুষ যেমন সবকিছু নতুন দেখে, দুনিয়ার এ স্বপ্নজগত শেষে মৃত্যুর পরে সে দেখবে নতুন এক বিস্ময়কর জগত। সে তখন পরকালের অনন্ত জীবনের বাসিন্দা হবে। ইহকালের সাথে তার কোনই সম্পর্ক থাকবে না। যেমন সূর্য ডুবে গেলে দিনের সাথে রাতের কোন সম্পর্ক থাকে না। আল্লাহ বলেন, 'তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' (মুমিনূন ২৩/১০০)। কবরের ঐ জগতকে এজন্যই বলা হয় 'বরযখী জগত'। অর্থাৎ পর্দার জগত। ওখানে গিয়ে দুনিয়ার কারোর কোন উপকার বা ক্ষতি কেউ করতে পারে না। যারা ছবি-মূর্তি, প্রতিকৃতি বা কবরপূজা করে এবং মৃত ব্যক্তির নিকটে বা তার অসীলায় কিছু কামনা করে, তারা অলীক কল্পনার পিছনে ছুটে মাত্র। তারা কুরআনের বিরোধিতা করে এবং প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হয়।

রাত্রির আচ্ছন্ন করা এবং দিবসের আলোকিত হওয়ার শপথ করে আল্লাহ এই দু'য়ের কল্যাণকারিতার বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার প্রতি যেমন বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তেমনি দুনিয়ায় নেক আমলের মাধ্যমে আখেরাতে মুক্তি হাছিলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

৩. শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।

এ কথার জন্যই রাত ও দিন এবং নারী ও পুরুষের জন্মের কসম খাওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য এই হতে পারে যে, যেভাবে রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী পরস্পর থেকে ভিন্ন ও বিপরীত ঠিক তেমনই তোমরা যেসব কর্মপ্রচেষ্টা চালাচ্ছে সেগুলোও বিভিন্ন ধরনের এবং বিপরীত। কেউ ভালো কাজ করে, আবার কেউ খারাপ কাজ করে। হাদীসে আছে, "প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় উঠে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ

এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে আখেরাতের আযাব থেকে মুক্ত করে; আবার কেউ নিজেকে ধ্বংস করে।" [মুসলিম: ২২৩]

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ

৫. কাজেই কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে,

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ

৬. এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে,

অত্র দু'টি আয়াতে সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের তিনটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এক- যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে। দুই- আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং তিন- 'উত্তম বিষয়' অর্থাৎ তাওহীদের কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কে মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আয়াত দু'টি আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়। আর এটাই সকল মুফাসসির বলেন । ইবনু জারীর 'আমের বিন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, আবুবকর (রাঃ) মক্কায় থাকাকালে ইসলাম কবুলকারী বৃদ্ধা ও নারীদের তাদের মনিবদের নিকট থেকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতেন। এতে আপত্তি করে তাঁর পিতা আবু ক্বোহাফা বলেন, বেটা! আমি দেখছি তুমি কেবল দুর্বলদের মুক্ত করছ। যদি তুমি শক্তিশালী ও সাহসী পুরুষ লোকদের মুক্ত করতে, তাহ'লে তারা তোমাকে সাহায্য করত ও তোমার পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতো। জবাবে আবুবকর (রাঃ) বলেন 'হে পিতা! আমি তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই'। রাবী 'আমের বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি উক্ত প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছিল'। (ইবনু জারীর ৩০/১৪২ পৃঃ; কুরতুবী, ইবনু কাছীর।)

উল্লেখ্য, হযরত 'আমের হলেন, হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)-এর পৌত্র এবং আবুবকর (রাঃ)-এর নাতি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর পুত্র।

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى অর্থ 'উত্তম কালেমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে'। ইবনু আববাস, যাহহাক প্রমুখ বলেন, কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কে সত্য বলে বিশ্বাস করে। ক্বাতাদাহ বলেন, আল্লাহর পথে ব্যয় ও আল্লাহভীরুতার উত্তম প্রতিদানে বিশ্বাস পোষণ করে (ইবনু কাছীর)। সবগুলি কাছাকাছি মর্ম বহন করে। কেননা তাওহীদে বিশ্বাসী না হলে কেউ পরকালীন ছওয়াবে বিশ্বাসী হবে না এবং নিঃস্বার্থভাবে সৎকর্ম করবে না।

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

৭. আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।

আমরা সিরাতে মুস্তাক্বীম-এর পথ প্রদর্শন করব এবং সেপথে চলা তার জন্য সহজ করে দেব। যায়েদ বিন আসলাম বলেন, 'সরল পথের জন্য' অর্থ 'জান্নাতের জন্য'। কেননা জান্নাতের পথই সরল পথ বা ছিরাতে মুস্তাক্বীম। আর এ পথের শেষ ঠিকানাই হল জান্নাত।

আয়াতে س অর্থ 'সত্বর' যা এসেছে تحقيق বা নিশ্চয়তা বুঝানো জন্য। অর্থাৎ তার দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কাজ আল্লাহ সহজ করে দিবেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ-কর্ম সহজ করে দেন' (তালাক ৬৫/৪)।

আলোচ্য আয়াতে যে তিনটি গুণের বিনিময়ে জান্নাতের পথ সহজ করে দেবার ওয়াদা করা হয়েছে, মূলতঃ ঐ গুণাবলী তারাই হাছিল করেন, যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ফলে সৎকর্ম করা তাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হবে। এদের পক্ষে জাহান্নামের কাজ করাটাই কষ্টকর এমনকি অসম্ভব হবে।

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

৮. আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজেরা অমুখাপেক্ষী মনে করলে,

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ

৯. আর যা উত্তম তাতে মিথ্যারোপ করলে,

এটি দ্বিতীয় ধরনের মানসিক প্রচেষ্টা। মহান আল্লাহ এখানে তাদের তিনটি কর্ম উল্লেখ করে বলেছেন যে, আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তা তাঁর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা ফরয-ওয়াজিব-মুস্তাহাব কোন প্রকার সদকা দেয় না, আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের পরিবর্তে, তার প্রতি ইবাদত করার পরিবর্তে বিমুখ হয়ে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে এবং উত্তম কলেমা তথা ঈমানের যাবতীয় বিষয়কে মিথ্যা মনে করে; তার জন্য কঠিন পথে চলা সহজ করে দিব। এখানে কঠিন পথ অর্থ কঠিন ও নিন্দনীয় অবস্থা তথা খারাপ কাজকে সহজ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে প্রথম ধরনের প্রচেষ্টাটির সাথে প্রতি পদে পদে রয়েছে এর অমিল। কৃপণতা মানে শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থে যাকে কৃপণতা বলা হয় তা নয়, বরং এখানে কৃপণতা বলতে আল্লাহর ও বান্দার হকে সামান্য কিছু হলেও ব্যয় না করা বুঝাচ্ছে।

আর বেপরোয়া হয়ে যাওয়া ও অমুখাপেক্ষী মনে করা হলো তাকওয়া অবলম্বনের সম্পূর্ণ বিপরীত স্তর। তাকওয়া অবলম্বনের কারণে মানুষ তার নিজের দূর্বলতা এবং তার স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষীতার মর্ম বুঝতে পারে। এ-জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আখুশি হন এমন কোন বিষয়ের ধারে কাছেও যায় না, আর যাতে খুশি হন তা করার সর্বপ্রচেষ্টা চালায়। আর যে ব্যক্তি নিজেকে তার রবের অমুখাপেক্ষী মনে করে, সে বেপরোয়া হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা কোন কাজে খুশি হন। আর কোন কাজে নাখোশ হন তার কোন তোয়াক্কা করে না। তাই তার কাজকর্ম কখনো মুত্তাকীর কর্মপ্রচেষ্টার সমপর্যায়ের হতে পারে না। উত্তম কালমায় মিথ্যারোপ করা অর্থ ঈমানী শক্তিকে নষ্ট করে দিয়ে ঈমানের কালিমা ও আখেরাতের কথা মিথ্যা গণ্য করা।

পূর্বের আয়াতে জান্নাতী বান্দাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা শেষে এবার জাহান্নামীদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এক- তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার বিষয়ে কৃপণতা করবে। দুই- আল্লাহর অবাধ্যতায় বেপরওয়া হবে এবং তিন- তাওহীদের কালেমায় মিথ্যারোপ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বাণীর অবাধ্যতা করবে। তাদের জন্য কঠিন পথ অর্থাৎ জাহান্নামের পথ সহজ করে দেয়া হবে। অসৎকর্ম করা তখন তাদের মজ্জাগত হয়ে যাবে। এদের পক্ষে জান্নাতের কাজ করাটা কষ্টকর এমনকি অসম্ভব হবে।

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ

১০. তার জন্য আমরা সুগম করে দেব কঠোর পথ।

এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহর পথে দান করা, আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি সৎ ও উত্তম কাজের জন্যে সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে খারাপ ও দুর্ভাগ্যের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এ আয়াতগুলোতে তাকদীরের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া আছে। হাদীসে এসেছে, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা বাকী আল-গারকাদে এক জানাযায় এসেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেখানে আসলেন, তিনি বসলে আমরাও বসে গেলাম। তার হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি সেটি দিয়ে মাটিতে খোচা দিচ্ছিলেন।

তারপর বললেন, "তোমাদের প্রত্যেকের এমনকি প্রতিটি আত্মারই স্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গেছে। প্রত্যেকের ব্যাপারেই সৌভাগ্যশালী কিংবা দূর্ভাগা লিখে দেয়া হয়েছে। তখন একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের লিখা গ্রন্থের উপর নির্ভর করে কাজ-কর্ম ছেড়ে দেব না? কারণ, যারা সৌভাগ্যশালী

তারা তো অচিরেই সৌভাগ্যের দিকে ধাবিত হবে, আর যারা দূর্ভাগা তারা দূর্ভাগ্যের দিকে ধাবিত হবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যারা সৌভাগ্যশালী তাদের জন্য সৌভাগ্যপূর্ণ কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে, পক্ষান্তরে যারা দূর্ভাগা তাদের জন্য দূর্ভাগ্যপূর্ণ কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন।" [বুখারী: ৪৯৪৮, মুসলিম: ২৬৪৭]

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ

১১. আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।

বখীলের ধন-সম্পদ যেমন তার জীবদ্দশায় কোন কাজে লাগে না, তার মৃত্যুর পরেও কোন কাজে লাগে না। কেননা মৃত্যুর পূর্বে সে মাল কমে যাওয়ার ভয়ে কোনরূপ ছাদাক্বায়ে জারিয়া করে যায় না। সে নিজের জন্য কিছু খরচ করে না, পরের জন্য তো প্রশ্নই ওঠে না। ফলে মৃত্যুর পরে সে কিছুই পায় না। তার আমলনামা শূন্য থাকে। আল্লাহ বলেন, 'তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছিল, ক্বিয়ামতের দিন সেগুলিই তাদের গলায় বেড়ী হবে' (আলে ইমরান ৩/১৮০)।

ক্বিয়ামতের দিন সে আফসোস করে বলবে, 'আমার মাল আমার কোন কাজে আসল না'। 'আমার রাজনৈতিক ক্ষমতা ধ্বংস হয়েছে' (হা-ক্কাহ ৬৯/২৮-২৯)। আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (সাঃ) কা'বা গৃহের ছায়ায় বসেছিলেন। এমন সময় আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'কা'বার মালিকের কসম! অধিক ধনশালীরা ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি বলেন, এরা ক্বিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। কেবল তারা ব্যতীত, যারা নেকীর কাজে সাদাক্বা করেছে'। তিনি বলেন, তুমি ছাদাক্বা কর যখন তুমি সুস্থ, লোভী, দারিদ্র্যভীরু ও ধনী হওয়ার আকাংখী থাক। মৃত্যু ওষ্ঠাগত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো না। তিনি আরও বলেন, 'কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনো একত্রিত হ'তে পারে না'। আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি দান কর। আমি তোমাকে দান করব'। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'তুমি দান কর। গণনা করো না। তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে দান করার সময় গণনা করবেন। ধরে রেখ না। তাহ'লে আল্লাহ তোমার ব্যাপারে (রহমতকে) ধরে রাখবেন। অতএব অল্প হলেও তুমি সাধ্যমত দান কর'। তিনি বলেন, তোমরা সাদাক্বা কর। কেননা এমন একটি যামানা তোমাদের নিকট আসছে, যখন মানুষ সাদাক্বা নিয়ে ঘুরবে। কিন্তু তা নেওয়ার মত লোক পাবে না। তারা বলবে, গতকাল পেলে নিতাম, আজ আমার প্রয়োজন নেই'।

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ

১২. নিশ্চয় আমাদের কাজ শুধু পথনির্দেশ করা

হিদায়াত ও প্রদর্শিত সরল পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে, আর তা হলো, হেদায়াতপূর্ণ সরল পথ আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌছে দেয়, যেমনিভাবে ভ্রষ্টপথ জাহান্নামে পৌছে দেয়। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, "আর সোজা পথ (দেখাবার দায়িত্ব) আল্লাহরই ওপর বার্তায় যখন বাঁকা পথও রয়েছে।" [সূরা আন-নাহল: ৯]

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ

১৩. আর আমরাই তো মালিক আখেরাতের ও প্রথমটির (দুনিয়ার)।

এখানে 'আখেরাত'কে আগে আনা হয়েছে তার গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য। তাছাড়া দুনিয়াতে কর্তৃত্ব অনেকের থাকতে পারে। কিন্তু আখেরাতে কর্তৃত্ব এককভাবে আল্লাহর। যেমন তিনি বলেন, '(আল্লাহ সেদিন

জিজ্ঞেস করবেন) আজ কর্তৃত্ব কার? কেবলমাত্র আল্লাহর; যিনি একক ও পরাক্রমশালী' (মুমিন/গাফের ৪০/১৬)।

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক মালিকানা কেবলমাত্র আল্লাহর হাতে। এই মালিকানায় কেউ সামান্যতম শরীক নয়। আল্লাহ বলেন, 'অতএব পবিত্র তিনি, যার হাতে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' (ইয়াসীন ৩৬/৮৩)। বস্তুতঃ সুপথে চলা ও পথভ্রষ্ট হওয়ার মধ্যে আল্লাহর কোন লাভ-ক্ষতি নেই। বরং এতে কেবল বান্দারই কল্যাণ ও অকল্যাণ নিহিত রয়েছে।

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ

১৪. অতঃপর আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।

এ লেলিহান আগুনের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন যে জাহান্নামীর সবচেয়ে হাল্কা আযাব হবে তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার পায়ের নীচে আগুনের কয়লা রাখা হবে এতেই তার ঘিলু উৎরাতে থাকবে।" [বুখারী: ৬৫৬১, মুসলিম: ২১৩]

এখানে আল্লাহ নিজেই জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করছেন। এর মধ্যে তিনটি বিষয় প্রতিভাত হয়। (১) জাহান্নাম যে অবধারিত সত্য সেটা দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে (২) এর দ্বারা জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে (৩) রাসূল (সাঃ)-এর ভয় প্রদর্শন মূলতঃ আল্লাহরই ভয় প্রদর্শন, সেকথা বলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি নিজে কখনো সশরীরে মানুষের কাছে এসে ভয় দেখান না। অন্যত্র 'আমরা' বহুবচনের পদ ব্যবহার করলেও আল্লাহ এখানে 'আমি' একবচন পদ ব্যবহার করেছেন দৃঢ়ভাবে একথা বলে দেওয়ার জন্য যে, রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মুখ দিয়ে কুরআনের যে সকল বাণী মানবজাতির উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়, তা সবই সরাসরি আল্লাহর বাণী। এমনকি যে সকল হাদীস তিনি বর্ণনা করেন, মর্মগত দিক দিয়ে সেগুলিও আল্লাহর বাণী। কেননা শারঈ বিষয়ে তিনি নিজে থেকে কোন কথা বলেন না, যতক্ষণ না তাকে 'অহি' করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তিনি নিজ থেকে কোন কথা বলেন না'। 'যা বলেন তা 'অহি' ব্যতীত কিছুই নয়, যা তাঁর নিকটে করা হয়' (নাজম ৫৩/৩-৪)।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন মানবজাতিকে জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে। সেমতে মক্কায় নবুঅতী জীবনের শুরুতে যখন আল্লাহর হুকুম হ'ল, 'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর' (শো'আরা ২৬/২১৪), তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বপ্রথম স্বীয় আত্মীয়-পরিজনকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেন।

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى

১৫. তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

১৬. যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পূর্বের আয়াতে الْأَتْقَى -এর বিপরীতে এখানে الْأَشْقَى এসেছে। অর্থাৎ সর্বাধিক হতভাগা। যাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে আছে। তাদের বৈশিষ্ট্য হল 'সে প্রথমে অহির বিধানে মিথ্যারোপ করে, অতঃপর বিধান মান্য করা থেকে পিঠ ফিরিয়ে নেয়'।

আবু জাহল, উমাইয়া বিন খালাফ ও তাদের ন্যায় দুষ্ট লোকদের উদ্দেশ্যে আয়াতটি নাযিল হয় (কুরতুবী)। কেননা এরা ছিল মক্কার সবচেয়ে দুরাচার নেতৃবৃন্দ। যারা রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং তাঁকে সত্য জেনেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তবে আয়াতটির মর্ম সকল যুগের হতভাগাদের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যারা দুর্ভাগা হবে, তারা জাহান্নামে যাবে' (হূদ ১১/১০৬) 'পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে যাবে' (হূদ ১১/১০৮)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল তারা ব্যতীত যারা অস্বীকার করে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কারা অস্বীকার করে? রাসূল (সাঃ) বললেন, যারা আমার আনুগত্য করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা আমার অবাধ্যতা করে, তারাই অস্বীকার করে'।

আবু ইসহাক আয-যাজ্জাজ বলেন, মুর্জিয়াগণ এই আয়াতকে দলীলরূপে গ্রহণ করে বলে থাকে যে, 'জাহান্নামে কেবল কাফেররাই প্রবেশ করবে'। মুমিনরা নয়। কেননা তাদের নিকট হৃদয়ে বিশ্বাস অথবা মুখে স্বীকৃতিই মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমল শর্ত নয়। কারণ আমল ঈমানের অংশ নয়'। অথচ এই আয়াত থেকে তাদের দলীল নেবার কোন সুযোগ নেই। কেননা জাহান্নামীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল মুনাফিকদের জন্য। যারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে (নিসা ৪/১৪৫)। আল্লাহপাক জাহান্নামীদের নানাবিধ শাস্তির কথা বলেছেন। আল্লাহ যার জন্য যেরূপ শাস্তি নির্ধারণ করবেন, তাকে সেভাবেই শাস্তি দিবেন। আল্লাহ বলেছেন, শিরকের গোনাহ তিনি মাফ করবেন না। এছাড়া বাকী সকল গোনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন (নিসা ৪/৪৮,১১৬)। এক্ষণে ঐসব পাপী যারা শিরক করেনি, তাদের কারু যদি পাপের শাস্তি তিনি না দিবেন, তাহলে 'তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন' বলার তো কোন অর্থ হয় না' । অতএব প্রকৃত কথা এই যে, কবীরা গোনাহগার মুমিন যদি তওবা না করে মারা যায়, তাহলে পাপের শাস্তিস্বরূপ সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শাফা'আতে এবং আল্লাহর বিশেষ রহমতে তারা পরবর্তীতে ক্রমে ক্রমে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে তাদের খালেছ ঈমানের বদৌলতে, যদি সেটা থাকে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

১৭. আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে,

الْأَتْقَى। আধিক্য জ্ঞাপক বিশেষ্য (اسم تفضيل) হয়েছে تقوى থেকে। যার অর্থ সর্বাধিক আল্লাহভীরু। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে শুদ্ধ চরিত্র সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে। এতে বুঝা যায় যে, কেবল ঈমান আনলেই সে জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে না। বরং তাকে যথার্থভাবে মুত্তাক্বী হতে হবে। সেকারণ ঈমানদারগণকে ডাক দিয়ে আল্লাহ বলেন, – 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যথার্থ ভয়। আর অবশ্যই তোমরা মরো না সত্যিকারের মুসলিম না হয়ে' (আলে ইমরান ৩/১০২)।

বিশ্বাস, আল্লাহভীতি ও কর্মে বাস্তবায়ন- তিনটি বিষয়কে এখানে একত্রিত করে বলা হয়েছে। যাতে বুঝা যায় যে, শুধু বিশ্বাস দিয়ে আমল হয় না, বরং আমলের জন্য চাই আল্লাহভীতি। বিশ্বাস আছে কিন্তু আল্লাহভীতি নেই, সে ব্যক্তির আমলে খুলূছিয়াত নেই। অতএব তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে না।

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ
১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য

تَزْكِيَةً ‘পবিত্র করা’ সেখান থেকে يَتَزَكَّى ‘সে পবিত্রতা অর্জন করে’। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার মাল-সম্পদ খরচ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই দেখানো পথে আত্মশুদ্ধি ও মালশুদ্ধির জন্য। এর মধ্যে কোনরূপ শ্রুতি বা লোক দেখানো উদ্দেশ্য থাকে না। আল্লাহ বলেন, ‘(হে রাসূল!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে এবং তুমি তাদের জন্য দো‘আ কর। নিশ্চয়ই তোমার দো‘আ তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (তওবা ৯/১০৩)। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি অপচয় করে না বা কার্পণ্য করে না। বরং মালশুদ্ধির জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে। যেমন আল্লাহ বলেন, আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্য করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যম পন্থায় থাকে’ (ফুরক্বান ২৫/৬৭)।

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ
১৯. এবং তার প্রতি কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে হবে

এখানে সেই মুত্তাকী ব্যক্তির আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে যে নিজের অর্থ যাদের জন্য ব্যয় করে, আগে থেকেই তার কোন অনুগ্রহ তার ওপর ছিল না, যার প্রতিদান বা পুরস্কার দিচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে তাদের থেকে কোন স্বার্থ উদ্ধারের অপেক্ষায় তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়ে ব্যয় করছে; বরং সে নিজের মহান ও সর্বশক্তিমান রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্যই এমন-সব লোককে সাহায্য করছে, যারা ইতোপূর্বে তার কোন উপকার করে নি এবং ভবিষ্যতেও তাদের উপকার পাওয়ার আশা নেই। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াতটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর শানে নাযিল হয়েছে।

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা মুআযযিমার যে অসহায় গোলাম ও বাঁদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপরাধে তাদের মালিকরা তাদের ওপর চরম অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল তাদেরকে মালিকদের যুলুম থেকে বাচাঁবার জন্য কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছিলেন। যেসব দাসকে আবুবকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং তার লক্ষ্য মহান আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না। এ ধরনের মুসলিম সাধারণ দূর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তার পিতা আবু কোহাফা বললেনঃ তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখেই মুক্ত করো, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ কোন মুক্ত-করা মুসলিম থেকে উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাদেরকে মুক্ত করি।

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
২০. শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়;

এখানে সেই মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু ব্যক্তির আন্তরিকাতার আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে নিজের অর্থ যাদের জন্য ব্যয় করে , আগে থেকেই তার কোন অনুগ্রহ তার ওপর ছিল না , যার বদলা সে এখন চুকাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে তাদের থেকে আরো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে উপহার উপঢৌকন ইত্যাদি দিচ্ছে এবং তাদেরকে দাওয়াত খাওয়াচ্ছে। বরং সে নিজের মহান ও সর্বশক্তিমান রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এমন সব লোককে সাহায্য করছে , যার ইতিপূর্বে তার কোন উপকার করেনি এবং ভবিষ্যতেও তাদের উপকার করার

কোন আশা নেই। এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম ও বাঁদীদের আযাদ করার কাজটি। মক্কা মু'আযযমার সে অসহায় গোলাম ও বাঁদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপরাধে তাদের মালিকরা তাদের ওপর চরম অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল হযরত আবু বকর (রা) তাদেরকে মালিকদের জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছিলেন। ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত আমরে ইবনে আবদুল্লাহ যুবাইরের এই রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন : হযরত আবু বকরকে এভাবে গরীব গোলাম ও বাঁদীদেরকে গোলামী মুক্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে দেখে তাঁর পিতা তাকে বলেন , হে পুত্র ! আমি দেখছি তুমি দুর্বল লোকদের মুক্ত করে দিচ্ছো , যদি এ টাকাটা তুমি শক্তিশালী জোয়ানদের মুক্ত করার জন্য খরচ করতে তাহলে তারা তোমার হাতকে শক্তিশালী করতো। একথায় হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে বলেন : আব্বাজান ! আমি তো আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান চাই।"

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

২১. আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি পূর্বে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করবে, সে ব্যক্তি সত্বর আল্লাহর সন্তোষ লাভে ধন্য হবে। আর তা হল- (ক) সর্বাধিক আল্লাহভীরু হওয়া এবং (খ) স্রেফ আত্মশুদ্ধি ও মালশুদ্ধির জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় করা'। এখানে سوف এসেছে تحقيق বা নিশ্চয়তাবোধক অর্থে। অর্থাৎ অবশ্যই সে অচিরে আল্লাহর সন্তোষভাজন হবে অশেষ ছওয়াব লাভের মাধ্যমে। যেমন তিনি বলেন, 'যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, যা থেকে উৎপন্ন হল সাতটা শিষ, প্রত্যেক শিষে উৎপন্ন হল একশ' শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে আরো বর্ধিত করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রশস্ত দাতা ও সর্বজ্ঞ' (বাক্বারাহ ২/২৬১)। বস্তুতঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার চূড়ান্ত প্রতিদান হল আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এই শেষ বাক্যটি মুত্তাকীদের জন্য, বিশেষ করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর জন্যে একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করবেন-এ সংবাদ এখানে তাকে শোনানো হয়েছে।

ফুটনোট

- আলোচ্য সূরায় চারটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে- রাত ও দিনের এবং নর ও নারীর।
- চারটি বিষয়ের শপথের পর উল্লেখ করা হয়েছে যে মানুষ তার প্রচেষ্টার আলোকে দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়।
- একভাগ হলো জান্নাতী সৎকর্মশীল ব্যক্তি। ৫,৬ নং আয়াতে সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের তিনটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এক- যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে। দুই- আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং তিন- 'উত্তম বিষয়' অর্থাৎ তাওহীদের কালেমালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-কে মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করে।
- জান্নাতী বান্দাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা শেষে এবার জাহান্নামীদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এক- তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার বিষয়ে কৃপণতা করবে। দুই- আল্লাহর অবাধ্যতায় বেপরওয়া হবে এবং তিন- তাওহীদের কালেমায় মিথ্যারোপ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বাণীর অবাধ্যতা করবে। তাদের জন্য কঠিন পথ অর্থাৎ জাহান্নামের পথ সহজ করে দেয়া হবে।
- উপরোক্ত দুটিভাগে জান্নাতী সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য তাদের চলার পথকে আল্লাহ্ সহজ করে দেন এবং অপরপক্ষে জাহান্নামী ব্যক্তিদের জন্য চলার পথ কঠিন করে দেন।
- ১১-২১ আয়াতগুলোতে এই দুইপ্রকার মানুষদের বিষয়ে আরো বিস্তারিত বলা হয়েছে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৯

সূরা আশ-শাম্‌স

সূরা আশ-শাম্‌স কুরআনের ৯১ তম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৫টি এবং এর রূকুর সংখ্যা ১টি। আশ-শাম্‌স সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আশ-শাম্‌স শব্দের অর্থ সূর্য।

নামকরণ :

সূরার প্রথম শব্দ আশ শামসকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময় কাল :

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে জানা যায়, এ সূরাটিও মক্কা মু'আযযমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা তুংগে উঠেছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, সৎ ও অসৎ নেকী ও গোনাহর পার্থক্য বুঝানো এবং যারা এই পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে আর গোনাহর পথে চলার ওপরই জোর দেয় তাদেরকে খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো।

মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে এবং ১০ আয়াতে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে।

প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে ।

এক - সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, পৃথিবী ও আকাশ যেমন পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি সৎ ও অসৎ এবং নেকী ও গোনাহও পরস্পর ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলও এক হতে পারে না।

দুই- মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শক্তি দিয়ে দুনিয়ায় একেবারে চেতনাহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধমে তার অবচেতন মনে নেকী ও গোনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

তিন- মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের যে শক্তিসমূহ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করে সে নিজের প্রবৃত্তির ভালো ও মন্দ প্রবণতাগুলোর মধ্য থেকে কাউকে উদ্দীপিত করে আবার কাউকে দাবিয়ে দেয়। এরি ওপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করে। যদি সে সৎপ্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং অসৎ প্রবণতাসমূহ থেকে নিজের নফসকে পবিত্র করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। বিপরীত পক্ষে যদি সে নফসের

সৎপ্রবণতাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে এবং অসৎ প্রবণতাকে উদ্দীপিত করতে থাকে তাহলে সে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় অংশে সামূদ জাতির ঐতিহাসিক নজীর পেশ করে রিসারাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ভালো ও মন্দের যে চেতনালব্ধজ্ঞান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা মানুষের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকে পুরোপুরি না বুঝার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দের বিভ্রান্তিকর দর্শন ও মানদণ্ড নির্ণয় করে পথভ্রষ্ট হতে থেকেছে। তাই মহান আল্লাহ এই প্রকৃতিগত চেতনাকে সাহায্য করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ওপর সুস্পষ্ট এ দ্ব্যর্থহীন অহী নাযিল করেছেন। এর ফলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে লোকদেরকে নেকী ও গোনাহ কি তা জানাতে পারবেন । এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ দুনিয়ায় নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। এই ধরনেরই একজন নবী ছিলেন হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম। তাঁকে সামূদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সামূদরা তাদের প্রবৃত্তির অসৎপ্রবণতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বড় বেশী হুকুম অমান্য করার ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। যার ফরে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের মু'জিযা দেখাবার দাবী অনুযায়ী তিনি তাদের সামনে একটি উঠনী পেশ করলেন। তাঁর সাবধান বাণী সত্ত্বেও এই জাতীয় সবচেয়ে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিটি সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী উটনীটিকে হত্যা করলো। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেলো।

সামূদ জাতির এ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সমগ্র সূরার কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! যদি তোমরা সামূদদের মতো তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমরাও সামূদের মতো একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সালেহ আলাইহিস সালামের মোকাবেলায় সামূদ জাতির দুশ্চরিত্র লোকেরা যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল মক্কায় সে সময় সেই একই অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই এ অবস্থায় এই কাহিনী শুনিয়ে দেয়াটা আসলে সামূদদের এই ঐতিহাসিক নজীর কিভাবে মক্কাবসীদের সাথে খাপ খেয়ে যাচ্ছে, তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আগের সূরা ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের সূরা আল বালাদ এর ১০ নম্বর আয়াতে দুটি সুস্পষ্ট ভিন্ন পথের কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং ১৮ ও ১৯ নম্বর আয়াতে ই ২ পথের পথিকদের ২ টি (ডান ও বাম) পন্থী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐ সূরার ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে সবারই চোখ, জিহবা ও ঠোঁট থাকার পরও কেন ভিন্ন ২ পথে তারা যায় তার বিবরন ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই সূরা (৯১ তম সূরা আশ শামছ) তে। মূলত নাফসের ২ টি ভিন্ন প্রবনতার কারনেই মানুষের পথ চলা ভিন্ন হয় যা সুন্দরভাবে বর্নিত হয়েছে আয়াত ৮ এ।

আগের সূরার শেষে ভুল পথে চলার পরকালীন পরিনতির কথা বলা হয়েছে (২০, শেষ আয়াত) এবং এই সূরার শেষ দিকে (আয়াত ১৪) বলা হয়েছে যে, (শুধু পরকালে নয়) দুনিয়াতেও এর পরিনতি ভয়াবহ।

এই সূরার ৯ নং আয়াতে নাফসের পরিশুদ্ধির কারনে সফলতার কথা বলা হয়েছে এবং পরের সূরায় সেই পরিশুদ্ধি কারীদের বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল বর্নিত হয়েছে (আয়াত ৫,৬,৭)। এই সূরার ১০ নং আয়াতে নাফস্কে সঠিকভাবে ব্যবহার না করার কারনে ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে এবং পরের সূরায় সেই ব্যর্থতার কারন বিস্তারিতভাবে বর্নিত হয়েছে ৮,৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে।

এই সূরায় অবাধ্যতা, বিদ্রোহ পতনের অন্যতম কারন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে (আয়াত ১১) এবং পরের সূরায় অর্থ লোভ পতনের অন্যতম কারন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে (আয়াত ১১)।

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

১. শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের

'আমি শপথ করছি সূর্যের ও তার প্রভাতরশ্মির। এখানে দু'টি শপথ একসাথে করা হয়েছে। সূর্যের শপথ এজন্য যে, এটি একটি বিশাল সৃষ্টি, যা তাপ ও আলোর উৎস। অতঃপর তার কিরণের শপথ করা হয়েছে। কেননা তা জীবন ও জাগরণের উৎস। এর আগমনে মানুষ ও সৃষ্টিজগত ঘুম থেকে জেগে উঠে যার যার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এর উদয়, উত্থান ও অস্তের সাথে দিবসে কর্মের সূচনা, ব্যস্ততা ও সমাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে। তাই সৃষ্টিজগতের কর্মচাঞ্চল্যে সূর্যকিরণের অবদান সবচেয়ে বেশী। সেটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই আল্লাহ এখানে পৃথকভাবে 'কিরণে'র শপথ করেছেন। যেদিন সূর্য আলোহীন হবে, সেদিন কিয়ামত হবে।

واو এখানে শপথসূচক অব্যয় হয়েছে। সূরার শুরুতে পরপর আটটি বড় বড় সৃষ্টবস্তুর শপথের মধ্যে প্রথম দু'টি হ'ল সূর্য ও তার কিরণের শপথ। এই শপথের মাধ্যমে সূর্য ও সূর্যরশ্মির গুরুত্ব ও মানবকল্যাণে তার অনন্য অবদানের প্রতি চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ضُحَى বলতে মানে সূর্যের আলো ও তাপ দু'টোই। আরবী ভাষায় এর পরিচিত মানে হচ্ছে চাশতের সময়, যখন সূর্য উদয়ের পরে যথেষ্ট উপরে উঠে যায় কিন্তু উপরে ওঠার পরে কোন আলোই বেড়ে যায় না, তাপও বিকীরণ করতে থাকে। তাই ' দুহা' শব্দটি যখন সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তার আলো বা তার বদৌলতে যে দিনের উদয় হয় তা থেকে তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এর তুলনায় রোদ শব্দটি তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে ।

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا

২. শপথ চাঁদের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়

تَلاَ অর্থ تَبِعَ 'পিছে পিছে আসা'। সূর্য ডোবার সাথে সাথে চন্দ্র তার জ্যোতি নিয়ে বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে শুক্লপক্ষে যা স্পষ্ট দেখা যায়।

'সূর্যের পশ্চাতে আসে' বলার মধ্যে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। বরং সূর্য যখন পৃথিবীর আড়ালে চলে যায়, তখন তার কিরণ চন্দ্রের উপর প্রতিফলিত হয় বলেই তাকে আলোকিত দেখা যায়। আর তাই সূর্য কিরণের জ্বালা চন্দ্রের আলোয় থাকে না। সূর্য কিরণে প্রাণীদেহ ও বৃক্ষকুল শক্ত-সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে চন্দ্রের প্রভাবে সাগর ও নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়। সূর্য ও চন্দ্র তাই প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সবচেয়ে বড় বন্ধু। এখানে চন্দ্রের শপথ করা হয়েছে রাত্রির নিদর্শন হিসাবে।

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا

৩. শপথ দিনের, যখন সে সূর্যকে প্রকাশ করে

এখানে جَلَّاهَا এর সর্বনাম দ্বারা সূর্যও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার অন্ধকার বা আঁধার দূর করাও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। অথবা যখন তা অন্ধকারকে আলোকিত করে দুনিয়াকে প্রকাশ করে। এর তৃতীয় অর্থ হতে পারে, শপথ সূর্যের, যখন তা পৃথিবীকে প্রকাশিত করে।

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

৪. শপথ রাতের, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে

সদা চলমান ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর যে অংশ যখন সূর্যের দিকে থাকে, তখন সে অংশে দিন হয় এবং অপর অংশে রাত হয়। 'সূর্যকে ঢেকে দেয়' অর্থ সূর্য থেকে পৃথিবী আড়ালে চলে যায়। সূর্য ওঠা, সূর্য ডোবা, সূর্য মাথার উপরে আসা প্রভৃতি কথার মধ্যে সূর্য ও পৃথিবী উভয়ে যে নিজ নিজ কক্ষপথে সদা চলমান, তার প্রমাণ বহন করে। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ উৎসের সন্ধান রয়েছে এই আয়াতে এবং অন্য আয়াতসমূহে। সূর্যের আসা-যাওয়া ও উত্তাপের কমবেশী হওয়া এবং রাত্রিতে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর এক অপূর্ব পালন কৌশল। সূর্যতাপ সর্বদা একইরূপ থাকলে এবং দিবারাত্রির আগমন-নির্গমন না থাকলে পৃথিবী প্রাণীকুলের বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেত।

বস্তুতঃ পৃথিবী অন্ধকারের চাদরে ঢেকে যাওয়ার এই সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় চলমান বিমান থেকে। কেননা বিমান তখন সূর্য্যের আলোর মধ্যে থাকে। আর পৃথিবী থাকে অন্ধকারের পর্দার মধ্যে।

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا

৫. শপথ আকাশের ও তার নির্মাণের

এখানে দু'টিই অর্থ হতে পারে। 'শপথ আকাশের ও তার নির্মাণের'। অথবা 'শপথ আকাশের ও তার নির্মাতার'। দু'টি অর্থই পরস্পরের পরিপূরক। পূর্বাপর বিবেচনায় আমরা প্রথম অর্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। কেননা 'নির্মাতা' বলতে আল্লাহকে বুঝায়। অথচ আল্লাহ সাধারণতঃ সৃষ্টির কসম করে থাকেন। এখানেও আল্লাহ নিজের কসম না করে সৃষ্টির অর্থাৎ 'নির্মাণের' কসম করেছেন।

এই শপথের মাধ্যমে আকাশের বিশালত্ব ও তার অপূর্ব নির্মাণশৈলীর প্রতি চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে বিজ্ঞানী বান্দাদের প্রতি মহাকাশ গবেষণায় নিয়োজিত হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে। আকাশ সৃষ্টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আর আসমানকে আমরা সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে এবং আমরা অবশ্যই একে প্রশস্তকারী' (*যারিয়াত ৫১/৪৭*)। আল্লাহ নিজ ক্ষমতাবলে সবই সৃষ্টি করেছেন। তা সত্ত্বেও আসমান সৃষ্টির বেলায় 'নিজ হাতে' বিশেষভাবে বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আকাশ একটি বিরাট সৃষ্টি।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আকাশের এই সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। নিচে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো-

- 'তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। তুমি আবার তাকিয়ে দেখ, কোন খুঁত দেখতে পাও কি'? 'অতঃপর তুমি দু'বার করে দৃষ্টি ফিরাও। সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে' *(মুলক ৬৭/৩-৪)*।
- 'তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কিভাবে আমরা তা নির্মাণ করেছি ও সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনরূপ ফাঁক-ফোকর নেই' *(ক্বাফ ৫০/৬)*।
- অন্যত্র আল্লাহ হঠকারী মানুষকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের সৃষ্টি? যা তিনি নির্মাণ করেছেন'। 'তিনি একে উচ্চ করেছেন, অতঃপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন' (*নাযে'আত ৭৯/২৭-২৮*)।
- পৃথিবীর উপরে আকাশকে নির্মাণ করেছেন 'সুরক্ষিত ছাদ হিসাবে' (*আম্বিয়া ২১/৩২*)। প্রতিটি ছাদের মধ্যকার দূরত্ব কল্পনার অতীত। নিম্ন আকাশকে সাজিয়েছেন নক্ষত্ররাজি দ্বারা (*মুলক ৬৭/৫*)। যা অন্ধকার পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং তা দেখে মানুষ অন্ধকারে পথ খুঁজে পায় *(নাহল ১৬/১৬)*।
- কতই না বিস্ময়কর এই আকাশ, যা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ বিশিষ্ট (*রহমান ৫৫/৩৫*)
- 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কত অগণিত নিদর্শন রয়েছে। তারা এসবের উপর দৃষ্টি ফেলে চলে যায়। কিন্তু তারা এগুলো থেকে বিমুখতা অবলম্বন করে *(ইউসুফ ১২/১০৫)*

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
৬. শপথ জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তার

পৃথিবীকে আল্লাহ বিস্তৃত করেছেন বান্দার বসবাসের জন্য। পৃথিবীকে আল্লাহ নরম কাদার মত করেননি। আবার শক্ত পাথরের মত করেননি। বরং মধ্যম মানের সমভূমি করে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তা বান্দার কল্যাণে ব্যবহৃত হ'তে পারে। কোন কোন স্থান নরম ও শক্ত হ'লেও সেটা পৃথিবীর স্বাভাবিক গঠন নয়। উল্লেখ্য যে, এই আয়াত দিয়ে 'পৃথিবী গোলাকার নয়' প্রমাণের কোন অবকাশ নেই। পৃথিবী নিঃসন্দেহে গোলাকার। তবে তার বিস্তৃতি এমনভাবে ঘটানো হয়েছে যে, আকারে গোল হ'লেও ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীরা কেউ পৃথিবী ছেড়ে ছিটকে পড়ে যায়। পৃথিবীর বিস্তৃতিকে অন্য আয়াতে (*নাবা ৭৮/৬*) বিছানার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আপেক্ষিক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। আমাদের জন্য পৃথিবী বিছানা সদৃশ সমতল ভূমি হ'লেও প্রকৃত অর্থে পৃথিবী গোলাকার। আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে বলে তার দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
৭. শপথ মানুষের ও তার বিন্যস্ত করণের

হাত-পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তিষ্ক ইত্যাদিসহ সুন্দর অবয়ব দিয়ে বিন্যস্ত করে যে মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার শপথ। এই শপথের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে তার নিজের সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে চিন্তা করার প্রতি ইঙ্গিত

করেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, '(তিনিই সেই সত্তা) যিনি তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন'। 'অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে'। 'অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ। (অথচ) তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক' (*সাজদাহ ৩২/৭-৯*)।

ফেরাঊন যখন বলেছিল 'হে মূসা! তোমাদের প্রতিপালক কে'? জবাবে মূসা বলেছিলেন, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তাকে পথপ্রদর্শন করেছেন' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৯-৫০)*। এই পথপ্রদর্শন দু'ভাবে হ'তে পারে। এক- প্রত্যেকের পৃথক পৃথক আকৃতি এবং তার কর্ম ও আচরণ। যেমন মানুষ ও অন্য প্রাণীর আচরণ। দুই- নৈতিক পথপ্রদর্শন যা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে প্রথমটির অর্থ অধিকতর স্পষ্ট।

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

৮. তারপর তাকে তার সৎকাজের এবং তার অসৎ-কাজের জ্ঞান দান করেছেন

'জ্ঞানদান করা'র এক অর্থ এই যে, তিনি তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে আম্বিয়াগণ ও আসমানী কিতাব দ্বারা ভাল-মন্দ চিনিয়ে দিয়েছেন। অথবা এর অর্থ যে, তার মস্তিষ্ক ও প্রকৃতিতে ভাল-মন্দ, নেকী-বদীর অনুভূতি প্রদান করেছেন। যাতে সে নেকীর পথ অবলম্বন করে এবং বদীর পথ হতে দূরে থাকে।

একথাটিই অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, "আর আমরা ভালো ও মন্দ উভয় পথ তার জন্য সুস্পষ্ট করে রেখে দিয়েছি।" [সূরা আল-বালাদ: ১০] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "আমরা তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অস্বীকারকারী।" [সূরা আল-ইনসান: ৩] একথাটিই অন্যত্র বলা হয়েছে এভাবে, "অবশ্যই আমি শপথ করছি নাফস আল-লাওয়ামার" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২] সুতরাং মানুষের মধ্যে একটি নাফিসে লাওয়ামাহ্ (বিবেক) আছে। সে অসৎকাজ করলে তাকে তিরস্কার করে। আরও এসেছে, "আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই ওজর পেশ করুক না কেন সে কি তা সে খুব ভালো করেই জানে।" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৪–১৫]

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

৯. সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে।

পূর্বোক্ত শপথগুলোর জওয়াবে এ আয়াতগুলোয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) এখানে, زَكَّاهَا শব্দটি تزكية থেকে। এর প্রকৃত অর্থ পরিশুদ্ধতা; বৃদ্ধি বা উন্নতি। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের নফস্ ও প্রবৃত্তিকে দুস্কৃতি থেকে পাক-পবিত্র করে, তাকে সৎকাজ ও নেকির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করে পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম হয়েছে।

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

১০. আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের تزكية এর মোকাবেলায় বলা হয়েছে, دَسَّاهَا এর শব্দমূল হচ্ছে تَدْسِيْسٌ। যার মানে হচ্ছে দাবিয়ে দেয়া, লুকিয়ে ফেলা; পথভ্রষ্ট করা। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর অর্থও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই ব্যর্থ, যে নিজের নাফসকে নেকী ও সৎকর্মের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করার পরিবর্তে দাবিয়ে দেয়, তাকে বিভ্রান্ত করে অসৎপ্রবণতার দিকে নিয়ে যায়।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

১১. সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল।

পূর্বের আয়াতে ব্যর্থ মনোরথ এবং পাপে ডুবে যাওয়া লোকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ এখানে বিগত দিনের দুর্ধর্ষ ও ক্ষমতাশালী জাতি ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা সালেহ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে সালেহকে পাঠানো হয়েছিল। যে দুষ্কৃতিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল তা ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না এবং সালেহ আলাইহিস সালাম যে তাকওয়ার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা গ্রহণ করতেও তারা চাইছিল না। নিজেদের এই বিদ্রোহী মনোভাব ও কার্যক্রমের কারণে তাই তারা তার নবুওয়াতকে মিথ্যা বলছিল।

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا

১২. তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল,

অর্থাৎ দুষ্ট যুবকটি নবীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আল্লাহ প্রেরিত উষ্ট্রীর পা কেটে দিয়েছিল। অবাধ্য কওমের দাবী অনুযায়ী নবী সালেহ (আঃ)-এর প্রার্থনা মতে আল্লাহ স্বীয় নিদর্শন হিসাবে বড় একটি উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলেন, যে একদিন কূয়ার সব পানি খেয়ে নিত ও একদিন তাদের দুধ দিত। যা তাদের সকলের চাহিদা মিটাতো। কিন্তু দুষ্টু নেতারা চক্রান্ত করে উষ্ট্রীর পা কেটে হত্যা করে ফেলে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যাম‘আহ (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুৎবার মধ্যে অত্র আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন যে, হত্যাকারী ঐ লোকটি তার সম্প্রদায়ের একজন পরাক্রমশালী সর্দার ছিল আবু যাম‘আহর ন্যায়’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, ঐ লোকটি ছিল কঠোর হৃদয় ও দুশ্চরিত্র।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

১৩. তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও।

কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সামূদ জাতির লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বলে দিয়েছিল যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিশানী (মু'জিযা) পেশ করো। একথায় সালেহ আলাইহিস সালাম মু'জিযা হিসেবে একটি উটনী তাদের সামনে হাযির করেন, তিনি বলেনঃ এটি আল্লাহর উটনী। যমীনের যেখানে ইচ্ছা সে চরে বেড়াবে। একদিন সে একা সমস্ত পানি পান করবে এবং অন্যদিন তোমরা সবাই ও তোমাদের পশুরা পানি পান করবে। যদি তোমরা তার গায়ে হাত লাগাও তাহলে মনে রেখো তোমাদের ওপর কঠিন আযাব বর্ষিত হবে। একথায় তারা কিছুদিন পর্যন্ত ভয় করতে থাকলো। তারপর তারা তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোককে ডেকে একমত হলো এবং বলল, এই উটনীটিকে শেষ করে দাও। সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। [দেখুন: সূরা আল-আ'রাফঃ ৭৩. আশ-শু'আরাঃ ১৫৪–১৫৬ এবং আল-ক্বামারঃ ২৯]

আল্লাহর নবী' বলার মাধ্যমে নবীকে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করে নবী ও তার কথার গুরুত্বকে বাড়ানো হয়েছে। আবার উটনীটি সাধারন কোন উটনী নয় বোঝাতে 'আল্লাহর উটনী' বলা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সেই উটনী, তার পানি পান ও তার জায়গা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا

১৪. কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং উষ্ট্রীকে জবাই করল। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমুলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, উটনীকে হত্যা করার পর সামুদের লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বললো, "তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাতে এখন সেই আযাব আনো।" [সূরা আল-আরাফ: ৭৭] তখন "সালেহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, তিনদিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে আরো আয়েশ করে নাও, তারপর আযাব এসে যাবে এবং এটি এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। না।" [সূরা হূদ: ৬৫]

আয়াতে উল্লেখিত دَمْدَمَ শব্দটি এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বার বার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির ওপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। এখানে فَسَوَّاهَا এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, এ আযাব জাতির আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে বেষ্টন করে নিয়েছিল।

৭ম আয়াতে আল্লাহ নাফসকে ভারসাম্যপূর্ন করে গড়েছেন তা বলেছেন এবং আল্লাহ 'সাওওয়াহা' শব্দটি ব্যহহার করেছেন। এখানে ১৪ তম আয়াতের শেষেও আল্লাহ 'সাওওয়াহা' ব্যহহার করেছেন যার অর্থ সমান করে দেওয়া,

ভারসাম্যপূর্ন করে দেওয়া। এখানে আল্লাহ সামূদ জাতির বিশৃঙ্খলা, অবাধ্যতা ইত্যাদিকে মিটিয়ে দিয়ে, ধ্বংস করে জমীনে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য নিয়ে এসেছেন এমনটি বুঝিয়েছেন।

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

১৫. আর তিনি এর পরিণামকে ভয় করেন না।

দুনিয়ার বাদাশাহ ও শাসকদের মতো নন। তিনি কোন জাতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এর পরিণাম কি হবে, একথা ভাবতে বাধ্য হন না। তিনি সবার ওপর কর্তৃত্বশালী । সামূদ জাতির সাহায্যকারী এমন কোন শক্তি আছে যে তার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে, এ ভয় তাঁর নেই।

ফুটনোট

- এ সূরায় আটটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে।
- পবিত্র হৃদয়ের মানুষ সর্বদা কৃতকার্য হয় এবং কলুষিত হৃদয়ের মানুষ সর্বদা পর্যুদস্ত হয়।
- সালেহ আঃ কে 'আল্লাহর রাসূল' এবং উটনীকে আল্লাহ্‌র উটনি বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে গুরুত্ব বুঝানোর জন্য
- আল্লাহ্ মানুষের নফসকে খুবই ভারসাম্যপূর্ন করে তৈরি করেছেন। অন্যান্য উন্নত সৃষ্টির চেয়ে মানুষের আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের স্বাধীন নফস আছে। আল্লাহ আমাদের পাশবিক সত্তার মধ্যে নফসের বিশেষ গুনাবলী ঢুকিয়ে দিয়েছেন। পাপ (খারাপ) ও পাপ থেকে বেঁচে থাকা (তাকওয়া) এর ভালো জ্ঞান দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ দেখতে চেয়েছেন যে এই নফস কোন দিকে বেশি ঝুঁকে যায়, কোনটা বেশি গ্রহন করে।
- ৮ম আয়াতে যেহেতু আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে নাফস নেগেটিভ দিকে যেতে পারে তাই সফলতার সর্বদা নিজের নফসের পরিশুদ্ধতা কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। অপবিত্রতা, ময়লা, পাপ থেকে নাফসকে পরিশুদ্ধ রাখতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং নাফসকে ধুয়ে মুছে পরিশুদ্ধ রাখার অবিরাম চেষ্টার ফলে তা একসময় পরিশুদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ।
- যে ব্যক্তি নফসের ভালো সম্ভাবনাকে কাজে না লাগিয়ে তাঁকে ধুলায় ফেলে, অবজ্ঞা, অবমাননা করে। সেই ব্যক্তিকে ব্যর্থ বলা হয়েছে।
- সামুদ জাতির উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ্ যে ব্যক্তি নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তাঁকে 'সবচেয়ে হতভাগ্য' বলেছেন।
- ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ ভয়হীন ভাবে তার কাজ করে যান।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১০

সূরা বালাদ

সূরা আল-বালাদ কুরআনের ৯০ তম সূরা; এর আয়াত সংখ্যা ২০ এবং রূকু সংখ্যা ১। সূরা আল-বালাদ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। বালাদ শব্দের অর্থ নগরী, শহর, দেশ।

নামকরণ :
প্রথম আয়াতে আল বালাদ শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় কাল :
এই সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী মক্কা মু'আযয্মার প্রথম যুগের সূরাগুলোর মতোই । তবে এর মধ্যে একটি ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায়, এই সূরাটি ঠিক এমন এক সময় নাযল হয়েছিল যখন মক্কায় কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল এবং তাঁর ওপর সব রকমের জুলুম নিপীড়ন চালানো নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :
একটি অনেক বড় বিষয়বস্তুকে এই সূরায় মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি পূর্ণ জীবন দর্শন ; যা বর্ণনার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থের কলেবরও যথেষ্ঠ বিবেচিত হতো না তাকে এই ছোট্ট সূরাটিতে মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কুরআনের অলৌকিক বর্ণনা ও প্রকাশ পদ্ধতির পূর্ণতার প্রমান। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভুমিকা বুঝিয়ে দেয়া । মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এবং মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যর পথে চলে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে।

প্রথমে মক্কা শহরকে, এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোকে এবং সমগ্র মানব জাতির অবস্থাকে এই সত্যটির সপক্ষে এই মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এই দুনিয়াটা মানুষের জন্য কোন আরাম আয়েশের জায়গা নয়। এখানে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আনন্দ উল্লাস করার জন্য তাকে পয়দা করা হয়নি। বরং এখানে কষ্টের মধ্যে তার জন্ম হয়েছে । এই বিষয়বস্তুটিকে সূরা আন নাজমের وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى (মানুষ যতটুকু প্রচেষ্ট চালাবে ততটুকুর ফলেরই সে অধিকারী হবে।) আয়তটির সাথে মিলিয়ে দেখলে একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার এই কর্মচাঞ্চল্যে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার কর্মতৎপরতা, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার ওপর।

এরপর মানুষই যে এখানে সবকিছু এবং তার ওপর এমন কোন উচ্চতর ক্ষমতা নেই যে তার কাজের তত্বাবধান করবে এবং তার কাজের যথাযথ হিসেব নেবে, তার এই ভুল ধারণা দূর করে দেয়া হয়েছে।

তারপর মানুষের বহুতর জাহেলী নৈতিক চিন্তাধারার মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করে দুনিয়ায় সে অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসব ভুল মানদণ্ডের প্রচলন করে রেখেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের বড়াই করার জন্য বিপুল পরিমাণ ধন - সম্পদ ব্যয় করে সে নিজেও নিজের এই বিপুল ব্যয় বহরের জন্য গর্ব করে এবং লোকেরা তাকে বাহবা দেয়। অথচ যে সর্বশক্তিমান সত্তা তার কাজের তত্বাবধান করছেন তিনি দেখতে চান, সে এই ধন সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে এবং কোন মনোভাব সহকারে এসব ব্যয় করছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন, আমি মানুষকে জ্ঞানের বিভিন্ন উপকরণ এবং চিন্তা ও উপলদ্ধির যোগ্যতা দিয়ে তার সামনে ভালো ও মন্দ দু'টো পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছি। একটি পথ মানুষকে নৈতিক অধপাতে নিয়ে যায়। এ পথে চলার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। বরং তার প্রবৃত্তি সাধ মিটিয়ে দুনিয়ার সম্পদ উপভোগ করতে থাকে। দ্বিতীয় পথটি মানুষকে নৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি দুর্গম গিরিপথের মতো। এ পথে চলতে গেলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ওপর জোঁর খাটাতে হয়। কিন্তু নিজের দুর্বলতার কারণে মানুষ এই গিরিপথে ওঠার পরিবর্তে গভীর খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়াই বেশী পছন্দ করে।

তারপর যে গিরিপথ অতিক্রম করে মানুষ ওপরের দিকে যেতে পারে সেটি কি তা আল্লাহ বলেছেন। তা হচ্ছে: গর্ব ও অহংকার মূলক এবং লোক দেখানো ও প্রদর্শনী মূলক ব্যয়ের পথ পরিত্যাগ করে নিজের ধন - সম্পদ এতিম ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর প্রতি ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান আনতে হবে আর ঈমানদারদের দলের অন্তরভুক্ত হয়ে এমন একটি সমাজ গঠনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, যা ধৈর্য সহকারে সত্যপ্রীতির দাবী পূরণ এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে। এই পথে যারা চলে তারা পরিণামে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়। বিপরীত পক্ষে অন্যপথ অবলম্বনকারীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। সেখান থেকে তাদের বের হবার সমস্ত পথই থাকবে বন্ধ।

আগের সূরা ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের ৮৯ তম সূরা আল ফাজর এর শেষে প্রশান্ত আত্মাকে আল্লাহর দিকে সন্তুষ্ট চিত্তে অন্য বান্দাদের সাথে সামিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। (আয়াত ২৭-২৯) এই ৯০ তম সূরা (আল বালাদ) য় শুরুতেই (আয়াত ১) মক্কার কথা বলা হয়েছে যে জায়গাটি দুনিয়ার সবচাইতে প্রশান্ত। এখানে হজ্জের সময় তো অবশ্যই, অন্য সময়েও মানুষ সন্তুষ্ট চিত্তে অন্য বান্দাদের সাথে সামিল হয় 'লাব্বাইক' বলে।

সূরা ফাজর এর আয়াত ১৭ তে এতীমদের উপযুক্ত সম্মান না দেয়া মানুষদের কথা বর্নিত হয়েছে, অপরদিকে সূরা আল বালাদের আয়াত ১৫ তে এতীমদের সম্মান দিয়ে সাহায্যকারী মানুষদের কথা বর্নিত হয়েছে।

এই (৯০ তম) সূরা আল বালাদ এর ১০ নম্বর আয়াতে দুটি সুস্পষ্ট ভিন্ন পথের কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং ১৮ ও ১৯ নম্বর আয়াতে ই ২ পথের পথিকদের ২ টি (ডান ও বাম) পন্থী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐ সূরার ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে সবারই চোখ, জিহবা ও ঠোঁট থাকার পরও কেন ভিন্ন ২ পথে তারা যায় তার বিবরন ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে

পরের ৯১ তম সূরা আশ শামছ তে। মূলত নাফসের ২ টি ভিন্ন প্রবনতার কারনেই মানুষের পথ চলা ভিন্ন হয় যা সুন্দরভাবে বর্নিত হয়েছে সূরা আশ শামছ এর আয়াত ৮ এ।

لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ
১. আমি শপথ করছি এ নগরের

বাক্যের শুরুতে لا 'না' বোধক নয়। বরং 'অতিরিক্ত' হিসাবে আনা হয়েছে তম্বীহ ও তাকীদের জন্য এবং প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্যে এই لا শব্দটি শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল আপনার ধারণা নয়; বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। শপথের সাথে لا - এর ব্যবহার আরবী বাকরীতিতে খুবই প্রসিদ্ধ। সূরা কিয়ামাহেও এর ব্যবহার রয়েছে।

البلد বা নগরী বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা আত-ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে أمين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কাবাসীরা নিজেরাই তাদের নগরের পটভূমি জানতো। তারা জানতো, কিভাবে পানি ও বৃক্ষলতাহীন একটি ধূসব উপত্যকায় নির্জন পাহাড়ের মাঝখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের এক স্ত্রী দুধের বাচ্চাকে এখানে এনে নিঃসংগভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিভাবে এখানে একটি ঘর তৈরি করে হজ্জের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ বহু দূর - দূরান্তে এই ঘোষনা শোনারও কেউ ছিল না। তারপর কিভাবে একদিন এই নগরটি সমগ্র আরবের কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং এমন একটি ' হারম ' - সম্মানিত স্থানে হিসেবে গণ্য হলো, যা শত শত বছর পর্যন্ত আরবের সরজমিনে, যেখানে আইন শৃংখলার কোন অস্তিত্বই ছিল না সেখানে এই নগরটি ছাড়া আর কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো না।

মক্কা ছিল পবিত্র ও নিরাপদ নগরী। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর সেই সময়ে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, নবী মুহাম্মাদ (স) এর জন্য সেখানে কোন নিরাপত্তা ছিলো না। তাকে কষ্ট ও যন্ত্রনা দেয়া এমনকি তাকে হত্যা করার উপায় উদ্ভাবন করা ও তাতে চেষ্টা করা পর্যন্ত হালাল করে নেয়া হয়েছিল।

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ
২. আর আপনি এ নগরের অধিবাসী

حِلٌّ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে (এক) এটা حلول থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেয়া, থাকা ও অবতরণ করা। সে হিসেবে আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র, বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। [ফাতহুল কাদীর] (দুই) এটা حلال থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে; অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না।

এমতাবস্থায় তাদের যুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহর রাসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্যে মক্কার হারামে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। [ইবন কাসীর] বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্যেই তাই করা হয়েছিল। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তারপর যখন তিনি তা খুললেন, এক লোক এসে তাকে বলল যে, ইবনে খাতল কা'বার পর্দা ধরে আছে। তিনি বললেন, 'তাকে হত্যা করা। [বুখারী: ১৮৪৬, মুসলিম: ৪৫০] কারণ, পূর্ব থেকেই তার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা রাসূল দিয়েছিলেন।

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

৩. শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে।

যেহেতু বাপ ও তার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানদের ব্যাপারে ব্যপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনের দিকে মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাই বাপ মানে আদম আলাইহিস সালামই হতে পারেন। আর তার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান বলতে দুনিয়ায় বর্তমানে যত মানুষ পাওয়া যায়, যত মানুষ অতীতে পাওয়া গেছে এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে সবাইকে বুঝানো হয়েছে। এভাবে এতে আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অথবা وَالِدٌ বলে প্রত্যেক জন্মদানকারী পিতা আর وَلَدَ বলে প্রত্যেক সন্তানকে বোঝানো হয়েছে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ

৪. নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।

এটি পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের জওয়াব। আল্লাহ তাঁর যেকোন সৃষ্টির শপথ করে থাকেন। আর এর দ্বারা উক্ত সৃষ্টির মর্যাদা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সূরার শুরুতে মক্কা নগরী, অতঃপর আদম ও বনু আদম বা পিতা ও সন্তানদের শপথ করে, অতঃপর لَ ও قَدْ সহ মোট তিনটি তাকীদ সহযোগে আল্লাহ বলছেন যে, আমরা অবশ্যই মানুষকে ক্লেশনির্ভর প্রাণীরূপে সৃষ্টি করেছি।

كَبَدٍ অর্থ نصب ومشقة 'কষ্ট ও ক্লেশ'। মানুষ তার মায়ের গর্ভ থেকেই নানাবিধ কষ্ট ও রোগ-পীড়ার সম্মুখীন হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানারূপ বিপদাপদ ও কায়-ক্লেশের মধ্য দিয়ে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। যদিও দৈহিক কষ্ট-দুঃখ অন্য প্রাণীর জীবনেও হয়ে থাকে। তথাপি মানুষের বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে বলার কারণ হ'ল সম্ভবতঃ এই যে, (১) মানুষ হ'ল সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি। যাকে কথা বলার ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। (২) মানুষ একমাত্র প্রাণী যাকে জ্ঞান সম্পদ দান করা হয়েছে। সেকারণ তাকে তার প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। (৩) মানুষের উপলব্ধি ও চেতনাবোধ অন্য সকল প্রাণীর চাইতে বেশী। তাছাড়া যার জ্ঞান ও বিবেকশক্তি যত প্রখর তার চেতনা ও দূরদৃষ্টি তত প্রখর। ফলে পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। (৪) মানুষকে

তার সারা জীবনের কর্মের হিসাব ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে দিতে হয়। যা অন্য প্রাণীকে দিতে হয় না। (৫) মানুষের জন্য তার পার্থিব জীবনটা হ'ল পরীক্ষাগার। প্রতি পদে পদে তাকে পরীক্ষা দিয়ে চলতে হয়। তাই মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে এবং তার দায়িত্ববোধকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই এখানে মানুষকে মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে পেশ করা হয়েছে।

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

৫. সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

শক্তিগর্বে স্ফীত অহংকারী মানুষকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ ধমকের সুরে কথাগুলি বলেছেন। যেমন বিগত যুগে 'আদ জাতি বলেছিল 'কে আছে আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী'? *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৫)*। অর্থাৎ সেকি ভেবেছে তাকে দমন করার কেউ নেই? অথবা সেকি ভেবেছে ক্বিয়ামত হবে না এবং তার অত্যাচারের বদলা নেওয়া হবে না?

অথচ আখেরাত আসার আগে এই দুনিয়াতেই সে প্রতি মুহূর্তে দেখছে, তার তাকদীরের ওপর অন্য একজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সামনে তার নিজের সমস্ত জারিজুরি, কলা - কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে । ভূমিকম্পের একটি ধাক্কা, ঘূর্ণিঝড়ের একটি আগাত এবং নদী ও সাগরের একটি জলোচ্ছ্বাস তাকে একথা বলে দোবার জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় সে কতটুকু ক্ষমতা রাখে। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা একজন সুস্থ সবল সক্ষম মানুষকে পংগু করে দিয়ে যায়। ভাগ্যের একটি পরিবর্তন একটি প্রবল পরাক্রান্ত বিপুল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে আকাশ থেকে পাতালে নিক্ষেপ করে। উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থানকারী জাতিদের ভাগ্য যখন পরিবর্তিত হয়ে তখন এই দুনিয়ায় যেখানে তাদের চোখে চোখ মেলাবার হিম্মত করোর ছিল না সেখানে তারা লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়। এহেন মানুষের মাথায় কেমন করে একথা স্থান পেলো যে, তার ওপর কারোর জোর খাটবে না ?

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا

৬. সে বলে, আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি।

বলা হয়েছে সে বলে "আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি"। এই শব্দগুলোই প্রকাশ করে, বক্তা তার ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে কী পরিমাণ গর্বিত। যে বিপুল পরিমাণ ধন সে খরচ করেছে নিজের সামগ্রিক সম্পদের তুলনায় তার কাছে তার পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, তা উড়িয়ে বা ফুকিয়ে দেবার কোন পরোয়াই সে করেনি। আর এই সম্পদ সে কোন কাজে উড়িয়েছে? কোন প্রকৃত নেকীর কাজে নয়, যেমন সামনের আয়াতগুলো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বরং এই সম্পদ সে উড়িয়েছে নিজের ধনাঢ্যতার প্রদর্শনী এবং নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য।

أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ

৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?

অর্থাৎ ধনশালী অহংকারী ব্যক্তিটি কত সম্পদ ব্যয় করেছে এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছে, সে কি ভেবেছে যে কেউ তা দেখেনি? অবশ্যই তা আল্লাহ দেখেছেন। তিনি তার ভিতর-বাহির সব খবর জানেন এবং সবকিছুর

হিসাব তিনি নেবেন। তিনি বলেন, 'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর জন্য। তোমাদের মনের মধ্যে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ করো বা গোপন করো, তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ নিবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*।

ধন-সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ। বান্দাকে তিনি দেন, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতএব মালিকের নির্দেশমত আয়-ব্যয় না করলে সে খেয়ানতকারী হিসাবে উত্থিত হবে এবং যথাযথ শাস্তি ভোগ করবে।

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ

৮. আমরা কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুচোখ?

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ

৯. আর জিহ্বা ও দুই ঠোঁট?

আল্লাহ এখানে মানুষকে দেওয়া তিনটি অত্যন্ত মূল্যবান নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদের চাইতে বহু বহু গুণ মূল্যবান। আর তা হ'ল মানুষের 'দু'টি চোখ', যা দিয়ে সে দেখে ও সৌন্দর্য উপভোগ করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আল্লাহর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৃষ্টিসমূহ সে পর্যবেক্ষণ করে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ-কোটি মাইল দূরে লুক্কায়িত নক্ষত্ররাজি অবলোকন করে। সাগরগর্ভে লুক্কায়িত মণি-মুক্তা উত্তোলন করে। এভাবে সে তার দু'চোখের মাধ্যমে আকাশ ও পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টিরাজি স্বচক্ষে দেখে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে ও সেখান থেকে কল্যাণ আহরণ করে।

'জিহবার' সাহায্যে সে কথা বলে, খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করে এবং দুই মাড়ির দাঁতের মাঝে খাদ্য ঠেলে দেয়। যাতে তা ভালোভাবে চিবিয়ে হযম করা সহজ হয়। সর্বক্ষণ সরস জিহবার সাহায্যে মানুষ তার মনের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে। এছাড়া জিহবার লালা তার খাদ্য হযমে সাহায্য করে এবং চর্মের উপরের ক্ষত ও বিষ নাশ করে।

'দু'টি ঠোঁট' মানুষের মুখগহবরের দু'টি কপাট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যা তার পর্দা করে ও চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যা মুখের ভিতরে খাদ্যের সঞ্চালন করে এবং শব্দ ও বর্ণের যথাযথ উচ্চারণে সাহায্য করে। যদি ঠোঁট বা জিহবা ক্ষণিকের জন্য অসাড় হয়ে যায়, তাহ'লে সে বুঝতে পারে এ দু'টির মূল্য কত বেশী!

উক্ত নে'মতগুলি দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা পরীক্ষা করা যে, বান্দা এগুলিকে কল্যাণের পথে ব্যয় করে, না অকল্যাণের পথে ব্যয় করে। সে এগুলিকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে, না শয়তানের পথে পরিচালিত করে। এজন্যেই বলা হয়, একটা মানুষ পূর্ণ মুমিন হয় তখনই, যখন তার হাত-পা, চোখ-কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণভাবে মুসলমান হয়। অর্থাৎ ইসলামী শরী'আতের অনুসারী হয়। ইঞ্জিন ভাল থাকলেও পার্টস খারাব হ'লে যেমন ইঞ্জিন চলে না, অনুরূপভাবে ঈমান যত মযবুত হৌক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি শয়তানের তাবেদার হয়, তাহ'লে হৃদয়ের ঐ ঈমানের জ্যোতিটুকুও এক সময় নিভে যাবে। অতএব চোখ কান ইত্যাদিকে কঠোরভাবে হেফাযত করতে হবে, যেন ঐ দু'টি খোলা জানালা দিয়ে কোন নাপাক চিন্তা ভিতরে প্রবেশ না করে এবং তা হৃদয়কে কলুষিত না

করে। আল্লাহ বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*।

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
১০. আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দুটি পথ।

ভাল ও মন্দ দুটি পথের দিশাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে দিয়েছেন। শুধুমাত্র বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তি দান করে তাকে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবার জন্য ছেড়ে দেননি। বরং তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তার সামনে ভালো ও মন্দ এবং নেকী ও গোনাহের দু'টি পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও এই একই কথা বলা হয়েছে, সেখানে এসেছে, "আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নেয়া যায় এবং এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে সে শোকরকারী হতে পারে বা কুফরকারী।" [সূরা আল-ইনসান: ২-৩]

نَجْدَيْنِ শব্দটি نَجْدٌ এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ ঊর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এপথ দুটির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ। এ পথ দু'টির একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাংখা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বল্গাধনটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকে। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম। সে ঐ দু'টি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
১১. কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সহস করেনি।

عقبة বলা হয় পাহাড়ের মাঝে মাঝে রাস্তা বা গিরিপথকে। সাধারণতঃ এ পথ বড় দুস্তর, দুরতিক্রম্য ও সংকটময় হয়। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে, দু'টি পথ আমি তাকে দেখিয়েছি । একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম । সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আখাংকা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদ্যের মধ্যে নেমে গেছে । এই পথ দিয়ে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বাঁধনাটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকেব। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম সে ঐ দুটি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ

১২. আর কিসে আপনাকে জানাবে— দুর্গম গিরিপথটি কি ?

وَمَا أَدْرَاكَ অর্থ وَمَا أَعْلَمَكَ 'কোন্ বস্তু তোমাকে জানাবে'?। এর মাধ্যমে দ্বীনী আমলের উচ্চ মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। مَا الْعَقَبَةُ অর্থ مَا اقْتِحَامُ الْعَقَبَةِ؟ 'গিরিসংকটে প্রবেশ করাটা কী?' প্রশ্নের আকারে বলার উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহর নিকট সৎকর্মের উচ্চ মর্যাদার বিষয়টি শ্রোতার হৃদয়ে প্রোথিত করে দেওয়া।

'যখন কোন বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَدْرَاكَ তখন তিনি সে বিষয়টি জানিয়ে দেন। আর যখন বলেন, وَمَا يُدْرِيْكَ তখন সে বিষয়টি জানিয়ে দেন না'। যেমন এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সূরা 'আবাসা ৩ আয়াতে জানিয়ে দেননি।

অতঃপর উদাহরণ স্বরূপ এখানে পরপর তিনটি ঘাঁটি তথা নেক আমলের কথা বলা হয়েছে, যা আল্লাহর নিকট খুবই মর্যাদাপূর্ণ। যেমন-

فَكُّ رَقَبَةٍ

১৩. এটা হচ্ছেঃ দাসমুক্তি

'দাসমুক্তি' দু'ধরনের হ'তে পারে। এক- ক্রীতদাসমুক্তি। দুই- কয়েদীমুক্তি। যেমন আল্লাহ সৎকর্মশীলদের গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন, 'তারা আল্লাহর মহববতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও কয়েদীদের আহার্য প্রদান করে' *(দাহর ৭৬/৮)*।

আলোচ্য আয়াতে উদাহরণ স্বরূপ প্রথম ঘাঁটির কথা বলা হয়েছে। আর তা হ'ল 'দাসমুক্তি'। জাহেলী আরবে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হ'ত। এতে তাদের স্বাধীন সত্তা বিলীন হয়ে যেত। সারা জীবন তাদের ও তাদের সন্তানাদিকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকতে হ'ত। এই অবস্থা তৎকালীন বিশ্বে প্রায় সর্বত্র চালু ছিল। ইসলাম এটাকে সেযুগে মানবতার বিরুদ্ধে এক নম্বরের অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছে এবং এটিকে সমাজ থেকে উৎখাতের চেষ্টা করেছে। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এই নিবর্তনমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে এক হুকুমে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ইসলাম একে সুকৌশলে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে এবং দাস-দাসী মুক্ত করাকে সর্বাধিক পুণ্যের কাজ হিসাবে ঘোষণা করেছে। ফলে ইসলাম কবুলকারীদের পরিবারসমূহ যেমন দাস-দাসী থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তেমনি হযরত আবুবকর, হযরত ওছমান প্রমুখ সচ্ছল ছাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের ঘরে নির্যাতিত বহু দাস-দাসীকে অর্থের বিনিময়ে খরিদ করে নিঃস্বার্থভাবে স্রেফ আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দেন। এটি যেহেতু অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও আয়াসসাধ্য নেক আমল, তাই এটাকেই পাহাড়ের প্রথম উঁচু ঘাঁটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার সোপান বেয়ে মুমিন নর-নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান

দ্বিতীয় সৎকর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, বিশেষভাবে যদি আত্মীয় ইয়াতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়।

(এক) ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং (দুই) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন মুসলিম ক্ষুধার্তকে অন্নদান ক্ষমাকে অবশ্যম্ভাবী করে"।

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে

এ ধরনের ইয়াতীমের হক সবচেয়ে বেশী। একদিকে সে ইয়াতীম, দ্বিতীয়ত সে তার নিকটাত্মীয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মিসকীনকে দান করা নিঃসন্দেহে একটি দান। কিন্তু আত্মীয়দের দান করা দুটি। দান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২১৪, তিরমিযী: ৬৫৩]

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

১৬. অথবা দারিদ্র-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,

ذا متربة মাটি-মাখা বা ধূলায় লুণ্ঠিত। অর্থাৎ, যে দারিদ্রের কারণে মাটি বা ধূলার উপর পড়ে থাকে। তার নিজ ঘর-বাড়ি বলেও কিছু থাকে না। মোট কথা হল যে, কোন ক্রীতদাস স্বাধীন করা, কোন ক্ষুধার্ত আত্মীয় অনাথ কিংবা মিসকীনকে খাবার দান করা গিরিপথে চলার মত কঠিন কাজ। যার দ্বারা মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করতে পারে। অনাথের তত্ত্বাবধান করা এমনিতেই বিরাট পুণ্যের কাজ। কিন্তু যদি সে আত্মীয় হয়, তাহলে তার তত্ত্বাবধান করায় আছে দ্বিগুণ সওয়াব; এক সদকা করার সওয়াব এবং দুই আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ও তার হক আদায় করার সওয়াব। অনুরূপ ক্রীতদাস স্বাধীন করারও বড় ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

১৭. 'অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দেয় ও পরস্পরের প্রতি দয়ার উপদেশ দেয়'।

অর্থাৎ ওপরে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে তার জন্য মু'মিন হওয়াও জরুরী। কারণ ঈমান ছাড়া কোন কাজ সৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত হতে এবং আল্লাহর কাছে ও গৃহীত হতে পারে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঈমান সহকারে যে সৎকাজ করা হয় একমাত্র সেটিই নেকী ও মুক্তির উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। যেমন সূরা নিসায় বলা হয়েছে : " পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করে সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । " (১২৪ আয়াত) সূরা নাহলে বলা হয়েছে : " পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং এই ধরনের লোকদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেবো। "(৯৭ আয়াত) সুরা মু'মিনে বলা হয়েছে : " পুরুষ বা নারী যেই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । সেখানে তাকে দেয়া হবে বেহিসেব রিযিক। " (৪০ আয়াত) যে কোন ব্যক্তিই কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে দেখতে

পাবেন এ কিতাবের যেখানেই সৎকাজ ও তার উত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই অবশ্যই তার সাথে ঈমানের শর্ত লাগানো হয়েছে। ঈমান বিহীন আমল আল্লাহর কাছে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কোথাও এ ধরনের কাজের বিনিময়ে কোন প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়নি। এ প্রসংগে এ বিষয়টিও প্রতিধানযোগ্য যে, আয়াতে একথা বলা হয়নি, " তারপর সে ঈমান এনেছে । " বরং বলা হয়েছে "তারপর সে তাদের মধ্যে সামিল হয়েছে যারা ঈমান এনেছে।"এর অর্থ হয়, নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে তার নিজের ঈমান আনাই কেবলমাত্র এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে মূল লক্ষ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে তার সাথে শামিল হয়ে যাবে। এর ফলে ঈমানদারদের একটি জামায়াত তৈরি হয়ে যাবে। মু'মিনদের একটি সমাজ গড়ে উঠবে। সামগ্রিক ও সমাজবদ্ধভাবে নেকী, সততা ও সৎবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ঈমানের দাবী ।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ঈমানের পরে এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আমলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হ'ল পরস্পরকে ছবর ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া। ছবর তিন প্রকার। এক- বিপদে ধৈর্য ধারণ করা । ঈমানদার ব্যক্তির উপরে নানাবিধ বিপদ এসে থাকে তাকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য অথবা তার ঈমানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্য। এমতাবস্থায় ঈমানদার নিজে যেমন ছবর করবে, অন্যকেও তেমনি ছবরের উপদেশ দিবে, যাতে সেও ঈমানের উপরে দৃঢ় থাকতে পারে। দুই- পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা । পাপের সহজ সুযোগ এসে যাওয়া সত্ত্বেও মুমিনকে তার ঈমান ঐ পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে। এটা হ'ল গুরুত্বপূর্ণ ছবর, যার পুরস্কার অনেক বেশী। তিন- আল্লাহর আনুগত্যের উপরে দৃঢ় থাকা। সাময়িকভাবে পাপ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে আসা অনেক সময় সম্ভব হ'লেও স্থায়ীভাবে তার উপরে দৃঢ় থাকা নিঃসন্দেহে কঠিন এবং অবশ্যই তা সর্বোচ্চ ধৈর্য ধারণের অন্তর্ভুক্ত। যার পুরস্কারের কোন শেষ নেই।

আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। তিনি বলেন 'ধৈর্যশীলদের বেহিসাব পুরস্কার দান করা হবে' *(যুমার ৩৯/১০)*। তিনি আরও বলেন 'ছবরের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতে বিশেষ কক্ষ দান করা হবে এবং তাদেরকে সেখানে মুবারকবাদ ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে' *(ফুরক্বান ২৫/৭৫)*। তিনি বলেন,'ধৈর্যধারণের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করবেন' *(দাহর ৭৬/১২)*।

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্মটি হ'ল পরস্পরকে দয়া ও অনুগ্রহের উপদেশ দান করা।
নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে দয়াগুণের চাইতে বড় গুণ আর নেই। ছবর ও দয়াগুণ মুমিনের সবচেয়ে বড় দু'টি গুণ হিসাবে অত্র আয়াতে উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ অত্র গুণ দু'টির বড়ত্ব ও মর্যাদাকে আরো সমুন্নত করেছেন। 'রহম' বা দয়াগুণ হ'ল আল্লাহর সবচেয়ে বড় গুণ।

مَرْحَمَة এর অর্থ অপরের প্রতি দয়াদ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও যুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মতের মধ্যে এই রহম ও করুণাবৃত্তিটির মতো উন্নত নৈতিক বৃত্তিটিকেই সবচেয়ে বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করতে চেয়েছেন। হাদীসে এসেছে, "যে মানুষের প্রতি রহমত করে না। আল্লাহ তার প্রতি রহমত করেন না"। [বুখারী: ৭৩৭৬, মুসলিম: ৩১৯, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৫৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, "যে আমাদের ছোটদের রহমত করে না এবং বড়দের সম্মান পাওয়ার

অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়"। [আবু দাউদ: ৪৯৪৩, তিরমিযী: ১৯২০] আরও বলা হয়েছে, "যারা রহমতের অধিকারী (দয়া করে) তাদেরকে রহমান রহমত করেন, তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি রহমত কর তবে আসমানের উপর যিনি আছেন (আল্লাহ)। তিনিও তোমাদেরকে রহমত করবেন।" [আবু দাউদ: ৪৯৪১, তিরমিযী: ১৯২৪]

অত্র আয়াতের শুরুতে ثُمَّ (অতঃপর) শব্দ আনার মাধ্যমে পূর্বের তিনটি বস্তুর উপর পরবর্তী বস্তুগুলির উচ্চতর মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। যেখানে ঈমান, ছবর ও দয়াশীলতার কথা বর্ণিত হয়েছে। কেননা ঈমান হ'ল সবকিছুর মূল। ছবর হ'ল বীরত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার চূড়ান্ত রূপ। আর দয়াশীলতা হ'ল আল্লাহর বিশেষ গুণ, যা সবকিছুর উপরে। কারু মধ্যে যখন এই গুণগুলি অর্জিত ও বিকশিত হয়, তখন তিনি হন সত্যিকারের মানুষ বা ইনসানে কামেল।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
১৮. 'এরাই হ'ল ডান সারির মানুষ'।

অর্থাৎ উপরে বর্ণিত গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ ক্বিয়ামতের দিন সৌভাগ্যশালীদের জন্য নির্ধারিত ডান সারিতে স্থান পাবে। ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে তিন সারিতে ভাগ করা হবে। একটি হবে অগ্রগামী দল, একটি হবে দক্ষিণ সারির দল এবং একটি হবে বাম সারির দল। প্রথম দু'টি দল জান্নাতী হবে এবং বাম সারির লোকেরা জাহান্নামী হবে *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭-১২)*। জান্নাতীদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে এবং তাদের সহজ হিসাব নেওয়া হবে *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭১; ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৭-৮)*।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
১৯. 'আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারা হ'ল বাম সারির লোক'।

হতভাগা অথবা বাম দিকের লোকেরা, যাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে'।

পাপিষ্ঠ কাফের-ফাসেক-মুনাফিকদের ক্বিয়ামতের দিন বাম সারিতে দাঁড় করানো হবে *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৯,৪১)*। এদের পিঠের পিছন দিয়ে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/১০)*। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এরাও ডান হাত বাড়িয়ে দেবে। বাম হাত বাড়াতে চাইবে না। ফলে পিছন দিক দিয়ে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ
২০. 'তাদের উপরে থাকবে পরিবেষ্টিত অগ্নি'।

مؤصَدَة এর অর্থ হল مُغْلَقَة অর্থাৎ বন্ধ। তার মানে হল, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে তার চতুর্দিক বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে প্রথমতঃ আগুনের সম্পূর্ণ তাপ তাদেরকে পৌঁছে এবং দ্বিতীয়তঃ সেখান হতে পলায়ন করে কোথাও যেতে না পারে।

ফুটনোট

- البلد বা নগরী বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা আত-ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে
- আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এবং মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যর পথে চলে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে।
- প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে মানুষ যখন সফলতার একটা পর্যায়ে পৌছে তখন কিছু মানুষ অহংকারী হয়ে ওঠে।
- অহংকারী মানুষ এমন চিন্তাভাবনা করে যে কেউ তার উপর ক্ষমতাবান হতে পারবে না, তাকে পরাজিত করতে পারবে না। মূলত সে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, তাই ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ভাব পোষন করে। অহংকারীরা নিজেদেরকে সর্বময় ক্ষমতাধর মনে করে থাকে।
- ক্ষমতার অহংকারের পাশাপাশি কিছু মানুষ অর্থের দাপট ও দেখাতে থাকে।
- মানুষের যোগ্যতা বিকাশে সহায়ক এমন ৩ প্রকার অঙ্গের কথা স্মরন করিয়ে দিচ্ছেন। ২ টি চোখ, ১ টি জিহবা ও ঐ জিহবাকে সংযত রাখার জন্য ২ টি ঠোট (যা দিয়ে মানুষ অহঙ্কার প্রকাশ করে) দিয়ে মানুষ অনেক কঠিন কাজ করতে পারে, কঠিন পথ পাড়ি দিতে পারে।
- আল্লাহ মানবজাতিকে অন্য প্রানীদের থেকে শ্রেষ্ঠত্য দিয়ে দুটি কঠিন পথ দেখান। ভালো ও খারাপ দুটি পথেই কঠিন পরিশ্রম করে এগুতে হয় এবং সেই পথে চলার ক্ষেত্রে বাধা না দিয়ে চলতে দেন। মানুষ ভালো পথে চললেও আল্লাহ তাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেন, খারাপ পথে চললেও।
- মানুষ দুটি পথের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কঠিন দুর্গম পথটির দিকে যেতে চায় না-
- ডান সারির লোকদের বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে-
    - খাদ্যদান করে (এখানে লক্ষনীয় বিষয় যে, বলা হচ্ছে- সেই খাওয়ানোটা হয় খুবই কঠিন দূর্ভিক্ষ এর সময়ে। অর্থাৎ সুখ সাচ্ছন্দ্যের সময়ে তো বটেই এমনকি বিপদের সময়েও তারা অন্যের প্রতি খেয়াল রাখে, সাহায্য করে।)
    - অসহায় সম্প্রদায় ইয়াতীমদেরকে সাহায্য করা
    - ধুলিমলিন মিসকীনদেরকে সাহায্য করা
    - ঈমানদার হওয়া
    - পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দেয়া
    - পরস্পরের প্রতি দয়ার উপদেশ দেয়া
- পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দেয়া ও দয়ার উপদেশ দেয়া এই কাজগুলো একাকী করা সম্ভব নয়। ১৭ তম আয়াতে বোঝানো হয়েছে ঈমান আনার পর ঈমানদাররা একাকী থাকার পরিবর্তে একটি দলে পরিনত হয়।
- যারা আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার করে তারা বাম সারির লোক। তাদের জন্য রয়েছে পরিবেষ্টিত অগ্নি।

সূরা মুলক (১-১৪ আয়াত)

সূরা মূলক কুরআনের ৬৭ তম সূরা। মূলক শব্দের অর্থ হল সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty). সূরাটির আয়াত সংখ্যা ৩০ টি। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয় তাই এটি মাক্কী সূরার শ্রেণীভুক্ত।

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের আল মুলক শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে ।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি কোন সময় নাযিল হয়েছিলো তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তু ও বর্ণনভংগী থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম।

বিষয়বস্তু

এ সূরাটিতে একদিকে ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে যেসব লোক বেপরোয়া ও অমনোযোগী ছিল তাদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে সজাগ করে দেয়া হয়েছে। মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের বৈশিষ্ট হলো, তাতে ইসলামের গোটা শিক্ষা ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী করে পাঠানোর উদ্দেশ্য সবিস্তারে নয় বরং সংক্ষেপ্তভাবে বর্ণন করা হয়েছে। ফলে তা ক্রমান্বয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় বদ্ধমূল হয়েছে। সেই সাথে মানুষের বেপরোয়া মনোভাব ও অমনোযোগিতা দূর করা, তাকে ভেবে চিন্তে দেখতে বাধ্য করা এবং তার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রথম পাঁচটি আয়াতে মানুষের এ অনুভূতিকে জাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে বিশ্বলোকে সে বাস করছে তা এক চমৎকার সুশৃংখ ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য। হাজারো তালাশ করেও সেখানে কোন রকম দোষ-ত্রুটি , অসম্পূর্ণতা, কিংবা বিশৃংখলার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এক সময় এ সাম্রাজ্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মহান আল্লাহই একে অস্তিত্ব দান করেছেন , এর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও শাসনকার্যের সমস্ত ইখতিয়ার নিরংকুশভঅবে তারই হাতে। তিনি অসীম কুদরতের অধিকারী। এর সাথে মানুষের একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এ পরম জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসংগত ব্যবস্থাসঙ্গত ব্যবস্থার মধ্যে তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এখানে তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। তার শুধু সৎকর্ম দ্বারাই সে এ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করতে সক্ষম।

আখেরাতে কুফরীর যে ভয়াবহ পরিণাম দেখা দেবে ৬ থেকে ১১ নং আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীদের পাঠিয়ে এ দুনিয়াতেই সে ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সামাধান করে দিয়েছেন। এখন তোমরা যদি এ পৃথিবীতে নবীদের কথা মনে নিয়ে নিজেদের আচরণ ও চাল-চলন সংশোধন না করো তাহলে আখেরাতে তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তোমাদের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তোমরা তার উপযোগী।

১২থেকে ১৪ নং আয়াতে এ পরম সত্যটি বুঝানো হয়েছে যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি কাজ ও কথা এমনকি তোমাদের মনের কল্পনাসমূহ পর্যন্ত অবগত। তাই নৈতিকতার সঠিক ভিত্তি হলো, মন্দ কাজের জন্য দুনিয়াতে পাকড়াও করার মত কোন শক্তি থাক বা না থাক এবং ঐ কাজ দ্বারা দুনিয়াতে কোন ক্ষতি হোক বা না হোক , মানুষ সবসময় অদৃশ্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয়ে সব রকম মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। যারা এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে আখেরাতে তারাই বিরাট পুরস্কার ও ক্ষমালাভের যোগ্য বলে গণ্য হবে।

১৫ থেকে ২৩ নং আয়াতে পরপর কিছু অবহেলিত সত্যের প্রতি ইংগিত দিয়ে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার আহবান জানানো হয়েছে। এগুলোকে মানুষ দুনিয়ায় নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার মনে করে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে না। বলা হয়েছে, এ মাটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখো। এর ওপর তোমরা নিশ্চিন্তে আরামে চলাফেরা করছো এবং তা থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় রিযিক সংগ্রহ করছো। আল্লাহ তা'আলাই এ যমীনকে তোমাদের আনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে যে কোন সময় এ যমীনের ওপর ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে তা তোমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। কিংবা এমন ঝড়- ঝাঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবে। মাথার ওপরে উড়ন্ত পাখীগুলোর প্রতি লক্ষ করো। আল্লাহই তো ওগুলোকে শূন্যে ধরে রাখেন। নিজেদের সমস্ত উপায়-উপকরণের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করে দেখো। আল্লাহ যদি তোমাদের শাস্তি দিতে চান তাহলে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? আর আল্লাহ যদি তোমাদের রিযিকের দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে এমন কে আছে, যে তা খুলে দিতে পারে? তোমাদেরকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়ার জন্য এগুলো সবই প্রস্তুত আছে। কিন্তু এগুলোকে তোমরা পশু ও জীব-জন্তুর দৃষ্টিতে দেখে থাকো। পশুরা এসব দেখে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানুষ হিসেবে আল্লাহ তোমাদেরকে যে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা ও বোধশক্তি সম্পন্ন মস্তিষ্ক দিয়েছেন , তা তোমরা কাজে লাগাও না। আর এ কারণেই তোমরা সঠিক পথ দেখতে পাও না।

২৪ থেকে ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবশেষে একদিন তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। নবীর কাজ এ নয় যে, তিনি তোমাদেরকে সেদিনটির আগমনের সময় ও তারিখ বলে দেবেন। তার কাজ তো শুধু এতটুকু যে, সেদিনটির আসার আগেই তিনি তোমাদের সাবধান করে দেবেন। আজ তোমরা তার কথা মানছো ন। বরং ঐ দিনটি তোমাদের সামনে হাজির করে দেখিয়ে দেয়ার দাবী করছো। কিন্তু যখন তা এসে যাবে এবং তোমরা তা চোখের সামনে হাজির দেখতে পাবে তখন তোমরা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।

২৮ থেকে ২৯ নং আয়াতে মক্কার কাফেরদের কিছু কথার জবাব দেয়া হয়েছে। এসব কথা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিতো এবং তাঁর ও ঈমানদারদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য বদ দোয়া করতো। তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে সৎপথের দিকে আহবানকারীরা ধ্বংস হয়ে যাক বা আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুক তাতে তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কি করে হবে? তোমরা নিজের জন্য চিন্তা করো। আল্লাহর আযাব যদি তোমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং যাঁরা তাঁর ওপরে তাওয়াক্কুল করেছে তোমরা মনে করছো তারা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন প্রকৃত গোমরাহ কারা তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অবশেষে মানুষের সমানে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে বলা হয়েছেঃ মরুভূমি ও পবর্তময় আরবভূমিতে যেখানে তোমাদের জীবন পুরোটাই পানির ওপর নির্ভরশীল, পানির এসব ঝরণা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসব জায়গায় পানির উৎসগুলো যদি ভুগর্ভের আরো নীচে নেমে উধাও হয়ে যায় তাহলে আর কোন শক্তি আছে, যে এই সঞ্জীবনী -ধারা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে?

সূরার ফযিলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনঃ কুরআনের ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট সূরা তাবারাকাল্লাযী (অর্থাৎ সূরা আল-মুলক) তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। এমনকি তাকে মাফ করে দেয়া হবে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা তাবারাকাল্লাযী তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য সুপারিশকারী হবে। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক সূরা দু'টি না পড়ে ঘুমাতেন না। [মিশকাত তাহকিক ছানী ২১৫৫, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২৮৯২]

আবুয যুবাইর (রহঃ) বলেন, এই সূরাদ্বয় কুরআন মজীদের অন্যসব সূরার তুলনায় সত্তর গুণ সওয়াবের মর্যাদা লাভের অধিকারী। কোন ব্যক্তি এই সূরাদ্বয় পড়লে তার জন্য এর বিনিময়ে সত্তরটি নেকী লেখা হয়, এর উসীলায় তার মর্যাদা সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয় এবং এর দ্বারা তার সত্তরটি গুনাহ মাফ করা হয়। (নাসাঈ, দারিমী, হাকিম, ইবনে আবু শায়বাহ)

আগের সূরা ও পরের সূরার সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরাতে রিসালাতের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাতে তাওহীদের কথা দলিল সহকারে পেশ করা হয়েছে এবং তাওহীদের দায়িত্বের ব্যাপারে ক্রুটি করলে তার পরিণতির কথাও পেশ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরাতে নেককার ও বদকার নারীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাতে এ আলোচনাকে সাধারণ ও ব্যাপক করে তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা মুলকে বেশীরভাগ আলোচনা ছিল তাওহীদের উপর এবং তার অবিশ্বাসীদের সম্বদ্ধে আর পরবর্তী সূরা কালামে অধিকাংশ আলোচনা রিসালতের অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে। আর নবুয়তকে অবিশ্বাস করা কুফরি এবং এ কুফরির প্রতিফল সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১. বরকতময় তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে; আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

تَبَارَكَশব্দটি بَرَكَةথেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হল বর্ধনশীল ও বেশী হওয়া। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর বহু ঊর্ধ্বে ও উচ্চে। تَفَاعلএর স্বীগা (আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী) অনেক ও আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার হয়। "সর্বময় কর্তৃত্ব বা রাজত্ব যাঁর হাতে" অর্থাৎ, সব রকমের শক্তি এবং আধিপত্য তাঁরই। তিনি যেভাবে চান বিশ্বজাহান পরিচালনা করেন। তাঁর কাজে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি ভিখারীকে বাদশাহ, আর বাদশাহকে ভিখারী, ধনীকে গরীব এবং গরীবকে ধনী বানান। তাঁর কৌশল ও ইচ্ছায় কারো হস্তক্ষেপ চলে না।

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পর্যক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

তিনি পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর এ ধারাবাহিকতা চালু করেছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, কোন মানুষটির কাজ বেশী ভাল তা দেখার জন্য। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে বেশ কিছু সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। প্রথম হলো, মৃত্যু এবং জীবন তাঁরই দেয়া। আর কেউ জীবনও দান করতে পারে না, মৃত্যুও ন। দ্বিতীয় হলো, মানুষ একটি সৃষ্টি, তাকে ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার কাজ করার শক্তি দেয়া হয়েছে। তার জীবন বা মৃত্যু কোনটিই উদ্দেশ্যহীন নয়, সৃষ্টা তাকে এখানে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। জীবন তার জন্য পরীক্ষার সময় বা অবকাশ মাত্র । মৃত্যুর অর্থ হলো, তার পরীক্ষার সময় ফুরিয়ে গেছে। তৃতীয় হলো, এ পরীক্ষার জন্য স্রষ্টা সবাইকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। সে ভাল মানুষ না খারাপ মানুষ, এ পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে সে যাতে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেককে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। চতুর্থ হলো, কার কাজ ভাল এবং কার কাজ খারাপ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তাই তার ফায়সালা করবেন। কাজের ভাল -মন্দ বিচার করার মানদণ্ড নির্ধারণ করা পরীক্ষার্থীর কাজ নয়, বরং পরীক্ষা গ্রহণকারীর কাজ। তাই যারাই পরীক্ষায় সফল হতে চাইবে , তাদেরকে জানতে হবে পরীক্ষা গ্রহণকারীর দৃষ্টিতে ভাল কাজ কি? পঞ্চম বিষয়টি পরীক্ষা কথাটির মধ্যেই নিহিত। তা হলো, যার কাজ যেমন হবে তাকে সে অনুপাতেই প্রতিফল দেয়া হবে। কারণ ফলাফলই যদি না থাকে তাহলে পরীক্ষা নেয়ার আদৌ কোন অর্থ হয় না।

পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল এর দুটি অর্থ এবং দু"টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি হলো, তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং সবার ওপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল , তাদের প্রতি জালেম ও কঠোর নন। দ্বিতীয়টি হলো, দুষ্কর্মকারীদের শাস্তি দেয়ার পুরো ক্ষমতা তাঁর আছে। এতো শক্তি কারো নেই যে তাঁর শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যারা লজ্জিত হয়ে দুষ্কর্ম পরিত্যাগ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের সাথে তিনি ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন।

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান। রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না; আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোন ত্রুটি দেখতে পান কি?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

৪. তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে।

মহান আল্লাহর অজস্র সৃষ্টির মধ্যে এক রহস্যময় সৃষ্টির নাম আকাশ। সুনিপুণ আকাশের দিকে তাকালে, একটু চিন্তা করলে মনের গহিনে প্রশ্ন উঁকি দেয়, কে সেই কারিগর? যে এ খুঁটিহীন বিশাল আকাশকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন? আল্লাহ তাআলা সে বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন এভাবে— 'আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ। আর সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ। বর্ষণ করেছি পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে প্রচুর পানি, যা দিয়ে উদগত করি শস্য, উদ্ভিদ এবং ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যানসমূহ। (সুরা নাবা: ১২-১৬)

আকাশের রহস্যের শেষ কোথায় তা আল্লাহই ভালো জানেন। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এ সপ্তস্তর বা সাত আকাশের পুরুত্ব ও দূরত্ব নিয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের ধারণা, এ সপ্তাকাশের প্রথম স্তরের পুরুত্ব আনুমানিক ৬.৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার। দ্বিতীয় আকাশের ব্যাস ১৩০ হাজার আলোকবর্ষ, তৃতীয় স্তরের বিস্তার ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। চতুর্থ স্তরের ব্যাস ১০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। পঞ্চম স্তরটি ১ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বে, ষষ্ঠ স্তরটি অবস্থিত ২০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের আর সপ্তম স্তরটি বিস্তৃত হয়ে আছে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত।

কত সময় অযথা নষ্ট হয়, অথচ একটু সময় করে আল্লাহ তাআলার এ সুনিপুণ আকাশ নিয়ে ভাবে না বান্দা। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে?' (সুরা আল গাশিয়াহ: ১৮)। 'আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি, অথচ তারা আমার আকাশের নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।' (সুরা আম্বিয়া: ৩২)।

জ্ঞানীদের উচিত আকাশের নান্দনিকতা, সুনিপুণ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এবং এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। যা মহান রবের পরিচয় জানতে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে, সর্বোপরি মহান রবের অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।"(সুরা আল ইমরান: ১৯০-১৯১)

শুধু রহস্য নয়, আকাশের অনন্য সৌন্দর্যেও মুগ্ধ হতে হয়। সেই সৌন্দর্যের বিমুগ্ধতায় প্রশান্ত হয় চিত্ত। আকাশের রূপ-রহস্য আর সৌন্দর্য অসীম। দিনে এক রকম, রাতে রূপ পাল্টিয়ে আরেক রকম সৌন্দর্য। এর পরতে পরতে যে রয়েছে কোনো এক মহান কারিগরের অসংখ্য নিদর্শন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা কি দেখে না তাদের মাথার উপরে আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে নির্মাণ করেছি এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি এবং তাতে নেই কোনো ফাটল' (সুরা ক্বাফ: ৫০/৬)

আয়াত ৩ এবং ৪ এ ৭ টি আসমানে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃষ্টির নৈপূন্য এর কথা বলা হয়েছে এবং কোন খুত/অসংগতি আছে কিনা তা খুজতে বলা হয়েছে। একবার নয় বরং আরো একবার (বারবার) খুজে দেখতে বলা হয়েছে। কারন ১ম বার মানুষ অবাক হয়ে কোন কিছু দেখে। তখন কোন ভুল ত্রুটি, অসঙ্গতি চোখে পড়ে না। ২য় বার বা বারবার ভাল করে দেখলে ভুল ধরা পড়ে। তাই ১ম অবাক দৃষ্টির পর ২য় অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়েও খুত/অসংগতি খুজতে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। আল্লাহ সারা জীবনের জন্য সকলের নিকট ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছেন যে, যতবারই দেখা হোক না কেন কোন অসঙ্গতি ধরা পড়বে না।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

৫. আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শায়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

কাছের আসমান অর্থ সে আসমান যার তারকারাজি এবং গ্রহসমূহকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। এর চেয়েও দূরে অবস্থিত যেসব বস্তুকে দেখতে যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় তাহলো দূরের আসমান। আর যন্ত্রপাতির সাহায্যও যা দেখা যায় না তাহলো অধিক দূরবর্তী আসমান।

মাসাবিহা শব্দটি এখানে অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এসব প্রদীপের সুবিশাল হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয় । কথাটির অর্থ হলো, আমি এ বিশ্ব-জাহানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জনমানবহীন করে সৃষ্টি করিনি। বরং তারকারাজির দ্বারা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছি। রাতের অন্ধকারে মানুষ যার জাঁকজমক ও দীপ্তিময়তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়।

'সেগুলোকে করেছি শায়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ' এর অর্থ এটা নয় যে, এসব তারকাকেই শয়তানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়। আবার এ অর্থও নয় যে, শুধু শয়তানদেরকে মারার জন্যই উল্কার পতন ঘটে। বরং এর অর্থ হলো তারকারাজি থেকে যে অসংখ্য উল্কাপিণ্ড নির্গত হয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এবং এরা অগণিত সংখ্যায় প্রতি মুহূর্তে ভুপৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে, সেগুলো পৃথিবীর শয়তানদের ঊর্ধ জগতে উঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে।তারা ওপরে উঠার চেষ্টা করলেও উল্কা পিণ্ডগুলো তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়টি বলার প্রয়োজন এ জন্য যে, গণকদের সম্পর্কে আরবের লোকেরা এ ধারণা পোষণ করতো যে, শয়তানরা তাদের অনুগত বা শয়তানদের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। এসব শয়তানের মাধ্যমে তারা গায়েবের খবর পেয়ে থাকে এবং সঠিকভাবে মানুষের ভাগ্য গণনা করতে পারে। গণকরা নিজেরও এ দাবী করতো। তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, শয়তানদের ঊর্ধ জগতে ওঠা এবং সেখান থেকে গায়েবের খবর অবহিত হওয়ার আদৌ কোন সম্ভবনা নেই।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ উল্কাগুলো আসলে কি? এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান চূড়ান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ কোন সিদ্ধান্ত দিতে এখনো অক্ষম। তা সত্ত্বেও আধুনিককালে যেসব তত্ত্ব ও বাস্তব অবস্থা মানুষের জ্ঞানের আওতায় এসেছে এবং ভুপৃষ্ঠে পতিত উল্কাপিণ্ডসমূহের পর্যবেক্ষণ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তাত্ত্বটি হলোঃ এসব উল্কাপিণ্ড কোন গ্রহে বিষ্ফোরণের কারণে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াতে থাকে এবং কোন এক পর্যায়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় এসে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে।

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

৬. আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; এবং তা কত মন্দ ফিরে যাওয়ার স্থান!

মানুষ হোক কিংবা শয়তান যারাই তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে, এটাই হয়েছে তাদের পরিণাম।

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ

৭. যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত।

মূল ইবারতে شَهِيق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাধার ডাকের মত আওয়াজ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, এটা খোদ জাহান্নামের শব্দ। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, “জাহান্নামের দিকে যাওয়ার পথে এসব লোক দূরে থেকেই তার ক্রোধ ও প্রচণ্ড উত্তেজনার শব্দ শুনতে পাবে।” [সূরা আল-ফুরকান: ১২] আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিমধ্যেই যেসব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, এ জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে হাঁপাতে, গোঙ্গাতে এবং হাসফাস করতে থাকবে।” [সূরা হূদ; ১০৬]

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ

৮. রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

এ প্রশ্নের ধরন আসলে প্রশ্নের মত হবে না এবং তাদের কাছে কোন সতর্ককারী এসেছিল কিনা জাহান্নামের কর্মচারীরা তাদের কাছে তা জানতেও চাইবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হবে তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ের স্বীকারোক্তি আদায় করা যে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের প্রতি কোন বেইনসাফী করা হচ্ছে না। তাই তারা তাদের মুখ থেকেই এ মর্মে স্বীকৃতি আদায় করতে চেষ্টা করবেন যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে বেখবর রাখেননি। তিনি তাদের

কাছে নবী পাঠিয়েছিলেন, সত্য কি ও সঠিক পথ কোনটি তা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ সত্য ও সঠিক পথের বিপরীত পথে চলার পরিণাম স্বরূপ যে তাদের এ জাহান্নামের জ্বালানি হতে হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আজ সে জাহান্নামেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু তারা নবীদের কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে এখন যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তারা আসলে তার উপযুক্ত।

কুরআন মজীদে এ বিষয়টি বার বার স্মারণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একটি পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষাটি নেয়ার পদ্ধতি এমন নয় যে, মানুষকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত রেখে সঠিক পথে সে চলে কিনা তা দেখা হচ্ছে। বরং তাকে সঠিক পথ চিনিয়ে দেয়ার জন্য যে সম্ভাব্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল মহান আল্লাহ তা পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করেছেন। সে ব্যবস্থা অনুযায়ী নবী-রাসূল পাঠানো হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে। মানুষ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন সেগুলোকে মেনে নিয়ে সঠিক পথে চলবে, না তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের প্রবৃত্তি ও মনগড়া ধ্যাণ-ধারণার পেছনে ছুটবে, এখন তাদের সমস্ত পরীক্ষা এ একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ । নবুওয়াত মহান আল্লাহর একটি প্রমাণ। এভাবে তিনি মানুষের সামনে তাঁর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা মানা বা না মানার ওপরে মানুষে ভবিষ্যত নির্ভর করছে।নবী-রাসূলদের আগমনের পর কোন ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা না জানার ওজর পেশ করতে পারে না। তাকে না জানিয়ে অলক্ষেই এতো বড় পরীক্ষা নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এখন বিনা অপরাধেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে, এ ওজর তার ধোপে টিকবে না। এ বিষয়টি এতো অধিকবার বিভিন্নভাবে কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে যে , তার সংখ্যা নির্ণয় করাও কঠিন।

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

৯. তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছ।

আমরা পয়গম্বরদেরকে সত্যজ্ঞান করার পরিবর্তে তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিলাম। আসমানী কিতাবসমূহকে একেবারে অস্বীকার করেছিলাম। এমনকি আল্লাহর পয়গম্বরদেরকে আমরা বলেছিলাম যে, তোমরা বড়ই ভ্রষ্টতার মধ্যে আছ।

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

১০. আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না।

আমরা যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে নবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা নবীগণ আমাদের সামনে যা পেশ করেছেন তা আসলে কি বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করতাম। এখানে শোনার কাজেকে বুঝার কাজের

আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ হলো, প্রথমে নবীর শিক্ষা আগ্রহ ও মনযোগ সহকারে শোনা (কিংবা তা যদি লিখিত আকারে থাকে তাহলে সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তা পড়ে দেখা) হিদায়াত লাভ করার পূর্ব শর্ত । চিন্তা-ভাবনা করে তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর্যায় আসে এর পরে। নবীর দিকনির্দেশনা ছাড়া নিজের বিবেক -বুদ্ধি খাটিয়ে সরাসরি সঠিক পথ লাভ করা যায় না।

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ

১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য!

অপরাধ কথাটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে যে কারণে তারা জাহান্নামের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে তা হলো রসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করা। অন্যসব অপরাধ এরি ডাল -পালা মাত্র।

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

১২. যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এটিই হলো নৈতিকতার মূল। কেউ যদি খারাপ কাজ থেকে শুধু এ জন্য বিরত থাকে যে, তার নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিচারে কাজটি খারাপ কিংবা সব মানুষ সেটিকে খারাপ মনে করে কিংবা তা করলে পার্থিব জীবনে কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে কিংবা এজন্য কোন পার্থিব শক্তির তাকে পাকড়াও করার ভয় আছে তাহলে সেটি হবে নৈতিকতার একটি স্থায়ী ভিত্তি। মানুষের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ভুলও হতে পারে। বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতার কারণে সে একটি ভাল জিনিসকে মন্দ এবং একটি মন্দ জিনিসকে ভাল মনে করতে পারে। ভাল ও মন্দ যাচাই করার পার্থিব মানদণ্ড প্রথমত এক রকম নয়। এ ছাড়াও তা সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। দুনিয়ার নৈতিক দর্শনে কোন বিশ্বজনীন ও স্থায়ী মানদণ্ড বর্তমানেও নেই অতীতেও ছিল না। পার্থিব ক্ষতির আশংকাও নৈতিকতার কোন স্বতন্ত্র মানদণ্ড নয়। দুনিয়ার জীবনে নিজের কোন ক্ষতি হতে পারে শুধু এ ভয়ে যে ব্যক্তি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই, এমন অবস্থায় সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে না। একইভাবে কোন পার্থিব শক্তির কাছে জবাবদিহির আশংকাও এমন কিছু নয় যা একজন মানুষের ভদ্র ও সৎ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে । সবাই জানে, পার্থিব কোন শক্তিই দেখা ও না দেখা বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী নয় ।তার দৃষ্টির বাইরে অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। যেকোন পার্থিব শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য অসংখ্য কৌশল ও ফন্দি-ফিকির অবলম্বন সম্ভব। এ ছাড়াও পার্থিব শক্তির রচিত আইন ব্যবস্থা সব রকমের অপরাধকে তার আওতাধীন করতে পারে না। বেশীর ভাগ অপরাধই এমন পর্যায়ের , পার্থিব আইন-কানুন যার ওপর আদৌ কোন হস্তক্ষেপ করে না। অথচ পার্থিব আইন ব্যবস্থা যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সেগুলোর চেয়ে তা জঘন্য।

তাই ইসলামী জীবন বিধান নৈতিকতার প্রসাদ এমন একটি বুনিয়াদের ওপর নির্মাণ করেছে যার ভিত্তিতে অদৃশ্য আল্লাহর ভয়ে সব খারাপ কাজ বর্জন করতে হয়। যে আল্লাহ সর্বাবস্থায় মানুষকে দেখছেন, যার হস্তক্ষেপ ও পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা কররে মানুষ কোথাও যেতে সক্ষম নয়। যিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ যাচাইয়ের জন্য একটি সার্বিক , বিশ্বজনীন এবং পূর্নাঙ্গ মানদণ্ড দিয়েছেন, শুধু তাঁর ভয়ে মন্দ ও অকল্যাণকে বর্জন করা এবং ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করা এমন একটি কল্যাণকর নীতি যা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। এ কারণটি ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে কোন মানুষ অন্যায় না করে কিংবা বাহ্যিকভাবে যেসব কাজে নেকীর কাজ বলে গণ্য হয় তা করে তাহলে তার এ নৈতিকতা আখেরাতে কোন মূল্য ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। কারণ তা হবে বালির স্তপের ওপর নির্মিত প্রাসাদের মতো।

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

১৩. আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরসমূহে যা আছে তা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

একথাটি কাফের ও মুমিন নির্বিশেষে গোটা মানব জাতিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। এতে মু"মিনের জন্য শিক্ষা হলো, দুনিয়ায় জীবন যাপনকালে তাকে তার মন-মগজে এ অনুভূতি কার্যকর রাখতে হবে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা ও কাজই শুধু নয় তার নিয়ত ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত কোন কিছুই আল্লাহর অজানা নয়। আর কাফেরের জন্য এতে সাবধানবাণী হলো এই যে, আল্লাহকে ভয় না করে সে নিজ অবস্থানে থেকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু তার কোন একটি ব্যাপারও আল্লাহর কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের আওতা বহির্ভুত নয়।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

মন ও অন্তর এবং তাতে উদিত যাবতীয় খেয়ালের সৃষ্টিকর্তা তো মহান আল্লাহই। তিনি কি নিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবহিত থাকতে পারেন? এখানে প্রশ্নবাচক শব্দ অস্বীকৃতি সূচক। অর্থাৎ, তিনি অনবহিত নন; তিনি সব জানেন।

لَطِيْفٌএর অর্থ হল সূক্ষ্মদর্শী। الَّذِيْ لَطُفَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْقُلُوْبِ অর্থাৎ, যিনি হৃদয়ের যাবতীয় খবর ও অবস্থা সূক্ষ্মভাবে জানেন ও দেখেন।

ফুটনোট

- সূরাটিতে প্রথমে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে এবং মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে।
- এই সূরার প্রথমদিকের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌র কিছু পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে-
    - সর্বময় কর্তৃত্ব তার হাতে;
    - তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান
    - তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন
    - তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।
    - তিনি রাহমান
    - তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।
- ২য় আয়াতের 'যিনি মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন' এই কথাটি হতে বোঝা যায় যে, মৃত্যু আলাদা একটি সৃষ্টি; শুধুমাত্র জীবনের অনুপস্থিতিই মৃত্যু নয়। এছাড়া আরো বোঝা যায় যে, যিনি মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তিনি অবশ্যই মৃত্যু থেকে মুক্ত, অর্থাৎ মৃত্যু তাঁর উপর কার্যকর হতে পারে না।
- ৭ টি আসমান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃষ্টির নৈপুন্য এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- সৃষ্টির নৈপুন্য দেখার কথা বলা হয়েছে।
- রাসূল সাঃ কে আমাদের জন্য সর্তককারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে।
- নবীর শিক্ষা আগ্রহ ও মনযোগ সহকারে শোনা (কিংবা তা যদি লিখিত আকারে থাকে তাহলে সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তা পড়ে দেখা) হিদায়াত লাভ করার পূর্ব শর্ত ।
- নবুয়তের অবিশ্বাসকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।
- সূরা মুলকের অনেক ফযিলত রয়েছে একটি হলো- যে ব্যক্তি সূরা তাবারাকাল্লাযী তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য সুপারিশকারী হবে। আরেকটি ফজিলত হলো- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক সূরা দু'টি না পড়ে ঘুমাতেন না।

সূরা মূলক ১৫-৩০

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে তোমরা আহার কর; আর পুনরুত্থান তো তাঁরই কাছে।

ভুপৃষ্ঠ নিজে থেকেই তোমাদের অনুগত হয়ে যায়নি। আর যে খাবার তোমরা লাভ করছো তাও আপনা থেকেই এখানে সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ তাঁর হিকমত ও কুদরত দ্বারা এ পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানে তোমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হচ্ছে এবং বিশাল গ্রহটি এমন শান্তিময় হয়ে উঠেছে যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এখানে চলাফেরা করছো। তোমাদের জন্য এটি এমন একটি নিয়ামতের ভাণ্ডরে হয়ে উঠেছে যে, তোমাদের জীবন যাপনের জন্য এখানে অসংখ্য উপকরণ বর্তমান আছে। যদি তোমরা গাফিল না হয়ে থাকো এবং কিছু বিবেক - বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে দেখো তাহলে জানতে পারবে, ভূ পৃষ্ঠকে তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী বানাতে এবং সেখানে রিযিকের অফুরন্ত ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে পরিমাণ বুদ্ধি ও কৌশল কাজে লাগানো হয়েছে।

এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও। কিন্তু একথা ভুলে যেও না যে, একদিন তোমাদের আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

১৬. তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দেবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাপতে থাকবে?

এর দ্বারা একথা বুঝায় না যে, আল্লাহ আসমানে থাকেন। বরং একথাটি এভাবে বলার কারণ হলো, মানুষ যখনই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তখনই সে আসমানের দিকে তাকায়, দোয়া করার সময় আসমানের দিকে হাত উঠায়, কোন বিপদের সময় সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা ও অবলম্বন থেকে নিরাশ হয়ে গেলে আসমানের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে । আকস্মিকভাবে কোন বিপদ আপতিত হলে বলে ,এটি ওপর থেকে নাযিল হয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে পাওয়া কোন জিনিস সম্পর্কে বলে এটি উর্ধ জগত থেকে এসেছে । আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি একটি কাল দাসীকে সাথে করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললোঃ একজন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করা আমার ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। আমি কি এই দাসটিকে মুক্ত করতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীটিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আল্লাহ কোথায়? সে আংগুল দিয়ে

আসমানের দিকে ইশারা করে দেখালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ আমি কে? সে প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এবং আসমানের দিকে ইশারা করলো। এভাবে তার উদ্দেশ্য বুঝা যাচ্ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ একে মুক্ত করে দাও, এ ঈমানদার। (মুয়াত্তা, মুসলিম, ও নাসায়ী হাদীসগ্রন্থেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে)

হযরত উমর (রা) হযরত খাওলা বিনতে সা"লাবা সম্পর্কে একবার বলেন যে, তিনি এমন এক মহিলা যার আবেদন সাত আসমানের ওপর থেকে কবুল করা হয়েছে। এসব কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষ যখন আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করে তখন স্বভাবই তার মন নিচে মাটির দিকে যায় না। বরং ওপরে আসমানের দিকে যায়। এদিকে লক্ষ রেখেই এখানে আল্লাহ তা"আলা সম্পর্কে -(যিনি আসমানে আছেন) কথাটি বলা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই যে, কুরআন আল্লাহ তা"আলাকে আসমানে অবস্থানকারী বলে ঘোষনা করছে। কি করে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে? এ সূরা মুলকেরই শুরুতেই বলা হয়েছে -(তিনি স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন। সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে - (তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেটিই আল্লাহর দিক।

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড় প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে, কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী!

এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এ পৃথিবীতে তোমাদের টিকে থাকা এবং নিরাপত্তা লাভ করা সমসময় মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার ওপর নির্ভর করে। তোমরা আপন শক্তির জোরে এ পৃথিবীতে সুখের জীবন যাপন করছো না। তোমাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত , যা এখানে অতিবাহিত হচ্ছে, তার সবই আল্লাহর হিফাযত ও তত্ত্বাবধানের ফল। অন্যথায় তাঁর ইংগিতে যে কোন সময় এ পৃথিবীতে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে এবং এ পৃথিবী তোমাদের জন্য মায়ের স্নেহময় কোল না হয়ে কবরে পরিণত হতো। অথবা যে কোন সময় এমন ঝড় ঝাপ্টা আসতে পারে যা তোমাদের জনপদকে ধ্বংস করে ফেলবে।

সাবধানবাণী মানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছিল, যদি তোমরা কুফরী ও শিরক থেকে বিরত না হও এবং তাওহীদের যে আহবান তোমাদের জানানো হচ্ছে তাতে সাড়া না দাও তাহলে আল্লাহর আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

১৮. আর এদের পূর্ববর্তগণও মিথ্যারোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি)।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উপরে পাখিদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্ই তাদেরকে স্থির রাখেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

অর্থাৎ শূন্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখি করুণাময় আল্লাহর হিফাযতে থেকে উড়ে থাকে। তিনি প্রতিটি পাখিকে এমন দৈহিক কাঠামো দান করেছেন যার সাহায্য তারা উড়ে বেড়াবার যোগ্যতা লাভ করছে। তিনিই প্রতিটি পাখিকে উড়তে শিখিয়েছেন। তিনিই বাতাসকে এমন সব নিয়ম-কানুনের অধীন করে দিয়েছেন যে কারণে বাতাসের চেয়ে ভারী দেহের অধিকারী বস্তুসমূহের পক্ষেও বাতাসে ভর দিয়ে উড়া সম্ভব । আর উড়তে সক্ষম প্রতিটি বস্তুকে তিনি শূণ্যে ধরে রাখেন। তা না হলে আল্লাহ তাঁর হিফাযত উঠিয়ে নেয়া মাত্রই তা মাটিতে পড়ে যেতো।

অর্থাৎ গুটিকয়েক পাখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহর হিফাযত করার কারণে টিকে আছে। প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন তা তিনিই যোগান দিচ্ছেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী ঠিকমত পৌছানোর ব্যবস্থা তিনিই করেন।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ

২০. দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা তো রয়েছে প্রবঞ্চনার মধ্যে।

প্রশ্নবাচক এই উক্তি এখানে ধমকের জন্য এসেছে। جُنْدٌএর অর্থ হল সৈন্যদল, গোষ্ঠী। অর্থাৎ, কোন সৈন্যদল বা গোষ্ঠী এমন নেই, যে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

২১. এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি বৃষ্টি বর্ষণ না করেন অথবা যমীনকেই যদি ফসলাদি উৎপন্ন করতে নিষেধ করে দেন কিংবা যদি পাকা ফসলকে নষ্ট করে দেন; যেমন কখনো কখনো তিনি এইরূপ করে থাকেন, যার কারণে তোমাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি মহান আল্লাহ এইরূপ করে দেন তাহলে বল, আর এমন কে আছে, যে আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত তোমাদের জন্য রুযীর ব্যবস্থা করে দেবে?

তাদের উপর ওয়ায-নসীহতের এই কথাগুলোর কোন প্রভাব পড়ে না, বরং তারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেই যাচ্ছে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভ্রষ্টতার দিকে আগে বাড়তেই আছে। না তারা উপদেশ গ্রহণ করে, আর না তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?

মুখে ভর দিয়ে যে চলে সে ডানে-বামে, আগে-পিছে কিছুই দেখে না এবং সে হোঁচট খাওয়া থেকেও রক্ষা পায় না। এমন মানুষ কি নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে? অবশ্যই না। অনুরূপ দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানীতে ডুবে থাকা ব্যক্তি পরকালে সাফল্য লাভ করা হতে বঞ্চিত থাকবে।

সিরাতুল মুস্তাকিম- যে পথে কোন বক্রতা নেই ও ভ্রষ্টতার আশঙ্কা নেই এবং সে সামনে ও ডানে-বামে দেখতেও পায়। নিশ্চিত যে, এমন ব্যক্তি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্যের সরল পথ অবলম্বনকারী আখেরাতে বড়ই সৌভাগ্যবান হবে। কেউ কেউ বলেন যে, এটা মুমিন ও কাফের উভয়ের সেই অবস্থার বিবরণ, যা কিয়ামতে তাদের হবে। কাফেরদেরকে মুখের উপর ভর করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর মুমিনরা সোজা হয়ে নিজের পায়ে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন, কাফেরদের ব্যাপারে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করব " (সূরা বানী ইস্রাঈল ৯৭ আয়াত)

হাদীসে এসেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, কাফেররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের ওপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? [বুখারী: ৪৭৬০, মুসলিম: ২৮০৬]

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

২৩. বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরন। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আল্লাহ তোমাদের মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, জন্তু-জানোয়ার করে পাঠাননি। তোমাদের কাজ তো এ ছিল না যে, দুনিয়ায় যে গোমরাহী বিস্তারলাভ করে আছে তোমরা চোখ বন্ধ করে তাই মেনে চলবে, ভেবেও দেখবে না, যে পথে তোমরা চলছো তা সঠিক কিনা। কেউ যদি তোমাদের সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝাতে চেষ্টা করে, তার কথা তোমরা কানেই তুলবে না এবং তোমাদের মন-মস্তিষ্কে আগে জেঁকে বসা অসত্য ও অন্যায়কে আঁকড়ে থাকবে এ উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে এ কান দেয়া হয়নি। এ চোখ তো এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা অন্ধের মতো অন্যের অনুসরণ করবে। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনসমূহ আল্লাহর রাসূলের পেশকৃত তাওহীদের সাক্ষ দিচ্ছে কি না এ বিশ্ব - জাহানের ব্যবস্থাপনা খোদাহীন বা বহুখোদার পরিচালনাধীন হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তোমরা তা দেখবে না এজন্য এ চোখ তোমাদেরকে দেয়া

হয়নি। এ মন-মস্তিস্কেও তোমাদের এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা ও বিচার -বিবেচনার কাজ অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াতে এমন সব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে চলবে যা অন্য কেউ চালু করেছে। তোমরা বিবেক -বুদ্ধি খাটিয়ে এতোটুকুও ভেবে দেখবে না যে, তা সঠিক না ভ্রান্ত। জ্ঞানও বিবেক -বুদ্ধি এবং শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির এ নিয়ামত আল্লাহ তোমাদের দিয়েছিলেন ন্যায় ও সত্যকে চিনার জন্য। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো। এসব উপকরণের মাধ্যমে তোমরা সব কাজই করছো। কিন্তু যে জন্য তা তোমাদের দেয়া হয়েছিলো সে একটি কাজই মাত্র করছো না।

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

২৪. বলুন, তিনিই যমীনে তোমাদেরকে সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

অর্থাৎ মৃত্যুলাভের পরে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে পরিবেষ্টিত করে আনা হবে এবং আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

২৫. আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?

এভাবে প্রশ্ন করে তারা কিয়ামতের সময় ও তার দিন তারিখ জানতে চাইতো না। তারা এ উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতো না যে, তাদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সন, মাস, দিন ও সময় বলে দিলে তারা তা স্বীকার করে নেবে। বরং তারা মনে করতো কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ও অযৌক্তিক। আর তা মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটা বাহানা হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্ন তারা করতো। তাদের মূল বক্তব্য হলো, তুমি আমাদেরকে কিয়ামতের যে অদ্ভুত কাহিনী শুনাচ্ছো , তা কখন আত্মপ্রকাশ করবে? কোন সময়ের জন্য তা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে? আমাদের চোখের সামনে এনে তা দেখিয়ে দিচ্ছো না কেন? দেখিয়ে দিলেই তো আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যেতো। এ বিষয়ে একটি কথা ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে, কেউ কিয়ামতের সত্যতা স্বীকার করলে বিবেক -বুদ্ধি ও যুক্তি -প্রমাণ দ্বারাই করতে পারে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। এখন থেকে যায় কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার তারিখ সম্পর্কিত বিষয়টি। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আলোচনায় কোন অকাট্য মুর্খই কেবল এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। কারণ, দিন তারিখ বলে দিলেও তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হবে না। অস্বীকারকারী তখন বলবে, যখন তা তোমাদের দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে সংঘটিত হবে তখন মেনে নেবো। আজ আমি কি করে একথা বিশ্বাস করবো যে, তোমার দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

২৬. বলুন, এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই কাছে আছে, আর আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

অর্থাৎ একথা তো আমার জানা যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আর তার আসার আগে মানুষকে সাবধান করে দেয়ার জন্য এতোটুকু জানাই যথেষ্ট। তবে কখন আসবে তা একমাত্র আল্লাহ তা"আলাই জানেন। আমি সে সম্পর্কে কিছু জানি না। আর সাবধান করে দেয়ার জন্য সে বিষয়ে জ্ঞান থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভালভাবে বুঝা যেতে পারে। কোন ব্যক্তি কখন মারা যাবে একমাত্র আল্লাহ তা"আলা ছাড়া আর কেউ তা জানে না। তবে আমরা এতোটুকু জানি যে, প্রত্যেককেই এক সময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এখন আমাদের এ জ্ঞানটুকু আমাদের কোন অসতর্ক প্রিয়জনকে মৃত্যু সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্য যথেষ্ট। যাতে সে যথাযথভাবে তার স্বার্থের হিফাযত করতে পারে। এতোটুকু সাবধান করে দেয়ার জন্য সে কোনদিন মারা যাবে তা জানা জরুরী নয়।

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ

২৭. অতঃপর তারা যখন তা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের চেহারা ম্লান হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, এটাই হল তা, যা তোমরা দাবী করেছিলে।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

২৮. বলুন, তোমরা আমাকে জানাও—যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফিরদেরকে কে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে?

মক্কা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের সূচনা হলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। এতে মক্কার প্রতিটি পরিবার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে অভিশাপ দেয়া শুরু হলো। তাঁর বিরুদ্ধে যাদুটোনা বা তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ শুরু হলো, যাতে তিনি ধ্বংস হয়ে যান। এমনকি হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকলো। তাই এখানে বলা হয়েছে এদের বলো, আমরা ধ্বংস হয়ে যাই বা আল্লাহর রহমতের বেঁচে থাকি তাতে তোমাদের কি লাভ? আল্লাহর আযাব এলে তোমরা নিজেরা কিভাবে নিষ্কৃতি পাবে সে চিন্তা করতে থাক।

قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

২৯. বলুন, তিনিই রহমান, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি, এবং তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি। অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

অর্থাৎ আমরা আল্লাহর ওপরে ঈমান এনেছি আর তোমরা তাঁকে অস্বীকার করে চলছো। আমরা ভরসা করি একমাত্র আল্লাহর ওপর আর তোমরা ভরসা করো তোমাদের দল, পার্থিব উপায়-উপকরণ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সব উপাস্য দেব-দেবীদের ওপর। তাই আমরাই আল্লাহর রহমত লাভের উপযুক্ত, তোমরা নও।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ

৩০. বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?

غَوْرٌ শব্দের অর্থ হল শুকিয়ে যাওয়া অথবা পানির এত গভীরে চলে যাওয়া যে, সেখান হতে তা বের করা অসম্ভব হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যদি পানি শুকিয়ে দিয়ে তার অস্তিত্বই শেষ করে দেন অথবা মাটির এত গভীরে করে দেন, যেখান থেকে পানি বের করতে সর্বপ্রকার যন্ত্র ব্যর্থ সাব্যস্ত হয়, তাহলে বল, কে আছে এমন, যে তোমাদের জন্য প্রবহমান ও নির্মল পানির ব্যবস্থা করে দেবে? অর্থাৎ, কেউ নেই। এটা মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, তোমাদের অবাধ্যতা সত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত করেননি।

ফুটনোট

- আল্লাহ্ আমাদেরকে অনেক অনেক নেয়ামত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। সমস্ত 'নিয়ামত, বারাকাহ, বৃদ্ধি' আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, তিনিই মহান। তিনি নিয়ামতের সবচেয়ে বরকতময় উৎস।
- কেয়ামতের জ্ঞান একান্তভাবে আল্লাহর কাছে।
- ভরণপোষণ এবং সম্পূর্ণ সুরক্ষা আল্লাহর কাছ থেকে আসে। তিনি একাই সমস্ত ভরণ-পোষণের উৎস– বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক। তিনি আমাদেরকে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন তাই আমাদের কর্তব্য তাকে খুশি করা, শুকরিয়া আদায় করা, আনুগত্য করা।
- সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করা আমাদের অস্তিত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল পরকাল। সুতরাং মৃত্যুর স্মরণ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক হওয়া উচিত। যাতে আমরা যতটা পারি উভয় জগতের হাসানাহ (সর্বোত্তম) জন্য চেষ্টা করা। মৃত্যুকে অস্বীকার করবেন না বা ভুলে যাওয়া যাবে না।
- আমাদের হৃদয় সবসময় পরিষ্কার রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কারণ আমরা যা করি, বলি, বিশ্বাস করি এবং চিন্তা করি সবকিছু সম্পর্কে আমাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পূর্ণ অবগত।
- রবকে খুঁজে পাওয়া, চেনার জন্য সময় দিতে হবে – আমাদের চারপাশে এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে চিন্তা করার মতো অনেক কিছু রয়েছে। এই ধরনের প্রতিফলন আপনাকে জীবনে অনুপ্রাণিত করবে। আমাদের রবকে খুঁজতে পেতে সহযোগিতা করবে।
- সবসময় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। তাঁর করুণা এবং সাহায্যের সন্ধান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে তিনিই সমস্ত মঙ্গলের চূড়ান্ত উৎস। তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৩

সূরা আল-মুনাফিকুন

সূরা আল-মুনাফিকুন কুরআনের ৬৩ তম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১১ এবং রূকু সংখ্যা ২। সূরা আল-মুনাফিকুন মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

কোন কোন বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, এ ঘটনাটি তাবুক যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল। [আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ী: ১১৫৯৭ তিরমিযী: ৩৩১৪] কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনী-মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় এ আয়াত সংক্রান্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। [তিরমিযী: ৩৩১৫, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৯২, ইবনে হাজার: মুকাদ্দিমাহ ফাতহুল বারী ১/২৯৫, ৬/৫৪৭, ইবনে সা'দ: তাবাকাতুল কুবরা: ৪/৩৪৯] আর এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত। কারণ, ঘটনায় বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল। ঘটনাটির সার সংক্ষেপ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী মুস্তালিক যুদ্ধে বের হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম পানির ব্যাপারে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এরপর যখন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী একটি কুপের কাছে সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে পানি ব্যবহার নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌছে গেল।

মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্যে মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলিমদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌছে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন, مَابَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ অর্থাৎ 'এ কি মূর্খতাযুগের আহবান।' দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও সহযোগিতার আয়োজন হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন, دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ 'এই শ্লোগান বন্ধ করা। এটা দুর্গন্ধময় স্লোগান।" অর্থাৎ এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসুলভ দুর্গন্ধময় স্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই উপদেশবাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহজাহ ইবনে সা'দ আল-গিফারী এর বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার হাতে সিনান ইবনে ওবরা আল-জুহানী আল-আনসারী। রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হয়েছিলেন। ওবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালেম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলিমদের সাথে আগমন করেছিল তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে

যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিষ্কার করে দিবে। সম্মানী বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং বাজে লোক বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম। যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ কথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেনঃ আল্লাহর কসম, তুই-ই বাজেলোক লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলিমদের ভালবাসার জোরে মহাসম্মানী।

যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মজলিস থেকে উঠে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাকে বলে শোনালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ বৎস দেখ, তুমি মিথ্যা বলছি না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেনঃ না। আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেনঃ তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয় নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ আল্লাহর কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ কথা বলেছিলেনঃ আপনি আব্বাদ ইবনে বিশারকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ে সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কাসওয়া' উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেনঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছি? সে অনেক কসম খেয়ে বললঃ আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবতঃ যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই এ কথা বলেনি।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযর কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরষ্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও

সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কেরাম মনযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থাকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুণরায় সফর শুরু করলেন। ইতোমধ্যে উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে উপদেশাচ্ছলে বললেনঃ তুমি এক কাজ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। এতে তোমার মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ওবাদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তখনই বললেনঃ আমার মনে হয়, তোমার এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কুরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বার বার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসতেন। তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কুরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তার শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার উষ্ট্রী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থা দূর হয়ে গেল।

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমার সওয়ারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকে আমার কান ধরলেন এবং বললেন, "হে বালক, আল্লাহ তা'আলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন"। আর সম্পূর্ণ সূরা আল-মুনাফিকুন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [পুরো ঘটনাটি কোথাও একত্রে বর্ণিত হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ দেখা যেতে পারে। বুখারী: ৪৯০০, ৪৯০২, ৪৯০৫, মুসলিম: ২৫৮৪, ২৭৭২, নাসায়ী, ৯৭৭, তিরমিযী: ৩৩১২, ৩৩১৩, ৩৩১৪, ৩৩১৫, মুসনাদে আবি ইয়া'লা: ১৮২৪, মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩৩৮, ৪/৩৬৮, ৩৭৩, ইবনে হিব্বান: ৫৯৯০, দালায়েলুন নাবুওয়ত লিল বাইহাকী: ৪/৫৩-৫৫, সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩/৬৯, সীরাতে ইবনে কাসীর: ৩/১০৩]

আলোচ্য বিষয়বস্তুঃ

১ম অংশে (আয়াত ১-৩) আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের একটা পরিচয় (মিথ্যাবাদী, আল্লাহর পথ থেকে নিজেরা দূরে থাকা ও অন্যদেরও দূরে রাখা, কুফরী করা) দিয়েছেন।

২য় অংশে (আয়াত ৪-৬) আল্লাহর রসূল (সঃ) এর সাথে মুনাফিকদের আচরন এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতি মুহাম্মাদ (সঃ) এর আচরন কেমন হওয়া উচিত এবং আল্লাহর প্রিয় নবীর প্রতি তাদের এই ব্যবহারের কারনে আল্লাহ নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন (ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহনযোগ্য হবে না)।
৩য় অংশে (৭-৮) আয়াতে আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে আবার বলেছেন ও তাদের চরিত্র (কৃপনতা, অহংকার) ও পরিকল্পনা (মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও তাদের অসম্মান করা) ফাস করে দিয়েছেন।
তাদের ওই পরিকল্পনার বিপরীতে সূরার শেষ অংশে (আয়াত ৯-১১) আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন অর্থ ব্যায়ের ব্যাপারে। মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা নিজেরা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় না করে থামে না বরং অন্যকেও অনুৎসাহিত করে। আল্লাহ এই অংশে ক্লিয়ার করলেন যে, এই ধন-সম্পদের চেয়ে আল্লাহর স্মরন ও তাঁর জন্য তা ব্যয় করা অনেক অনেক বেশি দরকারি। 'ইনফাক' (আল্লাহর পথে ব্যয়) 'নিফাক'কে দূরে রাখতে সহায়তা করে।

আগের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের সূরা (৬২ তম সূরা আল জুমুয়াতে) আল্লাহর গুনে গুণান্বিত হয়ে মুহাম্মাদ (স) এর মিশন বাস্তবায়ন এর রুপরেখা বর্ননা করা হয়েছে। এই মিশন বাস্তবায়ন করার সময় সবচাইতে ক্ষতিকর ও বিপদজনক সম্প্রদায় হলো মুনাফিক। সুতরাং তাদের পরিচয়, কার্যাবলী, পরিকল্পনা ও এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতি মুহাম্মাদ (সঃ) এর আচরন কেমন হওয়া উচিত এবং তাদের প্রতি আল্লাহ নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে মুহাম্মাদ (স) এর মিশন বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এই সূরা (৬৩ তম সূরা আল মুনাফিকুন)।

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

১. যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি নিশ্চয় তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

অর্থাৎ যে কথা তারা মুখে বলেছে তা আসলে সত্য । কিন্তু তারা মুখে যা প্রকাশ করছে নিজেরা যেহেতু তা বিশ্বাস করে না, তাই তাঁর রসূল হওয়ার যে সাক্ষ্য তারা দেয় সে ব্যাপারে তারা মিথ্যাবাদী । এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, দুটি জিনিসের সমন্বয়ের নাম সাক্ষ । এক, যে মূল বিষয়টির সাক্ষ দেয়া হয় সেটি । দুই, সেই বিষয়টি সম্পর্কে সাক্ষদানকারীর বিশ্বাস । এখন বিষয়টি যদি আসলে সত্য হয় এবং সাক্ষ দানকারী মুখে যা বলছে তার বিশ্বাসও যদি তাই হয়, তাহলে সে সবদিক দিয়েই সত্যবাদী হবে । আর বিষয়টি যদি মিথ্যা হয়, কিন্তু সাক্ষদাতা সেটিতে সত্য বলে বিশ্বাস করে তাহলে একদিক দিয়ে আমরা তাকে সত্যবাদী বলবো । কেননা সে তার বিশ্বাসকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সত্যবাদী । কিন্তু আরেক দিক দিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলব । কেননা , সে যে বিষয়ের সাক্ষ দিচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ভুল । অপরদিকে বিষয়টি যদি সত্য হয় কিন্তু সাক্ষদাতার বিশ্বাস তার পরিপন্থী হয় তাহলে সঠিক বিষয়টির সাক্ষ্য দেয়ার কারণে আমরা তাকে সত্যবাদী বলব । কিন্তু সে মুখে যা প্রকাশ করছে তার বিশ্বাস না হওয়ার কারণে আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলব । যেমন কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদি ইসলামকে সত্য বলে তাহলে সে সবদিক দিয়ে সত্যবাদী । কিন্তু একজন ইহুদী যদি ইহুদী ধর্মের ওপর বিশ্বাসী থেকে ইসলামকে সত্য বলে তাহলে তার কথা সত্য কিন্তু তার সাক্ষ মিথ্যা বলে গণ্য করা হবে ।

কেননা, সে তার বিশ্বাসের পরিপন্থী সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর সে যদি ইসলামকে বাতিল বা মিথ্যা বলে তাহলে আমরা তার একথা মিথ্যা বলবো। কিন্তু সে যে সাক্ষ দিচ্ছে তা তার নিজের বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

২. তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, ফলে তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে, নিশ্চয় তা কতই না মন্দ!

অর্থাৎ, তারা যে কসম খেয়ে বলে, তারা তোমাদের মতই মুসলিম এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল। আসলে তারা তাদের এই কসমকে নিজেদের ঢাল বানিয়ে রেখেছে। এর মাধ্যমে তারা তোমাদের হাত থেকে বেঁচে যায় এবং কাফেরদের মত তারা তোমাদের তরবারির আওতায় পড়ে না।

فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ আয়াতাংশের অর্থ "তারা নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকে" যেমন হয়, তেমনি "তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে"ও হয়। তাই অনুবাদে আমরা দুটি অর্থই উল্লেখ করেছি। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতাংশের অর্থ হবে এসব শপথের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নেয়ার পর ঈমানের দাবী পূরণ না করার এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে পাশ কাটিয়ে চলার ব্যাপারে সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়। দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতাংশের অর্থ হবে, এসব মিথ্যা শপথের আড়ালে তারা শিকারের সন্ধানে থাকে, মুসলমান সেজে থেকে ভিতর থেকেই মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। মুসলমানদের গোপনীয় বিষয়সমূহ জেনে নিয়ে তা শত্রুদের জানিয়ে দেয়, ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে এবং সহজ সরল মুসলমানদের মনে সন্দেহ -সংশয় ও দ্বিধা -দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে তারা এমন সব কৌশল অবলম্বন করে যা কেবল মুসলমান সেজে থাকা একজন মুনাফিকের পক্ষেই সম্ভব। ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুরা ঐ সব কৌশল কাজে লাগাতে পারে না।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

৩. এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে; তাই তারা বুঝতে পারছে না।

এ আয়াতে ঈমান আনার অর্থ বুঝানো হয়েছে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে শামিল হওয়াকে আর কুফরের অর্থ বুঝানো হয়েছে আন্তরিকভাবে ঈমান না আনা এবং মৌখিকভাবে ঈমান আনার পূর্বে যে কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাকে। কথাটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, তারা যখন খুব ভালভাবে বুঝে শুনে সোজাসুজি ঈমানের পথ অবলম্বন অথবা পরিষ্কাভাবে কুফরের পথ গ্রহণের পরিবর্তে মুনাফিকীর এই নীতি ও পন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়া হলো এবং একজন সত্যবাদী, নিষ্কলুষ, সৎ ও ভদ্র মানুষের মত নীতি ও পন্থা অবলম্বন করার সামর্থ ও শুভবুদ্ধিই আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিলেন। এখন তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির যোগ্যতাই হারিয়ে গিয়েছে এবং নৈতিক অনুভূতির মৃত্যু ঘটেছে। রাতদিনের এই মিথ্যা প্রতি মুহূর্তের এই প্রতারণা ও

ধোঁকাবাজি এবং কথা এবং কাজের এ স্থায়ী বৈপরীত্য-যার মধ্যে তারা নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে -তা যে কত হীন ও লাঞ্ছনাকর অবস্থা , সে উপলব্ধিটুকু পর্যন্ত এখন তাদের আসে না ।

আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার অর্থ কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি তার একটি । এসব মুনাফিকের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দেয়ার কারণে ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি এবং তারা বাধা হয়ে মুনাফিক রয়ে গিয়েছে -ব্যাপারটি তা নয় । বরং বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও যখন তারা কুফরির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন । এ সময়ই তাদের থেকে নির্ভেজাল ঈমান ও তা থেকে জন্মলাভকারী নৈতিক আচরণ করার সামর্থ ও শুভবুদ্ধি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের জন্য যে মুনাফিকী ও মুনাফিকী চরিত্র পছন্দ করেছিল তার সামর্থ ও বুদ্ধিই তাদের দান করা হয়েছে ।

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

৪. আর আপনি যখন তাদের দিকে তাকান তাদের দেহের আকৃতি আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে এবং তারা যখন কথা বলে, আপনি আগ্রহের সাথে তাদের কথা শুনে থাকেন। তারা দেয়ালে ঠেকান কাঠের খুঁটির মতই, তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন; আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অত্যন্ত সুঠাম দেহী, সুস্থ, সুদর্শন ও বাকপটু ব্যক্তি ছিল । তার সাঙ্গপাঙ্গদের অনেকেও তাই ছিল । এরা সবাই ছিল মাদীনার নেতৃস্থানীয় লোক । তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে যখন আসতো তখন দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসতো এবং রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা বলতো । তাদের দেহাবয়ব ও চেহারা -আকৃতি দেখে আর কথাবার্তা শুনে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, সমাজের এসব সম্মানিত লোকেরা চরিত্রের দিক দিয়ে এত নীচ ও জঘন্য হতে পারে ।

তারা দেয়ালে ঠেকান কাঠের খুঁটির মতই- অর্থাৎ এরা যারা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে তারা মানুষ নয়, বরং কাঠের গুড়ি । তাদেরকে কাষ্ঠখণ্ডের সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়ে ছে যে, নৈতিক চরিত্র মানুষের মূল প্রাণসত্তা, সেই প্রাণসত্তাই তাদের মধ্যে নেই । তারপর তাদেরকে দেয়ালগাত্রে হেলান দিয়ে খাড়া করা কাষ্ঠখন্ডের সাথে তুলনা করে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তা একেবারেই অকেজো , অপদার্থ । কেননা, কাঠ কেবল তখনই উপকারে আসে যদি তা ছাদে অথবা দরজায় বা আসবাব তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয় । দেয়াল গাত্রে হেলান দিয়ে রাখা কাষ্ঠখন্ড কোন উপকারেই আসে না ।

তাদের বাহ্যিক চালচলন ও আচার আচরনণ দেখে প্রতারিত হয়ো না । এ ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকো যে, এরা যে কোন সময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে ।

আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন!- এটা বদদোয়া নয়, বরং তারা যে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং সে গযব যে অবশ্যই নাযিল হবে-এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই ঘোষণা । এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এ বাকাংশটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি এবং আরবী বাকরীতি অনুসারে , অভিশাপ ও তিরস্কার অর্থে ব্যবহার করেছেন । আমাদের নিজস্ব ভাষায় আমরা যেমন বলিঃ ওর সর্বনাশ হোক, কি জঘন্য মানুষ সে । এখানে "সর্বনাশ" শব্দটি দ্বারা তার জঘন্যতার তীব্রতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, বদদোয়া করা নয় ।

তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে!- তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে মুনাফিকীর পথে কে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা বলা হয়নি । একথাটি স্পষ্ট করে না বলার কারণে আপনা থেকেই যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হলো, তাদের এই এলোপাতাড়ি ও অস্বাভাবিক আচরণের চালিকাশক্তি একটি নয়, বরং বহু সংখ্যক চালিকাশক্তি এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে । তাদের পেছনে এই চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে শয়তান, অসৎ বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির আকাংখাসমূহ । কারো স্ত্রী, কারো সন্তান-সন্ততি , কারো নিজ গোত্র ও গোষ্ঠীর অসৎলোকজন তাকে এ পথে চলতে বাধ্য করছে । আবার কাউকে তার হিংসা , বিদ্বেষ ও অহমিকা এ পথে তাড়িত করেছে ।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আস, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, আর আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন, অহংকারবশত ফিরে যেতে।

তারা ইসতিগফারের জন্য রসূলের কাছে আসে না শুধু তাই নয়, বরং এ কথা শুনে অহংকার ও গর্ব মাথা ঝাঁকুনি দেয় । রসূলের কাছে আসা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাকে নিজেদের জন্য অপমানজনক ও মর্যাদাহানিকর মনে করে আপন অবস্থানে অনড় থাকে । তারা যে ঈমানদার নয় এটা তার স্পষ্ট প্রমাণ ।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্‌ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

একথাটি সূরা তাওবাতে (যা সূরা মুনাফিকূনের তিন বছর পর নাযিল হয়) আরো অধিক জোর দিয়ে বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহর তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেনঃ "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না করো, এমনকি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না । কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আল্লাহ ফাসিকদের হিদায়াত দান করেন না । (আত তাওবা, আয়াত ৮০) পরে আরো বলা হয়েছেঃ তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না । এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং কাফেক অবস্থায় মারা গেছে । (আত তাওবা, আয়াত ৮৪) ।

এ আয়াতটিতে দুটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে । এক, মাগফিরাতের জন্য দোয়া শুধু হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের জন্যই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হতে পারে । যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ থেকে সরে গিয়েছে এবং যে ব্যক্তি আনুগত্যের পরিবর্তে গোনাহ ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছে তার জন্য কোন সাধারণ মানুষের দোয়া তো দূরের কথা আল্লাহর রসূল নিজেও যদি তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন তবুও তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে না । দুই, যারা আল্লাহর হিদায়াত পেতে আগ্রহী নয় তাদের হিদায়াত দান করা আল্লাহর নীতি নয় । কোন ব্যক্তি নিজেই যদি আল্লাহর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে বরং তাকে হিদায়াতের দিকে আহবান জানালে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে অহংকার ভরে সে আহবান প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আল্লাহর কি প্রয়োজন পড়েছে যে, তার পিছনে পিছনে নিজের হিদায়াতের ফেরি করে বেড়াবেন এবং তোষামোদে করে তাকে সত্যপথে নিয়ে আসবেন ।

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

৭. তারাই বলে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য করো না, যাতে তারা সরে পড়ে। অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই; কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।

মুহাজির জাহজাহ ইবনে সা'দ আল-গিফারী ও আনসারী সিনান ইবনে ওবরাহর ঝগড়ার সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-ই এ কথা বলেছিল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর পরিচায়ক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ স্থলে "তারা বোঝেনা" বলে বুঝিয়েছেন যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ।

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

৮. তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে আসলে সেখান থেকে শক্তিশালীরা অবশ্যই দুর্বলদেরকে বের করে দেবে। অথচ শক্তি-সম্মান তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।

সম্মান ও আধিপত্য কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। অতঃপর তিনি নিজের পক্ষ হতে যাকে চান সম্মান ও আধিপত্য দান করেন। আর তিনি তো তাঁর রসূলদের এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেন। এ সম্মান তাদেরকে দান করেন না, যারা তাঁর অবাধ্য। এখানে মুনাফিকদের কথা খন্ডন করে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ইজ্জতের মালিক বা অধিকারী কেবলমাত্র মহান আল্লাহ এবং সম্মানিত কেবল সে-ই, যাকে তিনি সম্মান দান করেন। সে নয়, যে নিজেকে সম্মানী মনে করে বা যাকে বিশ্ববাসী সম্মানী মনে করে। আর আল্লাহর নিকট সম্মান লাভ কেবল ঈমানদাররাই করবেন; কাফের ও মুনাফিকরা নয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

৯. হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা খাঁটি মুমিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করছেন যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দুটি সর্ববৃহৎ- ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, কারও মতে হজ ও যাকাত এবং কারও মতে কুরআন। হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত।

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

১০. আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগে। (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ দিতাম ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

১১. আর যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা আমল কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করল, কোন সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেনঃ "যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে- অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়।" তিনি আরও বললেনঃ "আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না। যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বলঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় করা।" [বুখারী: ১৩৫৩, মুসলিম: ১০৩২, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৯৬]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন: যে ব্যক্তির যিম্মায় যাকাত ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ্জ ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে : আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই অর্থাৎ মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ – অর্থাৎ কিছু অবকাশ পেলে এমন সৎ কর্ম করে নেব, যদ্দ্বারা সৎ কর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মাকরুহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

প্রসঙ্গিক আলোচনা

মুনাফিকের পরিচয়

মুনাফিক শব্দটি নফক শব্দ থেকে গঠিত। নফকের অর্থগুলো হলোঃ ১.গর্ত, ২.ছিদ্র, ৩.সুড়ঙ্গ, ৪.বের হওয়া, ৫.খরচ করা, ৬.ব্যয় করা।

৭.কারো মতে, 'নাফেকুল ইয়ারবু' (পাহাড়ি ইঁদুর) থেকে মুনাফিক শব্দটি গঠিত। পাহাড়ি ইঁদুরকে 'নাফেকুল ইয়ারবু' বলা হয়। কারণ পাহাড়ি ইঁদুর অত্যন্ত ধূর্ত হয়, এরা পাহাড়ে অনেক গর্ত খনন করে। এদের মারার জন্য এক গর্তে পানি বা অন্য কিছু দিলে অন্য গর্ত দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে যায়, ফলে এদের সহজে মারা যায় না। মুনাফিকও অনুরূপ ধূর্ত। তাদের সহজে চেনা যায় না।

মুনাফিকের চরিত্র :

আল্লাহ সুরা বাকারার ৮ থেকে ২০ পর্যন্ত মোট **১৩**টি আয়াত মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে নাজিল করেছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সুরায় আরো অনেক আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করেছেন। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো-

১. মিথ্যা বলাঃ সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মুনাফিকের আলামত তিনটি, তন্মধ্যে একটি হল সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে।"

"যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন তারা বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যই আল্লাহর রাসূল।" হ্যাঁ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জানেন যে আপনি সত্যই তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা সত্যই মিথ্যাবাদী।" (আল মুনাফিকুন: ১)

২. বিশ্বাসঘাতকঃ আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না। (সূরা হাশর ১১-১২)।

৪. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মুনাফিকের তিনটি আলামত; যখন সে কথা বলে সে মিথ্যা বলে, যখন সে প্রতিশ্রুতি দেয় সে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং যখন তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন সে আত্মসাৎ করে।" (হাদিস বুখারি ও মুসলিম)।

৫. ইবাদত পালনে অলসতাঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, "...বস্তুতঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।" **(আন নিসাঃ** ১৪২)

মুনাফিক যদি মসজিদে বা মুসুল্লায় যায়, তাহলে সে তার পা টেনে টেনে নিয়ে যাবে যেন শিকল দিয়ে বাঁধা। এ কারণে, যখন সে মসজিদে বা মুসুল্লায় পৌঁছায়, তখন সে শেষ সফ (সারি) তে বসতে পছন্দ করে। সালাতে ইমাম কী পাঠ করেন তা সে জানে না বা খেয়াল থাকে না।

৬. রিয়াঃ অন্যদের উপস্থিতিতে মুনাফিক খুশুতে নামায পড়েন, কিন্তু যখন তিনি একা থাকেন, তিনি তার সালাত শেষ করার জন্য তাড়াহুড়া করেন। যখন মাজেলিসে অন্যদের সাথে থাকে, তখন তার ভালো আখলাক ও জুহদ দেখা যায়। একইভাবে তার বক্তৃতা, কথাবার্তা হয় খুব মৃদু। যখন একা থাকে তখন সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকে। "...বস্তুতঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন্য।..." (আন নিসাঃ ১৪২)

৭. আজ্ঞাবহ এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের নিন্দা করাঃ তারা জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ লোকেদের উপহাস করে, তুচ্ছ মন্তব্য এবং নিন্দা করে। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করার জন্য মুমিন ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত কাজগুলোকে ছোট করে।
সে সমস্ত লোক যারা ভৎর্সনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্দ বস্তু ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (সূরা তাওবাহ ৭৯)

৮. আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে নিয়ে ঠাট্টা করাঃ আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?
ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার। (সূরা তাওবাহ ৬৫-৬৬)

৯. দুমুখো স্বভাবের : তারা দুমুখো আচরণ করে। বাহ্যিকভাবে নিজেদের মুমিন বলে পরিচয় দেয় অথচ তাদের ভেতরে ঈমান নেই। মুনাফিক শুধু মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দান করে, কিন্তু অন্তরে মোটেও বিশ্বাস লালন করে না। "আর মানুষের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনেছি, অথচ তারা মুমিন নয়।"(সুরা বাকারা,আয়াত : ৮)

১০. প্রতারক ও ধোঁকাবাজ : তারা খুবই ধূর্ত প্রতারক ও ধোঁকাবাজ। আল্লাহ ও মুমিনদের সঙ্গে তারা প্রতারণা করে। তারা মনে করছে, এতে তারা সফলকাম ও বিজয়ী হচ্ছে, অথচ প্রকারান্তরে তারাই প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হচ্ছে। সত্য পথ থেকে দূরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। "আল্লাহ ও ঈমানদারদের তারা ধোঁকা দিতে চায়, আসলে তারা অন্য কাউকে ধোঁকা দিচ্ছে না, বরং নিজেদেরই প্রতারিত করছে, অথচ তাদের সে অনুভূতি নেই।"(সুরা : বাকারা, আয়াত : ৯)

১১. তাদের অন্তর অসুস্থঃ সুস্থতার সীমা থেকে বের হয়ে গেলেই অসুস্থতা বলা হয়। মুনাফিকদের বিশ্বাসে সন্দেহ, অস্বীকৃতি ও মিথ্যা থাকার কারণে তাদের কলবকে অসুস্থ কলব বলা হয়। অসুস্থতা হলো সুস্থতার বিপরীত।

দ্বিমুখী আচরণ একটি কঠিন ব্যাধি। আর খাঁটি বিশ্বাস হলো সুস্থতা। ঈমান আনার পর যারা দ্বিমুখী আচরণ করে, তারা মূলত অসুস্থ। "তাদের হৃদয়ে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ সে ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের মিথ্যাচারের দরুন তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"(সুরা : আল বাকারা, আয়াত : ১০)

১২.নিজেদের শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী মনে করেঃ মুনাফিকরা সমাজে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে, অথচ তারা প্রচার-প্রপাগান্ডায় নিজেদের শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বলে পরিচয় দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর যখনই তাদের বলা হয়, পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি কোরো না, তারা উত্তরে বলে—"আমরাই তো সংশোধনকারী ও শান্তিকামী।"(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১১)

১৩. ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীঃ ইসলাম শান্তির জীবন ব্যবস্থা। মুনাফিকরা ইসলাম ও সামাজিক শান্তির বিরোধিতা করে অশান্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে অনুভব করতে পারছে না। "সাবধান! এরাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাদের সে অনুভূতি নেই।" (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২)

১৪. মুমিনদের নির্বোধ মনে করেঃ মুনাফিকরা নিজেদের বুদ্ধিমান, ধূর্ত, চতুর ও চালাক মনে করে। আর মুমিন, মুত্তাকি ও নেককারদের নির্বোধ ও বোকা বলে মনে করে। অথচ আল্লাহর কাছে তারাই বোকা ও নির্বোধ।
"যখন তাদের বলা হয়, অন্য লোকদের ন্যায় তোমরাও ঈমান আনো, তখন তারা বলে, আমরা কি সেই নির্বোধ লোকদের মতো ঈমান আনব? আসলে তারাই তো নির্বোধ, কিন্তু তাদের সে জ্ঞান নেই।"(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৩)

১৫. বাধ্যতার বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়ঃ মুনাফিকদের তাদের ভ্রষ্টতার জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে শাস্তি না দেওয়ায় এবং দুর্নীতিপরায়ণ হয়েও পার্থিব জগতে সুখ-শান্তিতে কালাতিপাত করার সুযোগদানের ফলে তাদের ভ্রষ্টতা আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করে। "বস্তুত তাদের আচরণের কারণে আল্লাহই তাদের সঙ্গে তামাশার ব্যবস্থা করছেন এবং তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদের কে বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দিচ্ছেন।" (সুরা বাকারা-১৬)
"আমি শাস্তি না দিয়ে সুযোগ দিই পাপ বৃদ্ধির জন্য।" (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৮)

১৬. ভ্রষ্টতা ক্রয় করেঃ মুনাফিকরা দুনিয়ার লালসায় হেদায়েতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করে। তারা হেদায়েতের ওপর ভ্রষ্টতাকে অগ্রাধিকার দেয়। মানুষ যে জিনিসকে ভালোবাসে ও পছন্দ করে, সে জিনিসই ক্রয় করে। মুনাফিকরা ঈমান বিক্রি করে নিফাককে ক্রয় করে—অর্থাৎ ঈমানের ওপর নিফাককে প্রাধান্য দেয়। "তারা এমন লোক, যারা হেদায়েতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকে ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি; আর তারা হেদায়েতও পায়নি।" (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৬)
তারা বোঝে না যে দুনিয়ার ক্ষণিকের লাভের জন্য আখিরাতকে বিসর্জন দেওয়া ঠিক হবে না।

১৭.তারা আলোর কাছে আসে নাঃ আল্লাহর রাসুল দ্বীনের আলো তথা কুরআন নিয়ে এসেছেন এবং সর্বত্র দ্বীনের আলো প্রজ্বলিত করেছেন। কিন্তু মুনাফিকরা সে আলো থেকে উপকৃত হতে পারেনি। "তাদের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালিয়েছে; কিন্তু যখন তা তার চারপাশ আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তাদের

আলো অপসারিত করে তাদের ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিয়েছেন, যাতে তারা কিছুই দেখতে পায় না।"(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৭)

১৮.তারা বধির, মূক ও অন্ধ : মুনাফিকরা হক কথা শোনার ব্যাপারে বধির, তারা হক কথা শোনে না, সত্য কথা বলার ব্যাপারে মূক ও বোবা এবং সত্য কথা বলে না। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার ব্যাপারে অন্ধ। আল্লাহ সুবিধাভোগীদের অবস্থা বর্ণনা করেন বলেন ; "তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। তারা (হকের দিকে) আদৌ ফিরে আসবে না।" (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮)

১৯. তারা সন্দেহপ্রবণ, দ্বিধাগ্রস্ত ও সুবিধাবাদীঃ মুনাফিকরা সুবিধা ভোগের জন্য ইসলামে দাখিল হয়; কিন্তু ইসলামের বিধিবিধান পালন ও ইসলামের আনুগত্যের কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নয়। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "(তাদের উদাহরণ হলো) বর্ষণমুখর ঘন মেঘের মতো, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক; বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়; আল্লাহ এসব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী লোকদের সর্বদিক দিয়ে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।
অর্থাৎ তারা আল্লাহর আয়ত্তের ভেতরে আছে, তিনি তাদের সম্পর্কে জানেন।" (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৯)

২০.আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারীঃ মুনাফিকরা মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আসতে দেয় না। তারা নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন; "তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।" (মুনাফিকুন, আয়াত : ২)

২১.অহংকারীঃ মুনাফিকরা অহংকারী ও দাম্ভিক। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আপনি তাদের দেখবেন যে তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (সুরা : মুনাফিকুন, আয়াত : ৬)

২২.মুনাফিকগণ আল্লাহর পথে খরচ করতে বাধা দেয়ঃ ওরাই তো তারা যারা বলে ''আল্লাহর রসূলের সঙ্গে যারা রয়েছে তাদের জন্য খরচ করোনা যে পর্যন্ত না তারা সরে পড়ে।'' আর মহাকাশমন্ডলের ও পৃথিবীর ধনভান্ডার তো আল্লাহর ই, কিন্তু মুনাফিকগোষ্ঠী বোঝে না"। (৬৩: ৭)

২৩. তারা সব সময় অন্যায় কাজের আদেশ দেয়ঃ "মুনাফিক পুরুষরা ও মুনাফিক নারীরা — তাদের কতকজন অপর কতকজনের মধ্যেকার। তারা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় আর সৎকাজে নিষেধ করে, আর তারা নিজেদের হাত গুটিয়ে নেয়। তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহ মুনাফিকরা নিজেরাই দুষ্কৃতিকারী"। (৯: ৬৭)

মুনফিকদের পরিণাম

১. মুনাফিকগণ জাহান্নামীঃ"তারা ব্যতীত যারা তওবা করে ও শোধরায়, আর আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, আর তাদের ধর্মকে আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করে, — তারা তবে মুমিনদের সাথে, আর শীঘ্রই আল্লাহ্ মুমিনদের দিচ্ছেন এক বিরাট পুরস্কার"। (৪: ১৪৫)
"হে নবী! অবিশ্বাসীদের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, আর তাদের প্রতি কঠোর হও। আর তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর মন্দ সেই গন্তব্যস্থান"। (৯: ৭৩)

অর্থঃ"যেন আল্লাহ্ পুরস্কৃত করতে পারেন সত্যপরায়ণদের তাদের সত্যনিষ্ঠার জন্যে, আর তিনি ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদের প্রতি ফিরতেও পারেন। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ পরিত্রাণকারী, অফুরন্ত ফলদাতা"। (৩৩: ২৪)
"মুনাফিক পুরুষদের ও মুনাফিক নারীদের ও অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন জাহান্নামের আগুন, তাতে তারা অবস্থান করবে। তাই তাদের জন্য পর্যাপ্ত, আর আল্লাহ্ তাদের ধিক্কার দিয়েছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত শাস্তি"। (৯: ৬৮)

২. তাদের জন্য কোন সন্মান নেইঃ "তারা বলে — ''আমরা যদি মদীনায় ফিরে যাই তাহলে প্রবলরা দুর্বলদের সেখান থেকে অবশ্যই বের করে দেবে।'' কিন্ত ক্ষমতা তো আল্লাহরই আর তাঁর রসূলের আর মুমিনদের, কিন্ত মুনাফিকরা জানে না"। (৬৩: ৮)

৩. তাদের প্রতি আল্লাহর গজবঃ "আর যেন তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক পুরুষদের ও মুনাফিক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষদের ও মুশরিক নারীদের — যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ধারণ করে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে দুস্কর্ম ঘুরে আসবে, আর আল্লাহ্ তাদের উপরে রাগ করেছেন এবং তাদের ধিক্কার দিয়েছেন, আর তাদের জন্য তিনি জাহান্নাম তৈরি করেছেন। আর কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল? (৪৮: ৬)

৪. আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন নাঃ তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেননা। (সূরা মুনাফিকুন ৬)

মুনফিকদের ব্যাপারে মুমিনদের করনীয়

১.মুনাফিকদের অনুগত করা, অনুস্মরণ করা যাবেনাঃ অর্থঃ"আর তুমি অবিশ্বাসীদের ও মুনাফিকদের আজ্ঞাপালন করো না, আর ওদের বিরক্তিকর ব্যবহার উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর উপরে তুমি নির্ভর করো। আর আল্লাহই কর্ণধাররূপে যথেষ্ট"। (৩৩: ৪)।
হে নবী! আল্লাহ্কে ভয়-ভক্তি করো আর অবিশ্বাসীদের ও মুনাফিকদের আজ্ঞাপালন করো না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা, পরমজ্ঞানী"। (৩৩: ১)

২. তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করা যাবেনাঃ তারা চায় যে তোমরা যেন অবিশ্বাস পোষণ করো যেমন তারা অবিশ্বাস করে, যাতে তোমরা সবাই এক রকমের হতে পারো। কাজেই তাদের মধ্যে থেকে কাউকে বন্ধু হিসেবে নিও না যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে গৃহত্যাগ করে। কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় তবে তাদের ধরো আর তাদের বধ করো যেখানেই তাদের পাও, আর তাদের থেকে কাউকেও বন্ধুরূপে নিও না এবং সাহায্যকারীরূপেও নয়", — (৪: ৮৮)

৩. তাদেরকে উপেক্ষা করে চলাঃ আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ কার্যনিবার্হীরূপে যথেষ্ট। (সূরা আহযাব ৪৮)

৪. তাদের বিরুদ্ধে সাহসী হওয়াঃ মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক; আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। (সূরা তাওবাহ ৬৪)

৫. তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়াঃ হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা। (সূরা তাওবাহ ৭৩)

মুনাফিকদের আরো অসংখ্য বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি কুরআনে বর্ণিত আছে। আল্লাহ আমাদের এসব থেকে হেফাজত করুক।

ফুটনোট

সূরা মুনফিকুন-এ মুনাফিকদের যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো-

- তারা মিথ্যাবাদী
- শপথকে ঢাল বানায় অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করে
- তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে
- তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে
- তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে
- তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে
- অহংকারী
- তারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না
- তারা হেদায়তের আলো পাবে না, ক্ষমা পাবে না
- তারা নিজেকে সম্মানী মনে করে
- তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণের ব্যাপারে উদাসীন

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে মুমিনদের কিছু বিষয়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন সতর্ক করে দিয়েছেন এ সূরায়-

- ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে
- আল্লাহ্‌ যে রিযক দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করা
- মৃত্যু আসার পূর্বে; সাদাকাহ করা এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া
- নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কেহকেও অবকাশ দিবেননা।

একটি সুযোগের আবদার !!!

মানুষ নিফাকী কাজে ব্যস্ত এবং আল্লাহ এই সর্তকবার্তার বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু একটা সময় আসবে মানুষ বুঝতে পারবে তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। তখন সে চাইবে-“ হে আমার রাব্ব! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।” কিন্তু সেই সুযোগ দেওয়া হবে না।

এখানে আলোচিত মুনফিকদের বৈশিষ্টের মধ্যে অনেকগুলো হয়তো বা আমাদের মাঝে রয়েছে। তাই আসুন, মালাকুল মওউত আসার আগেই নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হিসাবে গড়ে তুলি, সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাই।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৪

সূরা যুমার ১-৯

সূরা আয্-যুমার কুরআনের ৩৯তম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর আয়াত সংখ্যা ৭৫ টি। অন্যান্য কয়েকটি মক্কী সূরার ন্যায় এরও বিষয়বস্তু আল্লাহপাক ও মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান। আল্লাহর একত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠতা এবং তার প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব ও ব্যতিক্রমের পরিণিতি এই সূরায় ব্যাখ্যায়িত। যুমার শব্দের অর্থ দল-বদ্ধ জনতা। দল শব্দটি দিয়ে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী - মানুষের এই দুটি দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নামকরণ

আয়াত নম্বর ৭১ ও ৭৩ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا এবং وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ এটি সে সূরা যার মধ্যে ‘যুমার ‘শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিলের হওয়ার সময় কাল

এ সূরা যে হাবশায় হিজরত করার পূর্বে নাযিল হয়েছিল, সে ব্যাপারে ১০ নম্বর আয়াত থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব ও তার সংগী সাথীগণ হাবশায় হিজরতের সংকল্প করলে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

হাবশায় হিজরতের কিছু পূর্বে মক্কার পরিবেশ ছিল জুলুম - নির্যাতন এবং শত্রুতা ও বিরোধিতায় ভরা। ঠিক এ পরিবেশে এ গোটা সূরাটিকে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতারূপে পেশ করা হয়েছে। এটা একটা নসীহত। এতে মাঝে মধ্যে ঈমানদারদের সম্বোধন করা হলেও বেশীরভাগ কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, মানুষ যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করে এবং তার আল্লাহপ্রীতিকে অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য দ্বারা কলুষিত না করে। এ মৌলিক নীতিকে বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে অত্যন্ত জোরালো পন্থায় তাওহীদের সত্যতা এবং তা মেনে চলার উত্তম ফলাফল আর শিরকের ভ্রান্তি ও তা আঁকড়ে ধরে থাকার মন্দ ফলাফল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে । তাছাড়া মানুষকে ভ্রান্ত আচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। এ প্রসংগে ঈমানদারদেরকে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর দাসত্বের জন্য একটি জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাঁর এ পৃথিবী অনেক প্রশস্ত। নিজের দীনকে রক্ষা করার জন্য অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের ধৈর্যের পুরস্কার দান করবেন । অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন একদিন না একদিন তোমাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, এমন দুরাশা কাফেরদের মন থেকে দূর করে দাও এবং পরিস্কারভাবে বলে দাও যে, আমার পথ রোধ করার জন্য তোমরা যা কিছু করতে চাও করো, আমি আমার কাজ চালিয়েই যেতে থাকবো।

পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার অধিকাংশ বিষয় প্রিয়নবী রাসূল সা: এর রেসালাত সম্পর্কিত ছিল। আর এ সূরার অধিকাংশ বক্তব্য তাওহীদ সম্পর্কিত। যারা তাওহীদে বিশ্বাস করে। তাদের জন্য পুরস্কার এবং যারা অবিশ্বাস করে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মানবতার কলঙ্ক শিরক বা অংশীবাদের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরার প্রথম আয়াতেও পবিত্র কুরআন আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার যোগসূত্র রয়েছে।

সূরার ফজিলত

আয়িশাহ্ [রাদি.] হইতে বর্ণীতঃ সূরা বানী ইসরাঈল ও সূরা আয্-যুমার তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত নাবী [সাঃ] ঘুমাতেন না। সহীহঃ সহীহাহ্ [৬৪১]।

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

১. এ কিতাব পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হওয়া।

এটা এ সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা । এতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথা নয় যা অস্বীকারকারীরা বলছে। বরং এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী। তিনি নিজে এ বাণী নাযিল করেছেন। এর সাথে আল্লাহর দু'টি গুণ উল্লেখ করে শ্রোতাদেরকে দু'টি মহাসত্য সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে যাতে তারা এ বাণীকে মামুলি জিনিস মনে না করে, বরং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। বর্ণিত গুণের একটি হচ্ছে, যে আল্লাহ এ বানী নাযিল করেছেন তিনি "আযীয" অর্থাৎ এমন মহা পরাক্রমশালী যে কোন শক্তিই তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তাবলী কার্যকরী হওয়া ঠেকাতে পারে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে সামন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এমন কোন শক্তিও নেই। আরেকটি গুণ হচ্ছে, তিনি 'হাকীম'অর্থাৎ এ কিতাবে তিনি যে হিদায়ত দিচ্ছেন তা আগাগোড়া বিজ্ঞোচিত। কেবল কোন অজ্ঞ ও মূর্খই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে।

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

২. নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে এ কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। কাজেই আল্লাহর ইবাদাত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। এতে তাওহীদ ও রিসালাত, পরকাল এবং যে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য। তা যথাযথভাবে বিশ্বাস, গ্রহণ ও পালন করার মাঝেই রয়েছে মানুষের কল্যাণ। সুতরাং তুমি নিজে আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে যাও। আর সারা দুনিয়াবাসীকে তুমি এদিকেই আহ্বান কর। কেননা, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই। তিনি অংশীবিহীন ও অতুলনীয়।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত । এর মৌলিক বিষয় দু'টি । এ দু'টি বিষয় বুঝে নেয়া ছাড়া আয়াতটির অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। একটি বিষয় হচ্ছে, এখানে আল্লাহ ইবাদাত করতে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সে ইবাদাত হবে এমন যা আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে করা হয়।

ইবাদাত শব্দের শব্দমূল বা ধাতু হচ্ছে عبد । এ শব্দটি আরবী ভাষায় ‘স্বাধীন’শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে ‘দাস’বা ‘ক্রীতদাস’বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে ‘ইবাদাত’শব্দের মধ্যে দু’টি অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছে পূজা-অর্চনা। আরবী ভাষার বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য অভিধান ‘লিসানুল আরবে’আছে عبد الله অর্থাৎ التنسك, والتعبد, تأله له । আরেকটি অর্থ হচ্ছে সবিনয় আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি ও সাগ্রহ আদেশ পালন। অভিধানের এসব নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা অনুসারে আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থ শুধু তাঁর পূজা - অর্চনার দাবী করাই নয়, বরং বিনা বাক্যে তাঁর আদেশ নিষেধ পালন, তাঁর শরয়ী আইন- কানুন সন্তুষ্ট চিত্তে সাগ্রহে মেনে চলা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মনে প্রাণে অনুসরণ করার দাবীও বুঝায়।

আরবী ভাষায় دين (দ্বীন) শব্দ কতিপয় অর্থ ধারণ করেঃ

একটি অর্থ হচ্ছে, আধিপত্য ও ক্ষমতা, মালিকানা ও প্রভুত্বমূলক মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও সার্বভৌম ক্ষমতা এবং অন্যদের ওপর সিদ্ধান্ত কার্যকারী করা ।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আনুগত্য, আদেশ পালন ও দাসত্ব।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে অভ্যাস ও পন্থা -পদ্ধতি মানুষ যা অনুসরণ করে।

এ তিনটি অর্থের প্রতি খেয়াল এ আয়াতে 'দীন’শব্দটি এমন কর্মপদ্ধতি ও আচরণকে বুঝায় যা মানুষ কারো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং কারো আনুগত্য গ্রহণ করার মাধ্যমে অবলম্বন করে । আর "দীন" কে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর দাসত্ব করার অর্থ হলো "আল্লাহর দাসত্বের সাথে মানুষ আর কাউকে শামিল করবে না বরং শুধু তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁরই অনুসরণ এবং তারই হুকুম আহকাম ও আদেশ পালন করবে । "

إخلاصএর অর্থ হল, বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক আমল করা। এই আয়াতটি নিয়ত ওয়াজেব ও তাতে ইখলাস থাকা জরুরী হওয়ার একটি দলীল। হাদীসেও খালেস নিয়তের গুরুত্ব (إنما الأعمال بالنيات) ‘আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল’শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে নেক আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে (তবে শর্ত হল যে তা সুন্নত মোতাবেক হতে হবে)। পক্ষান্তরে যে আমলে অন্য কোন উদ্দেশ্য মিলিত হবে, তা অগ্রহণযোগ্য হবে।

কুরআন বিভিন্ন জাগায় ইবাদত বা আল্লাহর ডাকার কথা যখনই বলা হয়েছে তখনই উল্লেখ করা হয়েছে এখলাসের কথা বা একনিষ্ঠভাবে ডাকার কথা। আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদাত খাঁটিভাবে তারই জন্য হয়; এতে যেন অন্য কারো অংশীদারিত্ব না থাকে; এমন কি গোপন শির্ক অর্থাৎ লোক দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই। এতে বোঝা গেল যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকেই শরীআতের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। এবং আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো মুখলিস শব্দ ব্যবহারের সময়

অনেকাংশে (أُمِرْتُ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকার, তাঁর ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে। সূরা আ'রাফ ২৯ নং আয়াত, সূরা মু'মিন ৬৫, সূরা আয-যুমার : ১১।

মুখলিস বা একনিষ্ঠ কিভাবে হতে হবে সেটা উদাহরণের সাহায্যে কুরআন বিভিন্ন জায়গা উল্লেখ করা হয়েছে- মনে করুন, নৌকা ভ্রমণে সময় বা সাগরে মাঝে প্রবল ঝড়ের কবলে আপনি পড়লেন। আপনি বুঝতে পারলেন আপনি আবরুদ্ধ হয়ে গেছেন। ঠিক সেই মহুর্তে আল্লাহকে আপনি কতটুক আন্তরিকতা নিয়ে ডাকবেন? কতটুক নিষ্ঠার সাথে বাঁচার আকুতি জানাবেন? হ্যাঁ, ঠিক সেইভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আকুতি নিয়ে আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাকার কথা বলা হয়েছে। কুরআনে উল্লেখ আছে- “তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহন কর এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা আল্লাহ্‌কে তার জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ডেকে বলেঃ আপনি আমাদেরকে এ থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।” (সূরা ইউনুস ২২) একই ভাবে আরো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সূরা আনকাবুত ৬৫, সূরা লুকমান ৩২।

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

৩. জেনে রাখুন, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে সে ব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ

এটা একটা বাস্তবসম্মত ও সত্য ব্যাপার। এটা সেই খালেস ইবাদতের তাকীদ যার আদেশ পূর্বের আয়াতে দেওয়া হয়েছে, আর তা হল ইবাদত ও আনুগত্য একমাত্র এক আল্লাহর জন্যই শোভনীয়, তাঁর ইবাদতে কাউকে অংশীদার করা যাবে না এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্যও নয়। তবে রসূল (সাঃ)-এরও আনুগত্য করতে হবে, কারণ রাসূলের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য; অন্য কারোর নয়। এ কথা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো একনিষ্ঠ ও অবিমিশ্র দাসত্ব করে তাহলে সে ভ্রান্ত কাজ করে। অনুরূপভাবে সে যদি আল্লাহর দাসত্বের সাথে সাথে অন্য কারো দাসত্বের সংমিশ্রণ ঘটায় তাহলে সেটাও সরাসরি ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করল। ইয়া রসূলুল্লাহ্,(সা) আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ্ তা' আলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ্ তা' আলা এমন কোন বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়। অতপর তিনি প্রমাণস্বরূপ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। —(কুরতুবী)

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহর নিকট আমল গৃহীত হয়ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর কাছে আমলের হিসাব গণনা দ্বারা নয়–ওজন দ্বারা হয়ে থাকে।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

মক্কার কাফের-মুশরিকরা অনুরূপ দুনিয়ার সব মুশরিকও একথাই বলে থাকে যে, আমরা স্রষ্টা মনে করে অন্যসব সত্তার ইবাদাত করি না। আমরা তো আল্লাহকেই প্রকৃত স্রষ্টা বলে মানি এবং সত্যিকার উপাস্য তাকেই মনে করি। যেহেতু তাঁর দরবার অনেক উঁচু। আমরা সেখানে কি করে পৌঁছতে পারি? তাই এসব বুজুর্গ সত্তাদেরকে আমরা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি যাতে তারা আমাদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেন। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোন বুদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-চৈতন্য, ও শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল।

রাজ দরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানী, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমতঃ এসব মূর্তি-বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহর দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন।

সুতরাং তারা একদিকে আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, অপরদিকে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করছে। তারা আল্লাহকে অত্যাচারী জালেম বাদশাদের মত মনে করছে, অথচ, আল্লাহ সবার ডাকেই সাড়া দেন। তাঁর কাছে কারও অভাব গোপন নাই যে তাকে মাধ্যম ধরে জানাতে হবে। তাছাড়া তারা এ সমস্ত উপাস্যদের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

একথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কেবল তাওহীদের ব্যাপারেই ঐকমত্য হওয়া সম্ভব । শিরকের ব্যাপারে কোন প্রকার ঐকমত্য হতে পারে না। কোন কোন সত্তা আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যমে সে ব্যাপারে দুনিয়ার মুশরিকরা কখনো একমত হতে পারেনি। কারো কাছে কোন দেবতা বা দেবীরা এর মাধ্যমে । কিন্তু তাদের মধ্যেও সব দেবতা ও দেবী সম্পর্কে ঐকমত্য নেই। কারো কাছে চাঁদ, সূর্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি এর মাধ্যম। কিন্তু তাদের মধ্যে কার কি মর্যাদা এবং কে আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যমে সে ব্যাপারে তারাও পরস্পর একমত নয়। কারো

মতে মৃত মহাপুরুষগণ এর মাধ্যম। কিন্তু এদের মধ্যেও অসংখ্য ভিন্নমত বিদ্যমান। কেউ একজন মহাপুরুষকে মানলে আরেকজন অপর একজনকে মানছে। এর কারণ হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন এসব মহাপুরুষ সম্পর্কে তাদের এর ধারণা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন কোন তালিকাও আসেনি যাতে বলা হয়েছে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত । সুতরাং আমাকে পেতে হলে তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো। এটা বরং এমন এক আকীদা - যা কেবল কুসংস্কার ও অন্ধভক্তি এবং পুরনো দিনের লোকদেরকে অযৌক্তিক এবং অন্ধ অনুসরণের কারণে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। তাই ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

আল্লাহ এখানে সেসব লোকের জন্য দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটি كاذب (মিথ্যাবাদী) এবং অপরটি كَفَّارٌ (অস্বীকারকারী) । তাদেরকে 'কাযযাব'বলা হয়েছে এ জন্য যে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা এ আকীদা বানিয়ে নিয়েছে এবং অন্যদের মধ্যে এ মিথ্যাই প্রচার করছে। আর 'কাফফার ‘শব্দের দু'টি অর্থ। একটি, ন্যায় ও সত্যের চরম অস্বীকারকারী । অর্থাৎ তাওহীদের শিক্ষা সামনে আসার পর এরা এ ভ্রান্ত আকীদা আঁকড়ে ধরে আছে। আরেকটি, নিয়ামতের অস্বীকারকারী । অর্থাৎ এরা নিয়ামত লাভ করছে আল্লাহর কাছ থেকে আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে সেসব সত্তার যাদের সম্পর্কে তারা নিজের থেকেই ধরে নিয়েছে যে, তাদের হস্তক্ষেপের কারণেই তারা এসব নিয়ামত লাভ করছে।

لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

৪. আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ, এক, প্রবল প্রতাপশালী।

আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা তার সন্তান সাব্যস্ত করে, যেমন মক্কার মুশরিকরা বলতো যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, ইয়াহূদীরা বলতো, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলতো যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এ আকীদা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি সন্তান মনোনীত করতেন। অর্থাৎ তারা যা ধারণা করছে, বিষয়টি তার বিপরীত হতো। এখানে শর্ত ঘটনার জন্যেও নয় এবং সম্ভাবনার জন্যেও নয়। বরং এটা সম্ভবই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হবে। এখানে উদ্দেশ্য হলো শুধু ঐ লোকদের অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ অর্থাৎ যদি আমি এই নিকৃষ্ট বিষয়ের (সন্তান গ্রহণের) ইচ্ছা করতাম তবে অবশ্যই আমার নিকটবর্তীদের (মধ্য) হতেই গ্রহণ করতাম, যদি আমাকে (সন্তান গ্রহণ) করতেই হতো।”(২১:১৭) আর এক আয়াতে রয়েছেঃ বল- দয়াময়ের কোন সন্তান থাকলে আমিই তার সর্বপ্রথম ‘ইবাদাতকারী হতাম।”(৪৩:৮১)

সুতরাং এসব আয়াতে শর্ত ঘটে যাওয়াকে অসম্ভব বলা হয়েছে। এটা ঘটা বা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বুঝাবার জন্যে বলা হয়নি। ভাবার্থ এই যে, এটাও হতে পারে না এবং ওটাও হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

এসব যুক্তি প্রমাণ দিয়েই সন্তান হওয়ার আকীদা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

প্রথম প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সব রকমের ত্রুটি দোষ এবং দুর্বলতা থেকে পবিত্র। একথা সুস্পষ্ট যে, সন্তানের প্রয়োজন হয় অকর্মন্য ও দুর্বলের । যে ব্যক্তি নশ্বর ও ধবংসশীল সেই সন্তান লাভের মুখাপেক্ষী হয় যাতে তার বংশ ও প্রজন্ম টিকে থাকে। আর কাউকে পালক পুত্রও কেবল সে ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে হয়তো উত্তরাধিকারীহীন হওয়ার কারণে কাউকে উত্তরাধিকারী বানানোর প্রয়োজন অনুভব করে। নয়তো ভালবাসার আবেগে তাড়িত হয়ে কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে। এসব মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর ওপর আরোপ করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে ধর্মীয় আকীদা - বিশ্বাস রচনা করে নেয়া মূর্খতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি ছাড়া আর কি ?

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি এক অদ্বিতীয় এবং একক সত্তার অধিকারী, কোন বস্তু বা দ্রব্যের কিংবা কোন পুরুষের অংশ নন। আর এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, সন্তান সমগোত্রীয় হয়ে থাকে । আর দাম্পত্য জীবন ছাড়া সন্তানের কল্পনাই করা যায় না। আর দাম্পত্য সম্পর্কও কেবল সমগোত্রীয়ের সাথেই হতে পারে। সুতরাং একক ও অদ্বিতীয় সত্তা আল্লাহ সন্তান থাকার কথা যে ব্যক্তি বলে সে চরম মূর্খ ও নির্বোধ।

তৃতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি বা অপরাজেয় এক মহাশক্তি। অর্থাৎ পৃথিবীতে সব জিনিসই তাঁর অজেয় আধিপত্যের অধীন। এ বিশ্ব - জাহানের কোন কিছুই কোন পর্যায়েই তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাই কোন জিনিস সম্পর্কেই এ ধরাণা করা যেতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে তার কোন আত্মীয়তার বন্ধন আছে।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

৫. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

সূরা আনকাবুত ৪৪, সূরা ইব্রাহীম ১৯, সূরা নাহল ৩ এই আয়াতগুলোতেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে- তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন।

অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মিথ্যার ওপর নয়। পরিষ্কার মন-মানসিকতা নিয়ে যে ব্যক্তিই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তার কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ পৃথিবী ও আকাশ ধারণা কল্পনার ওপর নয় বরং প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু বুঝবে ও উপলব্ধি করবে এবং নিজের ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে যে দর্শনই তৈরি করবে তা যে এখানে যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যাবে, তার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে তো একমাত্র এমন জিনিসই সফলকাম হতে এবং স্থিরতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, যা হয় প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল । বাস্তব ঘটনা বিরোধী ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এক আল্লাহ হচ্ছেন এর স্রষ্টা, এক আল্লাহই এর মালিক ও পরিচালক। এ বাস্তব বিষয়টির বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তি এ ধারণা

নিয়ে কাজ করতে থাকে যে, এ দুনিয়ার কোন আল্লাহ নেই অথবা এ ধারণা করে চলতে থাকে যে, এর বহু খোদা আছে, যারা মানত ও নজরানার জিনিস খেয়ে নিজেদের ভক্ত-অনুরক্তদের এখানে সবকিছু করার স্বাধীনতা এবং নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে দেয়, তাহলে তার এ ধারণার কারণে প্রকৃত সত্যের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটবে না বরং সে নিজেই যে কোন সময় একটি বিরাট আঘাতের সম্মুখীন হবে।

অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নবী যে শিরক পরিহার করার এবং তাওহীদ বিশ্বাসী হবার দাওয়াত দেন, পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র সৃষ্টি কারখানাই তার সাক্ষ দিয়ে চলছে । এ কারখানা কোন কাল্পনিক গোলক ধাঁধাঁ নয় বরং একটি পুরোপুরি বাস্তব সত্য ব্যবস্থা । এর যেদিকে ইচ্ছা তাকিয়ে দেখো কোথাও থেকে শিরকের সাক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে না । আল্লাহ ছাড়া অন্য করোর সার্বভৌম কর্তৃত্ব কোথাও প্রতিষ্ঠিত দেখা যাবে না । কোন বস্তুর গঠন প্রণালী একথা প্রমাণ করবে না যে, তার অস্তিত্ব অন্য কারোর দান । কাজেই যেখানে এ বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা নির্ভেজাল তাওহীদের নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে যেখানে তোমার এ শিরকের চিন্তাধারা -- যার মধ্যে ধারণা ও অনুমান ছাড়া বাস্তব সত্যের গন্ধমাত্রও নেই --- কোথায় জারী হতে পারে ? এরপর বিশ্বজগতের নিদর্শনাবলী এবং স্বয়ং মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে এমন সব সাক্ষ - প্রমাণ পেশ করা হয় যা একদিকে তাওহীদ এবং অন্যদিকে রিসালাতের প্রমাণ পেশ করে ।

تَكْوِيْرٌ-এর অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়া, রাত্রিকে দিনের উপর পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হল, রাত্রি আনয়ন করে দিনকে ঢেকে দিয়ে তার আলো শেষ করে দেওয়া এবং দিনকে রাত্রির পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হল, দিন আনয়ন করে রাত্রিকে ঢেকে দিয়ে তার অন্ধকার শেষ করে দেওয়া।

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যাক্তি হতে। তারপর তিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন আট জোড়া আন'আম। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের তিন প্রকার অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?

'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে'অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে। আর তাঁর জোড়া হলেন হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম, যাকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আর তিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন আট জোড়া আন'আম

আল-আন'আম বলতে গবাদি পশু বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতে সেই চার প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর (ছাগল, ভেঁড়া, উট, গরু) বর্ণনা হয়েছে, যা নর ও মাদা মিলে আট প্রকার হচ্ছে, যার বর্ণনা সূরা আনআমের ১৪৩-১৪৪নং আয়াতে পার হয়ে গেছে। أَنْزَلَ خَلَقَ(সৃষ্টির) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অথবা এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা

প্রথমে এই সকল চতুষ্পদ জন্তুকে জান্নাতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পরে তাদেরকে অবতীর্ণ করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে إِنزال এর মূল অর্থ ধরতে হবে। অথবা أَنْزَلَ শব্দ এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কারণ এসব চতুষ্পদ জন্তু ঘাস-পাতা ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর ঘাস-পাতার জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি নিতান্ত জরুরী। তাই মূলতঃ চতুষ্পদ জন্তু আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়।

মাতৃগর্ভের তিন প্রকার অন্ধকারে

প্রথম অন্ধকার মায়ের পেট, দ্বিতীয় গর্ভাশয়, তৃতীয় ঝিল্লী; সেই পাতলা আবরণ যাতে বাচ্চা জড়ানো থাকে।

পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি

অর্থাৎ, ভ্রূণ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, প্রথমে বীর্য, অতঃপর রক্তপিন্ড, অতঃপর গোশতপিন্ড, অতঃপর অস্থির গঠন, তার উপর মাংসের আবরণ। এই সকল স্তর অতিক্রম করার পর পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী হয়। এটা বিশদভাবে সূরা হজ্জ (২২ : ৫), সূরা মুমিনুন (২৩ : ১৪) এবং সূরা 'গাফির'(৪০ : ৬৭)-এ আলোচনা আছে।

তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই।

এখানে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে যে, তিনিই যখন তোমাদের প্রভু এবং সমস্ত রাজত্ব তাঁরই তখন নিশ্চিতভাবে তোমাদের ইলাহও (উপাস্য) তিনিই । অন্য কেউ কি করে ইলাহ হতে পারে যখন প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার কোন অংশ নেই। এবং রাজত্বের ক্ষেত্রেও তার কোন দখল নেই । তোমাদের বিবেক - বুদ্ধির কাছে একথা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, যমীন আসমানের সৃষ্টিকর্তা হবেন আল্লাহ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আনুগত্য গ্রহণকারী আর রাতের পর দিন ও দিনের পর রাত আনয়নকারীও হবেন আল্লাহ । তাছাড়া তোমাদের নিজেদের এবং সমস্ত জীব - জন্তুর স্রষ্টা ও পালনকর্তাও হবেন আল্লাহ অথচ তোমাদের উপাস্য হবে তিনি ছাড়া অন্যরা ?

অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?

একথাটি চিন্তা করে দেখার মত। এখানে একথা বলা হয়নি যে, তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছো ? বরং বলা হয়েছে এই যে, তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ? অর্থাৎ অন্য কেউ তোমাদের বিপথগামী করছে এবং তোমরা তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সাদামাটা যুক্তিসংগত কথাও বুঝতে পারছো না । এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে দ্বিতীয় যে কথাটি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে 'তোমরা 'বলে সম্বোধন করে যারা ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং যারা তাদের প্রভাবে পড়ে ফিরে যাচ্ছিলো তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, কিছুটা চিন্তা - ভাবনা করলে যা সহজেই বোঝা যায়। যারা ফিরিয়ে নিচ্ছিলো তারা সে সমাজে সবার চোখের সামনেই ছিলো এবং সবখানে প্রকাশ্যেই কাজ করছিলো। তাই তাদের নাম নিয়ে বলার প্রয়োজন ছিলো না। তাদের সরাসরি সম্বোধন করাও ছিলো নিরর্থক। কারণ, তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব থেকে ফিরতে এবং অন্যদের দাসত্বে শৃঙ্খলিত করতে এবং করিয়ে রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এটা জানা কথা যে, এ ধরনের লোকদের বুঝালেও তারা তা বুঝতে রাজি ছিল না। কারণ, না বুঝার মধ্যেই তাদের স্বার্থ নিহিত ছিল এবং বুঝার পরও তারা তাদের স্বার্থ ত্যাগ করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তবে জনসাধারণ যারা তাদের প্রতারণা ও চতুরতার ফাঁদে পতিত হচ্ছিলো তারা ছিল করুণার পাত্র। এ কারবারে তাদের কোন স্বার্থ ছিল না। তাই তাদেরকে বুঝালে বুঝতে পারতো এবং চোখ কিছুটা খুলে যাওয়ার পরে তারা এও দেখতে পারতো যে, যারা তাদেরকে আল্লাহর নিকট থেকে সরিয়ে অন্যদের আস্তানার পথ দেখাচ্ছে তারা

তাদের এ কারবার থেকে কি স্বার্থ হাসিল করছে। এ কারণেই গোমরাহীতে নিক্ষেপকারী মুষ্টিমেয় লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে গোমরাহীর দিকে অগ্রসরমান জনসাধারণকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৭. যদি তোমরা কুফরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তার বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের জন্য তা-ই পছন্দ করেন। আর কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদের ফিরে যাওয়া। তখন তোমরা যা আমল করতে তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। নিশ্চয় অন্তরে যা আছে তিনি তা সম্যক অবগত।

তোমাদের কুফরীর কারণে তাঁর প্রভুত্বের সামান্যতম ক্ষতিও হতে পারে না। তোমরা মানলেও তিনি আল্লাহ, না মানলে ও তিনি আল্লাহ আছেন এবং থাকবেন। তাঁর নিজের ক্ষমতায়ই তাঁর কর্তৃত্ব চলছে। তোমাদের মানা বা না মানাতে কিছু এসে যায় না । হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন:

"হে আমার বান্দারা, যদি তোমরা আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার কোন সর্বাধিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাতেও আমার বাদশাহীর কোন ক্ষতি হবে না। " (মুসলিম) ।

এখানে 'কুফর' এর বিপরীতে 'ঈমান' শব্দ ব্যবহার না করে 'শোকর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে আপনা থেকেই এ বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায় যে, কুফরী প্রকৃতপক্ষে অকৃতজ্ঞতা ও নেমক হারামির নাম আর ঈমান প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনিবার্য দাবী। যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীর সামান্য অনুভূতিও আছে সে ঈমান ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে পারে না। এ কারণে 'শোকর' ও 'ঈমান' এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে, যেখানে শোকর থাকবে সেখানে ঈমানও অবশ্যই থাকবে। অপর দিকে যেখানে কুফরী থাকবে সেখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতা থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ কুফরীর সাথে " শোকরের " কোন অর্থ হয় না।

তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে তার কাজ কর্মের জন্য দায়ী । কেউ যদি অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কুফরী করে তাহলে সে লোকেরা তার কুফরীর বোঝা নিজেদের মাথায় উঠিয়ে নেবে না। বরং তাকেই তার কাজের পরিণাম ভোগ করার জন্য রেখে দেবে। সুতরাং কুফরীর ভ্রান্তি এবং ঈমানের সত্যতা যার কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে তার উচিত ভুল আচরণ পরিত্যাগ করে সঠিক আচরণ গ্রহণ করা এবং নিজের বংশ, জ্ঞাতি - গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাথে থেকে নিজেকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত না বানানো।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّا

৮. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে। তারপর যখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ভুলে যায় তার আগে যার জন্য সে ডেকেছিল তাকে এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অন্যকে তার পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলুন, কুফরীর জীবন তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডেকে থাকে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে এবং তাঁকে এক ও অংশীবিহীন মেনে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ব্যতীত অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাকে। তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" (১৭:৬৭) এ জন্যেই এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্যে সে ডেকেছিল। অর্থাৎ পূর্বে বিপদের সময় যে আল্লাহকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ডেকেছিল তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যায়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ আর এক জায়গায় বলেনঃ যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে আহ্বান করে থাকে, অতঃপর যখন আমি তার বিপদ দূর করে দিই। তখন সে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে, তাকে বিপদ স্পর্শ করার সময় সে যেন আমাকে আহ্বান করেনি।" (১০:১২) অর্থাৎ নিরাপদে থাকা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করতে শুরু করে দেয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও- কুফরীর জীবন অবস্থায় কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম।" এটা ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলঃ তোমরা (কিছুকাল) উপকার লাভ ও সুখ ভোগ করে নাও, তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নাম।(১৪:৩০) আরো বলেনঃ আমি তাদেরকে কিছুকাল সুখ ভোগ করাববা, অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো। (৩১:২৪)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

৯. যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

কাফের ও মুশরিকের তো এই অবস্থা যা বর্ণনা করা হল। পক্ষান্তরে আর এক ব্যক্তি যে সুখে-দুঃখে, আল্লাহর সামনে অক্ষমতা ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে সিজদা ও কিয়াম অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তার মন আখেরাতের ভয়ে ভীত এবং সে প্রভুর রহমতের আশাধারী হয়। অর্থাৎ ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই তার মধ্যে পাওয়া যায়; যা প্রকৃত ঈমান। এরা দুইজন কি সমান হতে পারে? না, কক্ষনই না। ভয় ও আশা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যু মুখে পতিত এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমার অবস্থা কি?'' সে ব্যক্তি বলল, 'আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখছি এবং স্বকৃত পাপের জন্য ভয়ও করছি।' রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ''এই অবস্থায় যদি কোন বান্দার মনে এই দু'টি কথা একত্রিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ বস্তু প্রদান করবেন, যে বস্তুর সে আশা করে এবং সেই বস্তু থেকে বাঁচিয়ে নেবেন, যার সে ভয় করে।'' (তিরমিযী -ইবনে মাজাহ)

যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?

সেই ব্যক্তি যে জানে যে, আল্লাহ শাস্তি ও শাস্তির যে ওয়াদা করেছেন তা সত্য এবং ঐ ব্যক্তি যে এ কথা জানে না, এরা দুইজন সমান হতে পারে না। একজন বিজ্ঞ এবং অপরজন অজ্ঞ। যেমন শিক্ষা ও মূর্খতা এক নয়, অনুরূপ শিক্ষিত ও মূর্খ সমান নয়। হতে পারে যে, এখানে আলেম ও জাহেলের উদাহরণ দিয়ে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যেমন এরা দুইজন সমান নয়, অনুরূপ আল্লাহর বাধ্য ও অবাধ্য বান্দা, দুইজনে সমান হতে পারে না। কেউ কেউ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, আলেম (জ্ঞানী) বলে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে তার ইলম (জ্ঞান) অনুযায়ী আমল করে। কারণ সেই (প্রকৃত আলেম যে তার) ইলম দ্বারা উপকৃত হয়। আর যে নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করে না, সে ঠিক যেন অজ্ঞ। এই অর্থ অনুযায়ী এখানে আমলকারী ও বেআমল ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, এরা দুইজন এক সমান নয়।

বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

যারা মু'মিন, কাফের নয়; যদিও তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ভাবে। যখন তারা নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা-ভাবনাই করে না এবং শিক্ষা ও নসীহতই অর্জন করে না, তখন তারা ঠিক যেন চতুষ্পদ জন্তুর মত জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত।

ফুটনোট

- এ গোটা সূরাটিকে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতারূপে পেশ করা হয়েছে। এটা একটা নসীহত।
- প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌র দুইটি গুণের কথা বলা হয়েছে- ১. আযীয ২. হাকীম
- প্রথম দুই আয়াতে কুরআনের দুইটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে- ১. এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে ২. এটি সত্যসহ নাযিল হয়েছে।
- তিনটি যুক্তি প্রমাণ দিয়েই আল্লাহ্ সন্তান হওয়ার আকীদা প্রত্যাখ্যান করেছেন-
    - প্রথম যুক্তি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সব রকমের ত্রুটি দোষ এবং দুর্বলতা থেকে পবিত্র।
    - দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে, তিনি এক অদ্বিতীয় এবং একক সত্তার অধিকারী, কোন বস্তু বা দ্রব্যের কিংবা কোন পুরুষের অংশ নন।
    - তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে, তিনি বা অপরাজেয় এক। এ বিশ্ব - জাহানের কোন কিছুই কোন পর্যায়েই তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাই কোন জিনিস সম্পর্কেই এ ধরাণা করা যেতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে তার কোন আত্মীয়তার বন্ধন আছে।
- আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্য নাযিল করেছেন আট জোড়া আন'আম (গাবাদি পশু)। এবং মানুষদেরকে তাদের মাতৃগর্ভের তিন প্রকার অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন।
- আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ (মুখলিস) হয়ে।
- কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি অপরের ভার বহন করবে না।
- সাধারনত, যখন একজন মানুষ কষ্টে পতিত হয়, তখন সে আল্লাহর দিকে ফিরে যায় এবং একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে। কিন্তু যখন তারা কোন বিপদ-মুসিবত দূরে চলে যায় এবং সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ/নিয়ামত উপভোগ করে, তখন তারা আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া ভুলে যায়। মানুষের এই ধরনের আচরণকে নিন্দা করা হয়েছে এই সূরার। মানুষ যখন বিপদে-দুঃখে থাকবে তখন সবরের সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইবে যখন অনুগ্রহ/নিয়ামত উপভোগ করে সুখে থাকবে তখন শোকর/কৃতজ্ঞতার সাথে সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। এটাই করা উচিত মুমিনদের।
- আল্লাহ্ আরেক শ্রেণী মানুষের প্রশংসা করেছেন যারা রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ করে, আল্লাহ্‌কে ডাকে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে,
- অজ্ঞ ও জ্ঞানী মানুষ কখনো সমান হতে পারে না।
- যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ভালো কাজ করে, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
- যারা আগুনে নিপতিত হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না

সূরা যুমার ১০-২১

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

১০. বলুন, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর। যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসেবে।

তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর

তাঁর আনুগত্য করে, পাপকর্ম থেকে বিরত থেকে এবং ইবাদত ও আনুগত্য বিশুদ্ধভাবে একমাত্র তাঁরই জন্য সম্পাদন করে।

যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ।

এটা তাকওয়ার (আল্লাহ-ভীতির) উপকার। 'কল্যাণ' বলতে জান্নাত ও তার চিরস্থায়ী নিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে।অনেকে فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا শব্দটিকে حَسَنَةٌএর 'মুতাআল্লিক' (সম্পৃক্ত) ভেবে অর্থ করেছেন ''যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতে আছে কল্যাণ।'' অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা, বিজয় ও গনীমত ইত্যাদি প্রদান করে থাকেন। তবে পূর্বের অর্থই অধিক সঠিক।

আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত

এখানে এই কথার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি স্বদেশে থেকে ঈমান ও তাকওয়ার উপর অটল থাকা বা শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দুষ্কর হয়, তবে সে স্থানে বসবাস করা অপছন্দনীয়। বরং সেখান থেকে হিজরত করে এমন স্থানে চলে যাওয়া দরকার, যেখানে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা সহজ হবে এবং যেখানে ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বনের পথে কোন বাধা থাকবে না।

ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসেবে

ঈমান ও তাকওয়ার পথে কষ্ট অনিবার্য এবং প্রবৃত্তি ও আত্মার চাহিদাকেও কুরবানী করা অবধারিত। যার জন্য ধৈর্যের দরকার। এই জন্য ধৈর্যশীলদের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান এমন অপরিসীম ও অগণিত রূপে দেওয়া হবে যা কোন ওজন বা হিসাবের যন্ত্র দ্বারা ওজন বা হিসাব করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তাদের পুরস্কার অপরিমিত হবে। কারণ যার হিসাব করা যায়, তার একটি সীমা থাকে আর যার কোন সীমা ও শেষ নেই,তা গণনা করা অসম্ভব। এটি ধৈর্যের এমন বৃহৎ মাহাত্ম্য যা অর্জন করার চেষ্টা প্রত্যেক মুসলিমকে করা উচিত। কারণ অধৈর্য হয়ে হা-হুতাশ, ক্ষোভ প্রকাশ বা কান্না-কাটি করে কষ্ট ও বিপদ দূর করা যায় না, যে কল্যাণ ও বাঞ্ছিত জিনিস লাভে বঞ্চনা আসে, তা অর্জন করা যায় না এবং যে অপছন্দনীয় অবস্থা এসে যায়, তা দূর করা সম্ভব হয় না। অতএব মানুষের উচিত, সবর করে সেই বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, যা আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন।

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

১১. বলুন, আমি তো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর 'ইবাদাত করতে;

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

১২. আরও আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আমি যেন প্রথম মুসলিম হই।

মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ তুমি বলে দাও আমাকে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এটাও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই। অর্থাৎ আমি যেন আমার সমস্ত উম্মতের পূর্বে নিজেই আত্মসমর্পণকারী হই এবং আমার প্রতিপালকের অনুগত এবং তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারী হই।

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

১৩. বলুন, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي

১৪. বলুন, আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে।

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

১৫. অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছে তার ইবাদাত কর। বলুন, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি(দেউলিয়াপনা) ।

কোন ব্যক্তির কারবারে খাটানো সমস্ত পুঁজি যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং বাজারে তার পাওনাদারের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে , নিজের সবকিছু দিয়েও সে দায়মুক্ত হতে পারে না তাহলে এরূপ অবস্থাকেই সাধারণভাবে দেউলিয়াত্ব বলে। এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফের ও মুশরিকদের জন্য এ রূপক ভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। মানুষ এ পৃথিবীতে জীবন , আয়ু , জ্ঞান বুদ্ধি , শরীর , শক্তি , যোগ্যতা উপায় উপকরণ এবং সুযোগ সুবিধা যত জিনিস লাভ করেছে তার সমষ্টি এমন একটি পুঁজি যা সে পার্থিব জীবনের কারবারে খাটায়। কেউ যদি এ পুঁজির সবটাই এই অনুমানের ওপর ওপর ভিত্তি করে খাটায় যে, কোন ইলাহ নেই কিংবা অনেক আছে আর সে তাদের বান্দা। তাকে কারো কাছে হিসেব দিতে হবে না , কিংবা হিসেব নিকেশের সময় অন্য কেউ এসে তাকে রক্ষা করবে, তাহলে তার অর্থ হচ্ছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং নিজের সবকিছু খুইয়ে বসলো। এটা হচ্ছে প্রথম ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে , এ ভ্রান্ত অনুমানের ভিত্তিতে সে যত কাজই করলো সেসব কাজের ক্ষেত্রে সে নিজেকে সহ দুনিয়ার বহু মানুষ , ভবিষ্যৎ বংশধর এবং আল্লাহর আরো বহু সৃষ্টির ওপর জীবনভর জুলুম করলো। তাই তার বিরুদ্ধে অসংখ্য দাবী আসলো। কিন্তু তার কাছে এমন কিছুই নেই যে , সে এসব দাবী পূরণ করতে পারে। তাছাড়া আরো একটি ক্ষতি হচ্ছে , সে নিজেরই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হলো না , বরং নিজের সন্তান - সন্ততি , প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব ও স্বজাতিকেও তার ভ্রান্ত শিক্ষা দীক্ষা এবং ভ্রান্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করলো। এ তিনটি ক্ষতির সমষ্টিকে আল্লাহর তা' আলা সুস্পষ্ট ক্ষতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ

১৬. তাদের জন্য থাকবে তাদের উপরের দিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচের দিকেও আচ্ছাদন। এ দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।

কিয়ামতের দিন পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করে। কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এসে যাবে। তাদের পরিজনবর্গ জান্নাতে গেলে এরা জাহান্নামে যাচ্ছে। আর সবাই জাহান্নামে গেলে মন্দভাবে একে অপর হতে সরে থাকবে এবং হতবুদ্ধি ও চিন্তিত থাকবে। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। অতঃপর জাহান্নামে তাদের অবস্থার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তাদের জন্যে থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। যেমন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ তাদের বিছানা হবে জাহান্নামের আগুনের এবং তাদের উপরেও হবে আগুনের চাদর, এবং এরূপেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।" (৭:৪১) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ (আরবী) অর্থাৎ সেই দিন শাস্তি তাদের উপরে ও পায়ের নীচে পর্যন্ত ঢেকে ফেলবে এবং তিনি (আল্লাহ) বলবেনঃ তোমরা যা আমল করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।" (২৯:৫৫) মহান আল্লাহ্ বলেনঃ এতদ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন তার প্রকৃত শাস্তি হতে যে, নিশ্চিত রূপে ঐ শাস্তি দেয়া হবে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং তার বান্দাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত এবং পাপকার্য ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ পরিত্যাগ করা তাদের একান্তভাবে কর্তব্য। তাই তিনি বলেনঃ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার পাকড়াও, আমার শাস্তি, আমার ক্রোধ এবং আমার প্রতিশোধ ও হিসাব গ্রহণকে ভয় কর।

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ

১৭. আর যারা তাগূতের ইবাদাত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে—

উপরের আয়াতগুলো লক্ষ করেছে বারবার বলা হচ্ছে যে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করো। এই আয়াতে আরেকটি বিষয় যুক্ত হয়েছে যে, শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতই যথেষ্ট না। তাগুতের ইবাদত থেকেও দূরে থাকবে হবে। তবে আল্লাহ্র অভিমুখী হওয়া যাবে। এখন আমরা আলোচনা করবো তাগুত কি বা তাগুতের ইবাদত দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে- তাগুত শব্দটি কুরআনে ৮ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। তাগুত শব্দটি আরবী 'তুগইয়ান' শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ সীমালঙ্ঘন করা । অবাধ্যতা, জুলুম বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনকারীকে "তাগী" বা "সীমালঙ্ঘনকারী" বলা হয়। অত্যধিক সীমলঙ্ঘনকারীকে "তাগিয়াহ' বা তাগৃত বলা হয়। এভাবে আমরা দেখছি যে, আভিধানিকভাবে "তাগুত' অর্থ 'মহা-সীমালঙ্ঘনকারী' ।

তাওহীদের মৌলিক উপাদান (রুকন) তথা لا إله إلا الله "র মৌলিক উপাদান রুকন হচ্ছে এমন বিষয়, যারঅনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে। রুকন অবশ্যই মূল বিষয়টির অন্তর্গত হওয়া চাই। যেহেতু রুকন কোন জিনিসের আভ্যন্তরীণ বা ভেতরের বিষয়, সেহেতু শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন জিনিসের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না।

রুকন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে তাওহীদ আল্লাহ তায়ালা আপনার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে তাওহীদেরও সালাতের মতোই রুকন আছে। সালাত যেমন তার রুকন যথা- তাকবীরে তাহরিমা, রুকু, সেজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না, কোনো ব্যক্তি যদি সালাতের কোনো রুকন বাদ দেয় তাহলে তার সালাত যেমন ভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ভাবে কোনো ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোনো একটি রুকন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার কোনো কাজে আসবে না, সে আর মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফেরে পরিণত হয়ে যাবে।

তাওহীদের দুটি রুকন (মৌলিক উপাদান) তাওহীদের প্রথম রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে "কুফর বিত ত্বাগুত বা তাগুতকে অস্বীকার করা"। আর দ্বিতীয় রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে "ঈমান বিল্লাহ বা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা"। এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নিম্মোক্ত বানীঃ"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়"। (আল-বাক্বারাহ ২: ২৫৬)

কুরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। আল্লাহর মোকাবিলায় বান্দার প্রভূত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় বান্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যত তার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় ফাসেকী। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আল্লাহর শান কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফরী। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এই শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌছে যায় তাকেই বলা হয়া 'তাগুত'। কোন ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোন দিন সঠিক অর্থে আল্লাহর মু'মিন বান্দা হতে পারে না।

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

১৮. যারা মনোযোগের সাথে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন আর তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।

এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে , তারা যে কোন কথা শুনলেই তা অনুসরণ করে না। তারা প্রত্যেকের কথা শুনে তা নিয়ে চিন্তা - ভাবনা করে এবং যেটি ন্যায় ও সত্য কথা তা গ্রহণ করে। আরেকটি অর্থ হচ্ছে , তারা কোন কথা শুনে তার ভুল অর্থ করার চেষ্টা করে না বরং তার ভাল অর্থ গ্রহণ করে।

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ

১৯. যার উপর শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে; আপনি কি রক্ষা করতে পারবেন সে ব্যক্তিকে, যে আগুনে (জাহান্নামে) আছে?

অর্থাৎ, আল্লাহর ফায়সালা ও ভাগ্য অনুযায়ী সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেছে। এমনভাবে সে কুফর ও যুলম এবং অন্যায় ও সীমালংঘনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব নয় এবং

তাকে গুনাহতে পূর্ণরূপে এমনভাবে গ্রাস করে নিয়েছে যে, পরিশেষে সে জাহান্নামী হয়ে গেছে। যেমন আবু জাহল ও আস বিন ওয়ায়েল প্রভৃতিরা।

যেহেতু নবী (সাঃ) নিজ জাতির সকল মানুষের ঈমানদার হওয়ার বড় আশা রাখতেন, সেহেতু আল্লাহ তাআলা নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তোমার এ আশা নিজ জায়গায় বিলকুল ঠিক, কিন্তু যার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে এবং আল্লাহর দন্ডাদেশ যার জন্য অবধারিত হয়ে গেছে, তাকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

২০. তবে যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যার উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।

এর উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে একের উপর এক তলা হবে, যেমন পৃথিবীতে কয়েক তলাবিশিষ্ট অট্টালিকা হয়। জান্নাতেও মান অনুসারে বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকা হবে, যার মধ্য হতে জান্নাতীদের ইচ্ছা অনুযায়ী দুধ, মধু, পানি এবং শারাবের নহর প্রবাহিত হতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতিরা জান্নাতে উচু কামরা সমূহ দেখবে, যেমন দেখা যায় আকাশের প্রান্তদেশে উজ্জ্বল তারকা। [বুখারী: ৩২৫৬; মুসলিম: ২৮৩১]

যে প্রতিশ্রুতি তিনি মু'মিন বান্দাদের সাথে করেছেন এবং তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

২১. আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন তারপর তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে আপনি তা হলুদ বর্ণ দেখতে পান, অবশেষে তিনি সেটাকে খড়- কুটায় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।

আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যে পানি রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আকাশ হতে অবতীর্ণ পানি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ আমি আসমান হতে পবিত্র পানি অবতীর্ণ করেছি।"(২৫:৪৮) এই পানি যমীন পান করে নেয় এবং ভিতরে ভিতরেই তা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর প্রয়োজন হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তা বের করেন এবং প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যায়। যে পানি যমীনের মালিন্যে লবণাক্ত হয়ে যায় তা লবণাক্তই থাকে। অনুরূপভাবে আকাশের পানি বরফের আকারে পাহাড়ের উপর জমে যায় যাকে পাহাড় শোষণ করে নেয়। অতঃপর ওর থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়। প্রস্রবণ ও ঝরণার পানি জমিতে যায় যার ফলে জমির ফসল সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে যা বিভিন্ন রঙ এর, বিভিন্ন গন্ধের, বিভিন্ন স্বাদের এবং বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। তারপর

শেষ সময়ে ওর যৌবন বার্ধক্যে এবং শ্যামলতা হলুদে পরিণত হয়। এরপর শুষ্ক হয়ে যায় এবং পরিশেষে কেটে নেয়া হয়। এতে কি জ্ঞানীদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ নেই? তারা এটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার অবস্থাও অনুরূপ। আজ যে ব্যক্তি যুবক ও সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়, কাল ঐ ব্যক্তিকেই বৃদ্ধ ও কদাকার রূপে দেখা যায়। আজ যে লোকটি নব যুবক ও বলবান, কালই ঐ লোকটি হয়ে পড়ে বৃদ্ধ, কুসতি ও দুর্বল। পরিশেষে সে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়। সুতরাং যারা জ্ঞানী তারাই পরিণামের কথা চিন্তা করে থাকে। উত্তম ঐ ব্যক্তি যার পরিণাম হয় উত্তম। অধিকাংশ জায়গায় পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত শস্য ও ক্ষেত্রের সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ তাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনেরঃ এটা পানির ন্যায় যা বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (১৮:৪৫)।

অর্থাৎ, বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এর মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, পৃথিবীর উদাহরণও অনুরূপ। পৃথিবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীর চাকচিক্য ও সতেজতা, তার শ্যামলতা ও সৌন্দর্য এবং তার আমোদ-প্রমোদ ও আরাম-আয়েশ ক্ষণকালের জন্য। এ সকল বস্তুকে মানুষের মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসা উচিত নয়। বরং সেই মৃত্যুর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকা দরকার, যার পরের জীবন হল চিরস্থায়ী জীবন, যার কোন শেষ নেই। কেউ কেউ বলেন, এ হল কুরআন ও ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ের উদাহরণ। উদ্দেশ্য হল যে, আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন; যা তিনি মু'মিনদের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করেন। অতঃপর তার দ্বারা দ্বীন উদগত হয়। আর তার ফলে মানুষ এক অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। সুতরাং মু'মিনগণের ঈমান ও একীন বৃদ্ধি পায়। আর যাদের মনে রোগ আছে তারা শুকিয়ে যাওয়া ফসলের মত শুকিয়ে যায়।

ফুটনোট

- মানুষের পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত/উদাহরণ/উপমা বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত শস্য ও ক্ষেত্রের সাথে দেয়া হয়েছে।
- আল্লাহ্‌র ইবাদতের পাশাপাশি তাগুতের ইবাদত বর্জনের কথা বলা হয়েছে।
- যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যার উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।
- যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ।
- ধৈর্যশীলদেরকে পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসেবে।
- একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।
- আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো ইবাদত করার মানেই হচ্ছে- কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করা

আসুন, আমরা তাকওয়া অর্জন করি, মুখলিসভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, তাগুতকে বর্জন করি এবং দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজে নিজে সংযুক্ত করি।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৬

সূরা যুমার ২২-৩১

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

২২. আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে সে তার রাবের দেয়া নূরের উপর রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অতএব দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর স্মরণ বিমুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

২১ নং আয়াতে মানুষের পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনার করার পরে এ আয়াত এসেছে। এ সমস্ত বাস্তব ব্যাপার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ এবং ইসলামকে অকাট্য ও নির্ভুল সত্য বলে মেনে নেয়ার যোগ্যতা ও সুযোগ আল্লাহ যাকে দিয়েছেন। কোন ব্যাপারে মানুষের বক্ষা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া মূলত এমন একটি মানসিক অবস্থার নাম, যখন তার মনে উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন দুচিন্তা বা দ্বিধা - দ্বন্দ্ব কিংবা সংশয় থাকে না এবং কোন বিপদের আভাস বা কোন ক্ষতির আশংকাও তাকে ঐ বিষয় গ্রহণ করতে বাধা দিকে পরে না। বরং সে পূর্ণ মানসিক তৃপ্তির সাথে এ সিদ্ধান্ত করে যে, এ জিনিসটি ন্যায় ও সত্য। তাই যাই ঘটুক না কেন আমাকে এর ওপরই চলতে হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন ব্যক্তি যখন ইসলামের পথ অবলম্বন করে তখন আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যে নির্দেশই আসে তা সে অনিচ্ছায় নয় খুশী ও আগ্রহের সাথে মেনে নেয় । কিতাব ও সুন্নাহ থেকে যে আকাইদ ও ধ্যান ধারণা এবং যে নীতিমালা ও নিয়ম কানুন তার সামনে আসে তা সে এমনভাবে গ্রহণ করে যেন সেটাই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি । কোন অবৈধ সুবিধা পরিত্যাগ করতে তার কোন অনুশোচনা হয় না। সে মনে করে ঐগুলো তার জন্য কল্যাণকর কিছু ছিল না। বরং তা ছিল একটি ক্ষতি যা থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ রক্ষা পেয়েছে। অনুরূপ ন্যায় ও সত্যের ওপর কায়েম থাকার কারণে তার যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে সে সেই জন্য আফসোস করে না, ঠাণ্ডা মাথায় বরদাশত করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তার কাছে ঐ ক্ষতি হালকা মনে হয়। বিপদাপদ আসলে তার এ একই অবস্থা হয়। সে মনে করে, আমার দ্বিতীয় কোন পথই নেই --- এ বিপদ থোকে বাঁচার জন্য, যে পথ দিয়ে আমি বের হয়ে যেতে পারি। আল্লাহর সরল সোজা পথ একটিই। আমাকে সর্বাবস্থায় ঐ পথেই চলতে হবে। বিপদ আসলে আসুক।

জ্ঞানের আলো হিসেবে সে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত লাভ করেছেন যার উজ্জ্বল আলোতে সে জীবনে চলার অসংখ্য ছোট ছোট পথের মধ্যে কোনটি ন্যায় ও সত্যের সোজা রাস্তা তা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পায়।

" শরহে সদর " (উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন) এর বিপরীতে মানুষরে মনের দু'টি অবস্থা হতে পারে। একটি হচ্ছে ' দ্বীকে সদর ' (বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, মন সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া) এর অবস্থা। এ অবস্থার মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কিছু না কিছু অবকাশ থাকে। দ্বিতীয়টি ' কাসাওয়াতে ক্বালব' (মন কঠিন হয়ে যাওয়া) এর অবস্থা। এ অবস্থায় মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কোন সুযোগই থাকে না। দ্বিতীয় অবস্থাটি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলছেন : যে ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তার জন্য সর্বাত্মক ধ্বংস ন্যায় ও সত্যকে কোনভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যার তাহলেও তার জন্য রক্ষা পাওয়ার কিছু না কিছু সম্ভাবনা থাকে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি হতে এ দ্বিতীয় বিষয়টি আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা সুস্পষ্ট করে বলেননি। কারণ, যারা রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় জেদ ও হঠকারিতা করতে একপায়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিলো যে, কোনমতেই তাঁর কোন কথা মানবে না,

আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এ জিদ ও হঠকারিতাকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে মনে করে থাকো। কিন্তু আল্লাহর যিকির এবং তাঁর পক্ষ থেকে আসা উপদেশ বাণী শুনে বিনম্র হওয়ার পরিবর্তে কেউ যদি আরো বেশী কঠোর হয়ে যায় তাহরে একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় অযোগ্যতা ও দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই।

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

২৩. আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহ, মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর হিদায়াত, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন হেদায়াতকারী নেই।

أَحْسَنُ الْحَدِيْثِ (উত্তম বাণী)এর অর্থ হল কুরআন কারীম। متشابهاএর অর্থ, কুরআনের শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য বাণী, তার সাহিত্য-শৈলী, শব্দালঙ্কার, অর্থ-সত্যতা ইত্যাদি গুণাবলীতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ। অথবা কুরআন পূর্ব আসমানী গ্রন্থসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ, কুরআন অন্য সকল আসমানী কিতাবের অনুরূপ। مَثَانِيَঅর্থাৎ, এই কুরআনে বর্ণিত ইতিহাস ও কাহিনী, আদেশ-উপদেশ ও বিধি-বিধানগুলিকে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যারা তাদের রবকে ভয় করে কারণ, তারাই ঐ সকল আযাব ও শাস্তির ধমক, সতর্কবাণী বুঝতে পারে, যা অবাধ্যদের জন্য তাতে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায় অর্থাৎ, যখন আল্লাহর করুণা, ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের আশা তাদের মনে জাগে তখন তাদের অন্তর নরম হয়ে যায় এবং আল্লাহর স্মরণে মগ্ন হয়ে পড়ে। ক্বাতাদা (রঃ) বলেন "এতে আল্লাহর আওলিয়াগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে; আল্লাহর ভয়ে তাঁদের অন্তর কম্পিত হয়, তাঁদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহর যিকর দ্বারা তাঁরা মনে শান্তি পান। যিকর করতে গিয়ে তাঁরা নেশাগ্রস্ত মাতালদের মত এবং সংজ্ঞাহীন বেহুঁশের মত হয়ে যান না। (যেমন তাঁরা নেচেও উঠেন না।) কারণ এসব হল বিদআতীদের আচরণ এবং তাতে শয়তানের হাত থাকে। (ইবনে কাসীর) যেমন বর্তমানেও বিদআতীদের কাওয়ালী-গান বা যিকরের আসর অনুরূপ শয়তানী কার্যকলাপে পরিপূর্ণ; যাতে বিভিন্ন অবস্থার তারা উন্মত্ততা, মূর্ছা, অচৈতন্য, মোহিত, আত্মহারা, বিভোর, ধ্যানমগ্ন, বেহুঁশী, মস্তী ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, এই বিষয়ে মু'মিনগণ কাফেরদের থেকে কয়েক দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। প্রথম এই যে, মু'মিনগণের শ্রাব্য বস্তু হল কুরআন কারীম, আর কাফেরদের শ্রাব্য বস্তু হল নির্লজ্জ গায়িকাদের গান-বাজনা। (যেমন বিদআতীদের শ্রাব্য বস্তু হল শিরকী অতিরঞ্জনমূলক না'ত, গজল ও কাওয়ালী গান।) দ্বিতীয় এই যে, মু'মিনগণ কুরআন শ্রবণ করে আদব ও ভীতি, আশা ও মহব্বত এবং অনুধাবন ও উপলব্ধির সাথে ক্রন্দন করেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে কাফেররা হৈ-হাল্লা করে এবং খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকে। তৃতীয় এই যে, মু'মিনগণ কুরআন শ্রবণের সময় আদব ও বিনয় প্রকাশ করেন; যেমন সাহাবায়ে কিরামগণের বরকতময় অভ্যাস ছিল। যার ফলে তাঁদের দেহ শিউরে উঠত এবং তাঁদের অন্তর আল্লাহর প্রতি আসক্ত হয়ে যেত।

(উপরে أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ আয়াতে বলা হয়েছিল যে,কোরআন শুনে কেউ প্রভাবান্বিত হয় এবং কেউ হয় না। পরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা প্রভাবান্বিত হয় না, তাদের মধ্যে যোগ্যতা ও প্রতিভার প্রভাব রয়েছে। নতুবা কোরআন সবার জন্যই সমান প্রভাবশালী। এতে কোন ত্রুটি নেই।) আমি মানুষের (হিদায়েতের) জন্য এ কোরআনে সর্বপ্রকার (জরুরী) বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (এর অবস্থা এই যে,) এটা আরবী ভাষার কোরআন, এতে সামান্যও বক্রতা নেই যাতে তারা (এসব সত্য ও পরিষ্কার বিষয়বস্তু শুনে) ভয় করে। (হিদায়েতনামা হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী কোরআনে সন্নিবেশিত রয়েছে। এর বিষয়বস্তু সত্য ও সুস্পষ্ট। এর ভাষাও আরবী, যা আরবের লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে সক্ষম। এরপর তাদের মাধ্যমে অন্যদের পক্ষেও বোঝা সহজ। মোটকথা, এই হিদায়েত গ্রন্থে কোন ত্রুটি নেই। কারও মধ্যে কবুল করার যোগ্যতা না থাকলে তার কি প্রতিকার।)

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, (সে কি তার মত যে নিরাপদ?) আর যালিমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তা আস্বাদন কর।

মানুষ মুখমণ্ডলের ওপর কোন আঘাত তখনই করে যখন সে পুরোপুরি অক্ষম ও নিরূপায় হয়ে পড়ে। অন্যথায় যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে প্রতিরোধের সামান্যতম শক্তিও থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শরীরের প্রত্যেকটি অংশে আঘাত সহ্য করতে থাকে কিন্তু মুখের ওপর আঘাত লাগতে দেয় না। তাই এখানে ঐ ব্যক্তির চরম অসহায়ত্বের চিত্র অংকন করা হয়েছে এই বলে যে, সে নিজের মুখের ওপর চরম আঘাত সহ্য করবে।

যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, “যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?” [সূরা আল-মুলক: ২২] আরও এসেছে, “যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।” [সূরা আল-কামার: ৪৮] আরও এসেছে, “যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হবে সে? তোমরা যা ইচ্ছে আমল কর।” [সূরা ফুস্‌সিলাত: ৪০]

সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের আসল উপার্জন হচ্ছে এই যে, সে তার কাজের ফলশ্রুতিতে আল্লাহর কাছে পুরস্কারের যোগ্য হয়ে যায়। আর গোমরাহী ও বিপথগামীতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের প্রকৃত উপার্জন হচ্ছে সে শাস্তি যা সে আখেরাতে লাভ করবে।

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

২৫. তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে শাস্তি এমনভাবে তাদেরকে গ্রাস করল যে, তারা অনুভবও করতে পারেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো তাদের অজ্ঞাতসারে। ফলে আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে পার্থিব জীবনেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করলো, আর পরকালের কঠিন শাস্তি তো তাদের জন্যে বাকী আছেই। সুতরাং হে মক্কার কাফিরের দল! তোমাদের এখন উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সাথে দুর্ব্যবহার করা হতে বিরত

থাকা। নতুবা তোমাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার কারণে হয়তো তোমাদের উপরও আল্লাহর কঠিন শাস্তি নেমে আসবে। তোমাদের জ্ঞান থাকলে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা তোমাদের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট।

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

২৬. ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন, আর আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠিন। যদি তারা জানত!

এর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে এই বলে সতর্ক করা হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী জাতিরা পয়গম্বরদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করার ফলে তাদের এই অবস্থা হয়েছিল, আর তোমরা নবীকুল শিরোমণি ও মানবকুল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মিথ্যাজ্ঞান করছ। তোমাদেরকেও এই মিথ্যার ভয়াবহ পরিণতিকে ভয় করা দরকার।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

২৭. আর অবশ্যই আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে,

---

আল কুরআনের উপমা-দৃষ্টান্ত পেশ করার বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, আর এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য পেশ করি; আর জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ তা বুঝে না। [সূরা আনকাবুত-৪৩]

তিনি আরও বলেছেন, মানুষের জন্য আমি এ উদাহরণগুলি পেশ করি; হয়ত তারা চিন্তাভাবনা করবে । [সূরা হাশর, আয়াত ২১]

উপমা বা দৃষ্টান্তকে আরবীতে মেছাল বলে। এর বহুবচন হলো আমছাল । আল কুরআনের উল্লিখিত উপমা-উদাহরণ-দৃষ্টান্ত ভিন্ন প্রকৃতি ও আমেজবহ। অতএব আল কুরআনের উদ্ধৃত মেছালের সংজ্ঞায় বলা যায় যে, অর্থ ও ভাবকে সংক্ষিপ্ত ও নান্দনিক কায়দায় এমনভাবে প্রকাশ করা, যা হৃদয়ে রেখাপাত করে, হোক তা উপমা অথবা প্রচলিত কথা (প্রবাদ)। পবিত্র কোরআনের প্রায় ৪০ জায়গায় এ ধরনের উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। আল কুরআনের উপমা-উদাহরণ তিন প্রকার- ১-সরাসরি ব্যক্ত উপমা। (আমসালুল মুসাররিহা) ২-সুপ্ত উপমা। (আমসালুল কামিনাহ), ৩-প্রবাদতুল্য উপমা। (কওলুল মুহাককি)

উপমা-উদাহরণ চিন্তাগত বিষয়কে সহজবোধ্য ও স্পর্শযোগ্য করে উপস্থাপন করে। ফলে মানববুদ্ধি তা সহজে গ্রহণ করে নেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা লোকদেখিয়ে দানকারীর উপমা পেশ করে বলেন, অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না । [সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪]

উপমা উদাহরণ বাস্তবতাকে উন্মোচিত করে দেয়। যা দৃষ্টির অন্তরালে তাকে বর্তমানে এনে হাজির করে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী, যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয় । [সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫]

উপমা-উদাহরণ চমৎকার অর্থকে সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করে, যেমন সুপ্ত-উপমা ও প্রবাদতুল্য উপমা। উপমা-উদাহরণ যে বিষয়কে কেন্দ্র করে পেশ করা হয়, সে বিষয়ের ব্যাপারে মানুষকে আগ্রহী করে তোলে। বিশেষ করে উদাহরণ-দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশকৃত বিষয়টি পূর্ব থেকেই মানুষের আগ্রহের জগতে সজীব থাকে। যেমন আল্লাহর পথে যারা দান করে তাদের দান বহু কল্যাণ বয়ে আনে এ বিষয়টির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ । [সূরা বাকারা, আয়াত ২৬১]

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

২৮. আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

পৃথিবীতে অনেক ভাষা আছে। সব ভাষাই আল্লাহর দান। তাহলে কোরআন কেন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে? এর জবাবে আল্লাহ বলেন, 'আমি যদি এই কোরআনকে অনারবি ভাষায় অবতীর্ণ করতাম, তবে তারা বলত, এর আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হলো না কেন? এটি কেমন কথা যে কোরআন অনারবি ও রাসুল [মুহাম্মদ (সা.)] আরবীয়। বলো, যারা ইমান আনে, তাদের জন্য এটি হেদায়েত ও (আত্মার) ব্যাধির প্রতিকার, আর যারা ইমান আনে না, তাদের কানে বধিরতা আছে। তাদের জন্য এটি অন্ধত্বের কারণ। এরা এমন যে যেন তাদের বহু দূর-দূরান্ত থেকে ডাকা হচ্ছে।' (সুরা : হা-মিম সিজ্দা, আয়াত : ৪৪)

প্রশ্ন হলো, মহানবী (সা.) বিশ্বনবী। কিন্তু কোরআন শুধু আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হলে অন্য ভাষার লোকেরা কিভাবে কোরআন থেকে উপকৃত হবে? এর জবাব হলো, মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত। আর সেখানকার ভাষা আরবি। তাই কেন্দ্রস্থলের ভাষা আরবিতে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে আরবি ভাষাভাষিরা সবার আগে তা বুঝতে পারে। আর অন্য ভাষাভাষিরা তাদের মাধ্যমে কোরআন বুঝতে পারে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এটি বরকতময় কিতাব, যা আমি নাজিল করেছি। এটি আগের আসমানি কিতাবগুলোর সমর্থক, যাতে তুমি এর মাধ্যমে জনপদগুলোর কেন্দ্র (মক্কা) ও তার আশপাশের লোকদের সতর্ক করতে পারো। যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তারা এর প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং তারা তাদের নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে।' (সুরা : আন'আম, আয়াত : ৯২)

এ কিতাব অন্য কোন ভাষায় নাযিল হয়নি যে, তা বুঝার জন্য মক্কা ও আরবের লোকদের কোন অনুবাদক বা ব্যাখ্যাকারের দরকার হয়। এ কিতাব তাদের নিজের ভাষায় নাযিল হয়েছে। যা তারা নিজেরাই সরাসরি বুঝতে সক্ষম।

অর্থাৎ তার মধ্যে কোন বক্রতা বা জাটিলতাপূর্ণ কোন কথা নেই যে, তা বুঝা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন হবে। বরং এর মধ্যে পরিস্কারভাবে সহজ - সরল কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এখান থেকে জেনে নিতে পারে এ গ্রন্থ কোন জিনিসকে ভ্রান্ত বলে এবং কেন বলে ? কোন জিনিসকে সঠিক বলে এবং কিসের ভিত্তিতে ? কি স্বীকার করাতে চায় এবং কোন জিসিস অস্বীকার করাতে চায়। কোন কোন কাজের নির্দেশ দেয় এবং কোন কোন কাজে বাধা দেয়।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

২৯. আল্লাহ্‌ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেনঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক ব্যক্তি, যে এক প্রভুর অনুগত; এ দু'জনের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

এ উপমাতে আল্লাহ তা'আলা শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য এবং মানব জীবনের ওপর এ দু'টির প্রভাব এমন পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এতো বড় বিষয়কে এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত কথায় এবং এতটা কার্যকর পন্থায় বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। একথা সবাই স্বীকার করবে যে, যে ব্যক্তি অনেক মালিক বা মনিবের অধীন এবং তারা প্রত্যেকেই তাকে নিজের দিকে টানে। তারা এমন বদমেজাজী যে, প্রত্যেক তার সেবা গ্রহণ করতে চায় কিন্তু অন্য মালিকের নির্দেশ পালনের সুযোগ তাকে দেয় না, তাছাড়া তাদের পরস্পর বিরোধী নির্দেশ শুনতে গিয়ে যার নির্দেশই সে পালন করতে অপরাগ হয় সে তাকে শুধু ধমক ও বকাঝকা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং শাস্তি দিতেও বদ্ধপরিকর হয়, এমন ব্যক্তির জীবন অনিবার্যরূপেই অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্যে পতিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একই মনিবের চাকর সে ব্যক্তি অতীব আরাম ও শান্তিতে জীবন যাপন করবে। তাকে অন্য কারো খেদমত এবং সন্তোষ বিধান করতে হয় না। এটা এমন সহজ করল কথা যা বুঝার জন্য বড় বেশী চিন্তা - ভাবনা করার প্রয়োজন হয় না। এ উপমা পেশ করার পর কারো জন্য একথা বুঝাও কঠিন নয় যে এক আল্লাহর দাসত্বে মানুষের জন্য যে শান্তি ও নিরাপত্তা আছে বহু সংখ্যক ইলাহর দাসত্ব করে কখনো তা লাভ করা যেতে পারে না।

এখানে একথাও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, পাথরের মূর্তির সাথে বহু সংখ্যক বক্র স্বভাবের এবং পরস্পর কলহপ্রিয় মনিবদের উপমা খাটে না। এ উপমা সেসব জীবন্ত মনিবদের ক্ষেত্রেই খাটে যারা কার্যতই পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দান করে এবং বাস্তবেও তাকে নিজের দিকে টানতে থাকে। পাথরের মূর্তি কাকে কবে আদেশ দেয় এবং কাকে কখন নিজের খেদমতের জন্য ডাকে ? এ তো জীবন্ত মনিবদের কাজ। মানুষের নিজের প্রবৃত্তির মধ্যে, বংশের মধ্যে, জ্ঞাতি - গোষ্ঠির মধ্যে, জাতি ও দেশের সমাজের মধ্যে, ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে, শাসক ও আইন প্রণেতাদের মধ্যে, কায়কারবার ও জীবিকার গণ্ডির মধ্যে এবং পৃথিবীর সভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিসমূহের মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান। তাদের পরস্পর বিরোধী আকাংখা ও বিভিন্ন দাবী মানুষকে সবসময় নিজের দিকে টানতে থাকে। সে তাদের যার আকাংখা ও দাবী পূরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তাকে নিজের কর্মের গণ্ডির মধ্যে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ে না। তবে প্রত্যেকরে শাস্তিতর উপরকরণ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ মনে আঘাত দেয়, কেউ অসন্তুষ্ট হয়, কেউ উপহাস করে, কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেউ নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করে, কেউ ধর্মের ওপর আক্রমণ করে এবং কেউ আইনের আশ্রয় নিয়ে শাস্তি দেয়। মানুষের জন্য এ সংকীর্ণতা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র উপায় আছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদের পথ গ্রহণ করে শুধু এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাওয়া এবং গলদেশ থেকে অন্যদের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করা

তাওহীদের পথ অবলম্বন করারও দু'টি পন্থা আছে এবং এর ফলাফলও ভিন্ন ভিন্ন।

একটি পন্থা এই যে, কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু আশে - পাশের পরিবেশ তার সহযোগী হবে না। এ ক্ষেত্রে তার জন্য বাইরের দ্বন্দ্ব - সংঘাত ও সংকীর্ণতা আগের চেয়েও বেড়ে যেতে পারে। তবে সে যতি সরল মনে এ পথ অবলম্বন করে থাকে তাহলে মনের দিক দিয়ে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে। সে প্রবৃত্তির এমন প্রতিটি আকাংখা প্রত্যাখ্যান করবে যা আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী বা যা পূরণ করার

পাশাপাশি আল্লাহভীরুতার দাবী পূরণ করা যেতে পারে না। সে পরিবার, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, সরকার, ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং আর্থিক কর্তৃত্বেরও এমন কোন দাবী গ্রহণ করবে না যা আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এর ফলে সে সীমাহীন দুঃখ - দুর্দশার সম্মুখীন হতে পারে তথা অনিবার্যরূপেই হবে কিন্তু তার মন এ ব্যাপারে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত থাকবে যে, আমি যে আল্লাহর বান্দা তার দাসত্বের দাবী আমি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করছি। আর আমি যাদের বান্দা নই আমার কাছে তাদের এমন কোন অধিকার নেই, যে কারনে আমি আমার রবের নির্দেশের বিরুদ্ধে তাদের দাসত্ব করবো। দুনিয়ার কোন শক্তিই তার থেকে মনের এ প্রশান্তি এবং আত্মার এ শান্তি ও তৃপ্তি ছিনিয়ে নিতে পারে না। এমনকি তাকে যদি ফাঁসি কাষ্ঠেও চড়তে হয় তাহলে সে প্রশান্ত মনে ফাঁসির কাষ্ঠেও ঝুলে যাবে। সে একথা ভেবে সামান্য অনুশোচনাও করবে না যে, আমি কেন মিথ্যা প্রভুদের সামনে মাথা নত করে আমার জীবন রক্ষা করলাম না।

আরেকটি পন্থা এই যে, গোটা সমাজ তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক এবং সেখানে নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, আইন, কানুন, রীতিনীতি ও দেশাচার, রাজনতি, অর্থনীতি মোট কথা জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য আকীদা - বিশ্বাস হিসেবে সেসব মূলনীতি মেনে নেয়া হোক এবং কার্যত চালু করা হোক যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব ও রসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন। আল্লাহর দীন যেটিকে গোনাহ বলবে আইন সেটিকেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে, সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সেগুলোকে উৎখাত করার চেষ্টা করবে, শিক্ষা - দীক্ষা সেটি থেকে বাঁচার জন্য মন মানসিকতা তৈরী করবে। মিম্বার ও মিহরাব থেকে এর বিরুদ্ধেই আওয়াজ উঠবে সমাজ এটিকে দোষণীয় মনে করবে এবং জীবিকা অর্জনের প্রতিটি কাজ- কারবারে তা নিষিদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর দীন যে জিনিসকে কল্যাণ ও সুকৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করবে আইন তাকেই সমর্থন করবে। ব্যবস্থাপনার শক্তি তার লালন পালন করবে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা মন মগজে সেটিকে বদ্ধমূল করতে এবং চরিত্র ও কর্মে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবে। মিম্বর ও মিহরাব তারই শিক্ষা দেবে, সমাজও তারই প্রশংসা করবে। তার ওপরেই প্রচলিত রীতিনীতি কার্যত প্রতিষ্ঠিত করবে এবং কায়-কারবার ও জীবন জীবিকার প্রক্রিয়াও সে অনুসারেই চলবে। এভাবেই মানুষ পূর্ণ আভ্যন্তীণ ও বাহ্যিক শান্তি লাভ করে এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মক উন্নতির সমস্ত দরজা তার জন্য খুলে যায়। কারণ, আল্লাহ ও গায়রুল্লাহর দাসত্বের দাবীর যে দ্বন্দ্ব - সংঘাত তা তখন প্রায় শেষ হয়ে যায়।

ইসলাম যদিও প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বলে আহবান জায়ায় যে, দ্বিতীয় অবস্থাটা সৃষ্টি হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় সে তাওহীদকেই তার আদর্শ হিসেবে মেনে চলবে এবং সব রকম বিপদ - আপদ ও দুঃখ - কষ্টের মোকাবিলা করে আল্লাহর দাসত্ব করে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ এ দ্বিতীয় অবস্থা সৃষ্টি করা। সমস্ত নবী ও রসূল আলাইহিমুস সালামের প্রচেষ্টা ও দাবীও এই যে, একটি মুসলিম উম্মাহর উত্থান ঘটুক যারা কুফর ও কাফেরদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে জামায়ত বদ্ধভাবে আল্লাহর দীন অনুসরণ করবে। কুরআন ও সুন্নাত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিবেক - বুদ্ধিহীন না হয়ে কেউই একথা বলতে পারে না যে, নবী রসূল আলাইহিমুস সালামের চেষ্টা সাধানার লক্ষ ছিল শুধু ব্যক্তিগত ঈমান ও আনুগত্য। সামাজিক জীবনে ' দীন হক ' বা ন্যায় ও সত্যের আদর্শ কয়েম করার উদ্দেশ্য আদৌ তাঁদের ছিল না।

এখানে " আলহামদুলিল্লাহ " এর অর্থ বুঝার জন্য মনের মধ্যে এ চিত্রটি অংকন করুন যে,শ্রোতাদের সামনে উপরোক্ত প্রশ্ন পেশ করার পর বক্তা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন যাতে তাওহীদের বিরোধীতাকারীদের কাছে তার কোন জবাব থাকলে যেন দিতে পারে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে যখন কোন জবাব আসলো না এবং কোন দিক থেকে এ জবাবও আসলো না যে, দু'টি সমান, তখন বক্তা বললেন ' আলহামদুলিল্লাহ ' অর্থাৎ আল্লাহর

শুকরিয়া যে তোমরা নিজেরাও মনে মনে এ দু'টি অবস্থার পার্থক্য অনুভব করে থাকো। একজন মনিবের দাসত্বের চেয়ে অনেক মনিবের দাসত্ব উত্তম বা দু'টি সমান পর্যায়ের একথা বলার ধৃষ্ঠতা তোমাদের কারোই নেই।

তাদের অধিকাংশই জানে না অর্থাৎ একজন মনিবের দাসত্ব ও বহু সংখ্যক মনিবের দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্য তো বেশ বুঝতে পার কিন্তু এক প্রভুর দাসত্ব ও বহু সংখ্যক প্রভুর দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্য যখন বুঝানোর চেষ্টা করা হয় তখন অজ্ঞ সেজে বসো।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

৩০. আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।

এ বাক্যাংশ ও পূর্ববর্তী বাক্যাংশের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম শূন্যতা আছে যা স্থান কাল ও পূর্বাপর বিষয়ে চিন্তা করে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেই পূর্ণ করতে পারেন। এখানে এ বিষয়টি প্রচ্ছন্ন আছে যে, তোমরা এভাবে একটি পরিস্কার সহজ - সরল কথা সহজ - সরল উপায়ে এসব লোককে বুঝাচ্ছো আর এরা হঠকারিতা করে তোমাদের কথা শুধু প্রত্যাখ্যানই করছে না বরং এ সুস্পষ্ট সত্যকে পরাভূত করার জন্য তোমাদের চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক আছে ! চিরদিন তোমরাও থাকবে না, এরাও থাকবে না। একদিন উভয়কেই মরতে হবে। তখন সবাই যার যার পরিণাম জানতে পারবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

৩১. তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবের সামনে পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করবে।

এ আয়াত নাযিল হলে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়াতে আমরা যে ঝগড়া করছি সেটা কি আবার আখেরাতেও হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তখন যুবাইর বললেন, বিষয়টি তাহলে ভয়াবহ। [তিরমিযীঃ ৩২৩৬] ইবন উমর বলেন, আমরা এ আয়াত নাযিল হয়েছে জানতাম কিন্তু কেন নাযিল হলো বুঝতে পারিনি। আমরা বলতাম, কার সাথে আমরা ঝগড়া করব? আমাদের মধ্যে এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে তো কোন ঝগড়া নেই। অবশেষে যখন মুসলিমদের মাঝে ফেতনা শুরু হলো তখনই বুঝতে পারলাম যে, এটাই আমাদের রবের পক্ষ থেকে যে ঝগড়ার ওয়াদা করা হয়েছিল তা। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে انكم শব্দের মধ্যে মুমিন, কাফির, মুসলমান, জালিম ও মযলুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ মোকাদ্দমা আল্লাহ্ তা' আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ্ জালিমকে মানুষের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও যিম্মায় কারও কোন হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা, পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা নিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালিম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ থেকে নিয়ে মযলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোন সৎকর্ম না থাকলে মযলুমের গোনাহ্, তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) এক দিন সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থ-কড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকার নিঃস্ব

সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা ও হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল, কারও অর্থ-কড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল—এসব মযলুম সবাই আল্লাহর সামনে তাদের যুলুমের প্রতিকার দাবি করবে। ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মযলুমের হক অবশিষ্ট থাকে তবে মযলুমের গুনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কিয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সেই প্রকৃত নিঃস্ব।

ফুটনোট

- "শরহে সদর" (উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন) কাসাওয়াতে ক্বালব' (মন কঠিন হয়ে যাওয়া) এই দুই ধরনের কলব/হৃদয় কখনো সমান হতে পারে না।
- শরহে সদর হলো আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে সে তার রাবের দেয়া নূরের উপর রয়েছে। অপরদিকে কাসাওয়াতে ক্বালব' হলো- কঠোর হৃদয় ব্যক্তি, যারা আল্লাহর স্মরণ বিমুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।
- أَحْسَنُ الْحَدِيْثِ (উত্তম বাণী)এর অর্থ হল কুরআন
- ২৩ নং আয়াতে কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো-
  - এটা উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য
  - এটা বারবার পড়া হয়। (কুরআন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পঠিত গ্রন্থ)
  - এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত
- কোরআন শুনে কেউ প্রভাবান্বিত হয় এবং কেউ হয় না। যারা প্রভাবান্বিত হয় না, তাদের মধ্যে যোগ্যতা ও প্রতিভার প্রভাব রয়েছে। নতুবা কোরআন সবার জন্যই সমান প্রভাবশালী।
- কুরআন অধ্যয়নের/শুনার ফলে যারা তাদের রবকে ভয় করে, যাদের শরীর শিউরে ওঠে, যাদের দেহ, মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে বুঝতে হবে আল্লাহ্ তাদের উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন রেখেছেন এবং তারা হিদায়াতের উপর রয়েছে।
- কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে এবং যা বক্রতামুক্ত
- কুরআনে উপমা/দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মানুষকে বিভিন্ন বিষয় বুঝানো হয়েছে যাতে মানুষ কুরআনের উপদেশ সহজে গ্রহণ করে।
- তাওহীদ ও শিরকের বিষয় বুঝতে ২৯ নং একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে- এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক ব্যক্তি, যে এক প্রভুর অনুগত; এ দু'জনের অবস্থা কি সমান?
- প্রত্যেক সৃষ্টিই মরণশীল
- কিয়ামতের দিন সবাই নিজ নিজ মোকাদ্দমা আল্লাহ্ তা`আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ্ জালিমকে মানুষের হক দিতে বাধ্য করবেন।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৭

সূরা আম্বিয়া ৭৬-৮২

সূরা আল আম্বিয়া কুরআনের একুশতম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর আয়াত সংখ্যা ১১২ টি। আম্বিয়া শব্দের অর্থ নবীগণ।

নামকরণ

الْأَنْبِيَاءِ। আম্বিয়া শব্দটি নাবী শব্দের বহুবচন। এই সূরাতে একাধিক নাবী ও রাসূলের আলোচনা করা হয়েছে বিধায় একে সূরা আম্বিয়া নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সূরাতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সে সম্পর্কে গাফেল, নাবীদের বৈশিষ্ট্য, পূর্ববর্তী কয়েকটি অবাধ্য জাতির ধ্বংস, একাধিক মা'বূদ থাকলে কী সমস্যা হত এবং যে ফেরেশতাদেরকে অনেকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা মনে করে তারা মূলত তা নয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর কয়েকজন নাবীর কাহিনী, তাদের আহ্বানে আল্লাহ তা'আলার সাড়া দান, ইবরাহীম (عليه السلام)-এর পিতা ও জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত, দাওয়াত পেয়ে তাদের অবস্থান এবং সবশেষে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে আসা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী উভয়ের দৃষ্টিতেই মনে হয় এর নাযিলের সময়-কাল ছিল মক্কী জীবনের মাঝামাঝি অর্থাৎ আমাদের বিভক্তিকরণের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় ভাগে। শেষ ভাগের সূরাগুলোর মধ্যে যে বৈশিষ্ট পাওয়া যায় এর পটভূমিতে তা ফুটে ওঠে না।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছিল এ সূরায় তা আলোচিত হয়েছে। তারা নবী করীমের (সা) রিসালাতের দাবী এবং তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করতো তার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে তার মোকাবিলায় যেসব কৌশল অবলম্বন করা হতো সেগুলোর বিরুদ্ধে হুকমি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাদের অশুভ ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যে ধরনের গাফলতি ও ঔদ্ধত্যের মনোভাব নিয়ে তার দাওয়াতকে আগ্রাহ্য করেছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের জন্য দুঃখ ও বিপদ মনে করছো তিনি আসলে তোমাদের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন।

ভাষণের মধ্যে বিশেষভাবে যে সমস্ত আলোচিত হয়েছে সেগুলো নিচে দেয়া হলোঃ

একঃ মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না, মক্কার কাফেরদের এ বিভ্রান্তি এবং এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল মেনে নিতে অস্বীকার করাকে-বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে নিরসন ও খণ্ডন করা হয়েছে।

দুইঃ নবী করীমের (সা) ও কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা এবং কোন একটি কথার ওপর অবিচল না থাকার-ওপর সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু অত্যন্ত জোরালো ও অর্থপূর্ণ পদ্ধতিতে পাকড়াও করা হয়েছে।

তিনঃ তাদের ধারণা ছিল, জীবন নেহাতই একটি খেলা, কিছুদিন খেলা করার পর তাকে এমনিই খতম হয়ে যেতে হবে, এর কোন ফল বা পরিণতি ভুগতে হবে না। কোন প্রকার হিসেব নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অবকাশ এখানে নেই।-যে ধরনের গাফলতি ও অবজ্ঞা সহকারে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রত্যাখ্যান করছিল, ঐ ধারণাই যেহেতু তার মূল ছিল, তাই বড়ই হৃদয়গাহী পদ্ধতিতে এর প্রতিকার করা হয়েছে।

চারঃ শিরকের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ছিল তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে বিরোধের মূল ভিত্তি।-এর সংশোধনের জন্য শিরকের বিরুদ্ধে ও তাওহীদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত কিন্তু মোক্ষম ও চিত্তাকর্ষক যুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

পাঁচঃ এ ভুল ধারণাও তাদের ছিল যে, নবীকে বারবার মিথ্যা বলা সত্ত্বেও যখন তাদের ওপর কোন আযাব আসে না তখন নিশ্চয়ই নবী মিথ্যুক এবং তিনি আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আযাবের ভয় দেখান তা নিছক অন্তসারশূন্য হুকমি ছাড়া আর কিছুই নয়।-একে যুক্তি ও উপদেশ উভয় পদ্ধতিতে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর নবীগণের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী থেকে কতিপয় নজির পেশ করা হয়েছে। এগুলো থেকে একথা অনুধাবন করানোই উদ্দেশ্য যে, মানবেতিহাসের বিভিন্ন যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব পয়গম্বর এসেছিলেন তারা সবাই ছিলেন মানুষ। নবুওয়াতের বিশিষ্ট গুণ বাদ দিলে অন্যান্য গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের মতই মানুষ ছিলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী এবং খোদায়ীর সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে ছিল না। বরং নিজেদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের জন্য তারা সবসময় আল্লাহর সামনে হাত পাততেন। এই সংগে একই ঐতিহাসিক নজির থেকে আরো দুটি কথাও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, নবীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ এসেছে এবং তাদের বিরোধীরাও তাদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সকল নবী একই দীনের অনুসারী ছিলেন। এবং সেটি ছিল সেই দীন যেটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন। এটিই মানব সম্প্রদায়ের আসল ধর্ম। বাদবাকি যতগুলো ধর্ম দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিছক পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভেদাত্মক প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, এ দীনের অনুকরণ ও অনুসরণের ওপরই মানুষের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল। যারা এ দীন গ্রহণ করবে তারাই আল্লাহর শেষ আদালত থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে এবং তারাই হবে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। আর যারা তাকে প্রত্যাখান করবে তারা আখেরাতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হবে। শেষ বিচারের সময় আসার আগেই আল্লাহ নিজের নবীর মাধ্যমে মানুষকে এ সত্য সম্পর্কে অবহিত করে চলছেন, এটি তাঁর বিরাট মেহেরবানী। এ অবস্থায় নবীর আগমনকে যারা নিজেদের জন্য রহমতের পরিবর্তে ধ্বংস মনে করে তারা অজ্ঞ ও মুর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

যারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং আখিরাতের ব্যাপারে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরপর কাফেরদেরকে প্রদত্ত ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ বা শশ্বর্য আখিরাতের স্মরণ থেকে গাফলতের কারণ হয় । এ কারণেই এ সূরার শুরুতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে করে যারা গাফলতের মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা গাফলত পরিহার করে আখিরাতের চিন্তা করে, চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আর্বিয়ায়ে কেরামের হেদায়েতের উপর আমল করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে।

সূরার ফজিলত

'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ বনী ইসরাঈল, কাহফ, মারইয়াম, ত্বহা এবং 'আম্বিয়া' প্রথমে অবতীর্ণ অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরনো রক্ষিত সম্পদ। [সহীহ বুখারী ৪৭০৮]

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

৭৬. আর স্মরণ করুন নূহকে; পূর্বে তিনি যখন ডেকেছিলেন তখন আমরা সাড়া দিয়েছিলাম তার ডাকে এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম,

আদম 'আলাইহিস সালাম যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তার আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর দ্বন্দ ছিল না। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শির্কের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নূহ আলাইহিস্ সালামের আমল থেকেই শুরু হয়। রিসালাত ও শরীআতের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রাসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল নূহ আলাইহিস সালাম ও তার নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী। তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এই কাহিনীতে সাড়ে নয়শ বছরের সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল, তার নবীসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম 'আলাইহিস সালাম ও নূহ আলাইহিস সালামের মাঝখানে দশ 'করণ' বা প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে। [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২/৫৪৬]

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তার বয়স হয়েছিল নয়শ পঞ্চাশ বছর। [সূরা আল-আনকাবুতঃ ১৪] কেউ কেউ বলেনঃ তিনি এক হাজার বছরই আয়ু পেয়েছিলেন তন্মধ্যে নয়শ' পঞ্চাশ বছর প্লাবনের পূর্বে আর পঞ্চাশ বছর প্লাবনের পরে। উপরোক্ত আয়াতেও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে। নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল এবং শির্কে লিপ্ত ছিল। তাদের শির্ক সম্পর্কে সুস্পষ্ট কথা এই যে, তারাই যমীনের বুকে সর্বপ্রথম শির্ক করেছিল। হাদীসে এসেছে যে, তাদের সম্প্রদায়ের পাঁচজন মহাব্যক্তিত্ব যাদের নাম যথাক্রমে- উদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর; তারা অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন। হঠাৎ করেই তারা মারা যান।

এতে করে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। তখন শয়তান এসে তাদেরকে বলেঃ আমি কি তোমাদেরকে তাদের কিছু ছবি বানিয়ে দেব না, যাতে তোমরা তাদেরকে দেখে দেখে বেশী ইবাদাত

করতে পার? তারা অনুমতি দিলে শয়তান কিছু ছবি বানিয়ে তাদের ইবাদাতখানার পিছনে টাঙিয়ে রাখে। পরবর্তী প্রজন্ম সেগুলোকে ইবাদাতখানার সম্মুখভাগে নিয়ে আসে এবং সেগুলোকে মূর্তির আকৃতি দান করে। তখনো তাদের ইবাদাত শুরু হয়নি। এ প্রজন্ম মারা যাওয়ার পরে পরবর্তী প্রজন্ম কি উদ্দেশ্যে এ মূর্তিগুলো স্থাপন করা হয়েছিল তা ভুলে গেলে শয়তান তাদের কাছে এসে বললঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এগুলোর ইবাদাত করত এবং এগুলোর উসিলায় আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করত। শেষপর্যন্ত তারা এগুলোর ইবাদাত শুরু করে। [বুখারীঃ ৪৯২০] আর এখান থেকেই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার উদ্ভব হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূহে তার বিস্তারিত আলোচনা করে কিভাবে নূহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেনঃ "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।" এখানে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। তারপর শির্ক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতঃপর ঐ মহাশাস্তির আশংকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর অর্থ আখেরাতের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং দুনিয়ার প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে। তার সম্প্রদায়ের ملأ বা নেতা গোছের লোকেরা উত্তরে বললঃ আমরা মনে করি যে, তুমি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছ। কারণ, তুমি আমাদেরকে বাপ-দাদার দ্বীন পরিত্যাগ করতে বলছ। কেয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ আর কিছু নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ আলাইহিস সালাম নবীসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়াত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সাদাসিধা ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন ভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক দ্বীনের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে রাসূল। আমি যা কিছু বলি, পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌছাই। এতে তোমাদের মঙ্গল। এতে না আল্লাহর কোন লাভ আছে এবং না আমার কোন স্বার্থ আছে। এরপর তারা যেহেতু নূহ আলাইহিস সালামকে তাদের মত মানুষ হওয়ার কারণে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছিল, সেহেতু তিনি তার জবাবে বলেনঃ তোমরা কি এর ফলে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার বাণী তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও এবং রহমত লাভে ধন্য হও? অর্থাৎ তার ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর যাতে করে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হয়।

স্বজাতির মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ আলাইহিস সালামের দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবেই মিথ্যারোপ করে যেতে থাকল। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। আল্লাহ বলেনঃ এর পরিণতিতে আমরা নূহ ও তার সঙ্গীদেরকে নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ।

আলোচ্য আয়াতে নূহের আঃ দো'আর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল নিজের জাতির সংশোধনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবার পর শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি যে দো'আ করেছিলেন। "হে রব! আমি হেরে গেছি আমাকে

সাহায্য করো।” [সূরা আল কামারঃ ১০] এবং “হে আমার রব! পৃথিবী পৃষ্ঠে একজন কাফেরকেও ছেড়ে দিয়ো না।” [সূরা নূহঃ ২৬]

আল্লাহ তাআলা তার প্রার্থনা কবুল করলেন। তিনি তাকে ও তার মু'মিন অনুসারীদেরকে পরিত্রাণ দেন। এবং তার পরিবার পরিজনকেও রক্ষা করেন। শুধু তাদেরকে নয় যাদের নাম ধ্বংস প্রাপ্তদের তালিকা ভুক্ত ছিল। তার উপর ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (আঃ) তাঁর কওমের জুলুম ও অবিচার হতে মুক্তি দেন। সাড়ে নয়শত বছর তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে তাবলীগ করতে থাকেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই শিরক ও কুফরীর উপরই রয়ে যায়। এমন কি তারা তাকে কষ্ট দিতে থাকে। এবং তাঁকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে একে অপরকে উত্তেজিত করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি হযরত নূহকে (আঃ) সাহায্য করেছিলাম ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল এবং তাকে তাদের উৎপীড়ন হতে রক্ষা করেছিলাম এবং তার প্রার্থনা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠে একজন কাফিরও পরিত্রাণ পায় নাই। সবকেই ডুবিয়ে দেয়া হয়।

كَرْبِ الْعَظِيمِ (মহা সংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নূহ (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

৭৭. এবং আমরা তাকে সাহায্য করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলীতে মিথ্যারোপ করেছিল; নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এজন্য আমরা তাদের সবাইকেই নিমজ্জিত করেছিলাম।

নূহ আঃ এর সম্প্রদায় আল্লাহর আয়াত অস্বীকার শুধু করি সাথে সাথে নূহ আঃ-কে পাগল বলেছিল- কুরআনে উল্লেখ আছে- .... নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল– সুতরাং তারা আমাদের বান্দার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল আর বলেছিল, ‘পাগল’ , আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। (সুরাঃ আল-কামার আয়াতঃ ৯)

অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ আলাইহিস সালাম-কে হুমকি প্রদর্শন করে বললঃ যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব। (সূরা শু'আরা: ১১৬)

আবদ ইবনে হুমাইদ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথে-ঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন এরপর হুশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহ তা ‘আলার কাছে দু ‘আ করতেন- (أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) আমি তো পরাজিত, অতএব, তুমি আমাকে সাহায্য কর। তিনি জাতির জন্য আল্লাহ তা ‘আলার কাছে ক্ষমাও চাইতেন। এভাবে সাড়ে নয়শত বছর সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জবাব দেয়ার মাধ্যমে অবশেষে তিনি নিরুপায় হয়ে বদদু ‘আ করেন। যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

৭৮. আর স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা বিচার করছিলেন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাতে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আর আমরা তাদের বিচার পর্যবেক্ষণ করছিলাম।

মুফাস্‌সিরগণ ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, দুই লোক দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগলপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগলপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবতঃ বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগলপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) দাউদ আলাইহিস সালাম রায় দিলেন যে, ছাগলপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পন করুক। (কেননা, ফিকহ এর পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেয়া হয়। ছাগলপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেয়া হয়েছে।)

বাদী ও বিবাদী উভয়ই দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তার পুত্র) সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দেয়। সুলাইমান বলেনঃ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়পক্ষের জন্য উপকারী হত। তারপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে এ কথা জানালেন। দাউদ আলাইহিস সালাম বলেনঃ এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি? সুলায়মান বললেনঃ আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগলপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগলপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে তখন শস্যক্ষেত্র উহার মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যার্পণ করুন। দাউদ আলাইহিস সালাম এই রায় পছন্দ করে বললেনঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

৭৯. অতঃপর আমরা সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর আমরা পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত, আর আমরাই ছিলাম এ সবের কর্তা।

এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে ন্যায়বিচারের এ মূলনীতি জানা যায় যে, দু'জন বিচারপতি যদি একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করে এবং দু'জনের ফায়সালা বিভিন্ন হয়, তাহলে যদিও একজনের ফায়সালাই সঠিক হবে তবুও দু'জনেই ন্যায়বিচারক বিবেচিত হবেন। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে বিচার করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে। তাদের কেউ যেন অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা সহকারে বিচারকের আসনে বসে না যান। [দেখুন, কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথা আরো বেশী সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যদি বিচারক নিজের সামর্থ অনুযায়ী ফায়সালা করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান, তাহলে সঠিক ফায়সালা করার ক্ষেত্রে তিনি দুটি প্রতিদান পাবেন এবং ভুল ফায়সালা করলে পাবেন একটি প্রতিদান ।" [বুখারীঃ ৬৯১৯, মুসলিমঃ ১৭১৬]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "বিচারক তিন প্রকারের। এদের একজন জান্নাতী এবং দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতের অধিকারী হচ্ছেন এমন বিচারক যিনি সত্য চিহ্নিত করতে

পারলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য চিহ্নিত করার পরও সত্য বিরোধী ফায়সালা দেয় সে জাহান্নামী। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই লোকদের মোকদ্দমার ফায়সালা করতে বসে যায় সেও জাহান্নামী।" [আবু দাউদঃ ২৫৭৩, তিরমিযীঃ ১৩২২, ইবনে মাজাহঃ ২৩১৫]

আয়াতে مع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ দাউদ আলাইহিস সালামের সাথে পাহাড় ও পাখীদেরকে অনুগত করা হয়েছিল এবং সে কারণে তারাও দাউদের সাথে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতো। একথাটিই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আমরা তার সাথে পাহাড়গুলোকে অনুগত করে দিয়েছিলাম। সকাল-সন্ধ্যা তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর সমবেত পাখিদেরকেও (অনুগত করা হয়েছিল)। তারা প্রত্যেকেই ছিল অধিক আল্লাহ অভিমুখী।" [সূরা সাদঃ ১৮, ১৯] অন্য সূরায় আরও অতিরিক্ত বলা হয়েছেঃ "পাহাড়গুলোকে আমরা হুকুম দিয়েছিলাম যে, তার সাথে সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করো এবং এই একই হুকুম পাখিদেরকেও দিয়েছিলাম।" [সূরা সাবাঃ ১০]

এ বক্তব্যগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, দাউদ যখন আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা গীতি গাইতেন তখন তার উচ্চতর ও সুরেলা আওয়াজে পাহাড় ও পাখিরা গেয়ে ফেলত এবং একটা অপূর্ব মূৰ্ছনার সৃষ্টি হতো। তিনি যখন যাবুর পাঠ করতেন, তখন পক্ষীকুল শূন্যে তার সাথে তসবীহ পাঠ করতে থাকত। [ইবন কাসীর] সমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মু'জেযা। মু'জেযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যেও বিশেষ চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবু মূসা আশা আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন।

একবার আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তার কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আওয়াজ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনেকক্ষণ শুনতে থাকলেন। তার পড়া শেষ হলে তিনি বললেনঃ "এ ব্যক্তি দাউদের সুরেলা কণ্ঠের একটা অংশ পেয়েছে।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫৯] আবু মুসা যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তিলাওয়াত শুনেছেন, তখন আরয করলেনঃ আপনি শুনছেন - একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। [ইবনে হিব্বানঃ ৭১৯৭, অনুরূপ মুসলিমঃ ৭৯৩] এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ কাম্য ও পছন্দনীয়।

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ

৮০. আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; কাজেই তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?

এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হেফাযতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছেঃ "আমরা দাউদের জন্যে লোহা নরম করে দিয়েছিলাম।" [সূরা সাবাঃ ১০] আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ আলাইহিস সালামকে শেখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেয়া হয়েছে যে, "যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে (সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাত থেকে) হেফাযত করে।" এই প্রয়োজন থেকে দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ

থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে কুরআন ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

সুতরাং এটা ছিল এমনই নিয়ামত যার কারণে মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাই তিনি বলেনঃ তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?"

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

৮১. আর সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; সেটা তার আদেশে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমরা প্রভূত কল্যাণ রেখেছি; আর প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমরাই সম্যক জ্ঞানী।

এ সম্পর্কে অন্যত্র আরো বিস্তারিত আলোচনা এসেছে, বলা হয়েছেঃ “আর সুলাইমানের জন্য আমরা বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত।” [সূরা সাবাঃ ১২] অন্যত্র আরও বলা হয়েছেঃ “কাজেই আমি তার জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুম সহজে চলাচল করতো যেদিকে সে যেতে চাইতো।” [সূরা সা'দঃ ৩৬] এ থেকে জানা যায় বাতাসকে সুলাইমানের হুকুমের এভাবে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে, তার রাজ্যের এক মাস দূরত্বের পথ পর্যন্ত যে কোন স্থানে তিনি সহজে সফর করতে পারতেন। যাওয়ার সময়ও সব সময় তার ইচ্ছা অনুযায়ী অনুকূল বাতাস পেতেন আবার ফেরার সময়ও।

আল্লাহ্ তাআলা যেমন দাউদ আলাইহিস সালাম এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তার আওয়াজের সাথে তসবীহ পাঠ করত, তেমনি সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুতে ভর করে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌছে যেতেন। তিনি বায়ুতে তার কাঠের বিছানা পাততেন। তারপর তাতে রাষ্ট্রের যত প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন ঘোড়া, উট, তাবু, সৈন্য-সামন্ত সবাই উঠানো হত। তারপর বাতাসকে বলা হত তা বহন করার জন্য। বাতাস তার নিচে ঢুকে তা বহন করে উঠিয়ে নিয়ে যেত। তখন তাদের উপরে পাখি ছায়া দিত, এভাবে তিনি যেখানে চাইতেন সেখানে নিয়ে যেত। যখন তিনি নামতেন তখন তার সাথে তার রাজকীয় সামগ্রী সবই থাকত।

যেখানে বরকত বা প্রভূত কল্যাণ রেখেছি বলে শাম দেশ তথা সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন এলাকাকেই বোঝানো হয়েছে। যার আলোচনা আগেই চলে গেছে।

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

৮২. আর শয়তানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এ ছাড়া অন্য কাজও করত; আর আমরা তাদের রক্ষাকারী ছিলাম।

অর্থাৎ আমরা সুলাইমানের জন্যে শয়তানের মধ্যে এমন কিছুসংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তার জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মনিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত; যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “তারা সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্যে বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মুর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড়

পেয়ালা তৈরী করত।” [সূরা সাবাঃ ১৩] সুলাইমান তাদেরকে অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন। অন্য আয়াতে এসেছে, “আর (অধীন করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তান (জিন) দেরকেও, এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরো অনেককে।” সূরা ছোয়াদ: ৩৭-৩৮]

ফুটনোট

- নূহ আঃ এর জাতি কথা উল্লেখ করে এখানে বলা হয়েছে- তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অন্য আয়াতে (সূরা আরাফে) তাদেরকে বলা হয়েছে- অন্ধ সম্প্রদায়।
- আল্লাহ তাআলাকে একনিষ্ঠভাবে আহ্বান করলে আল্লাহ তা ‘আলা আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন। যেমনিভাবে আল্লাহ্ নূহ আঃ এর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।
- অপরাধ করলে অবশ্যই তার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।
- নাবীদের অবাধ্যতা, আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি ভয়াবহ।
- দাউদ ও সুলাইমান (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা ‘আলার অনুগ্রহের কথা আলোচ্য আয়াতগুলোতে উল্লেখ রয়েছে।
    - দুইজনকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছেন।
    - আর পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের আঃ অনুগত করে দিয়েছিলেন,
    - দাউদ আঃ কে আরো দিয়েছেন বর্ম নির্মাণ শিক্ষা।
    - সুলাইমান আঃ এর বশীভূত করে দিয়েছিলেন প্রবল বায়ুকে; সেটা তার আদেশে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আল্লাহ্ প্রভূত কল্যাণ রেখেছি।
    - শয়তানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সুলাইমানের আঃ জন্য ডুবুরীর কাজ করত,

* বিচারক কোন বিষয়ে ফায়সালা করতে গিয়ে সঠিকতায় পৌঁছার জন্য ইজতিহাদ করার পরেও ভুল করলে একটি নেকী পাবেন।
* জ্ঞান-বুদ্ধির দিক থেকে ছেলে বাপের চেয়েও বড় হতে পারে।
* দাউদ (আঃ) সর্বপ্রথম পৃথিবীতে বর্ম তৈরি করেন।
* সুলাইমান আঃ এর পিতা ছিলেন দাউদ আঃ।
* বর্ম সুতীক্ষ তরবারির আঘাত থেকে হেফাযত করে। এর প্রয়োজন থেকে দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন।

* সকল ধরনের নিয়ামতের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

* যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত।

* নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে কুরআন ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৮

সূরা আম্বিয়া ৮৩-৯৩

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

৮৩. আর স্মরণ করুন আইয়ুবকে, যখন তিনি তার রবকে ডেকে বলেছিলেন, আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!

কুরআন থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোআ করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবাই উধাও হয়ে গিয়েছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহর নবী আইয়ুব আলাইহিস সালাম আঠারো বছর মুসীবত ভোগ করেছিলেন। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাকে তার ভাই বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে দু'জন ব্যতীত সবাই ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। এ দু'জন সকাল বিকাল তার কাছে আসত।

তাদের একজন অপরজনকে বললঃ জেনে নাও আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আইয়ুব এমন কোন গোনাহ করেছে যার মত গোনাহ সৃষ্টিজগতের কেউ করেনি। তার সাথী বললঃ এটা কেন বললে? জবাবে সে বললঃ আঠারো বছর থেকে সে এমন কঠিন রোগে ভুগছে অথচ আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে তা থেকে মুক্তি দিচ্ছে না। এ কথা শোনার পর সাথীটি আইয়ুব আলাইহিস সালামের সাথে দেখা করতে গিয়ে ব্যথিত হয়ে কথাটি তাকে জানিয়ে দিল। তখন আইয়ুব আলাইহিস সালাম তাকে বললেনঃ আমি জানি না তুমি কি বলছ, তবে আল্লাহ্ জানেন পূর্বে আমি কখনও কখনও ঝগড়ায় লিপ্ত দু'জনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এটাও শুনতাম যে, তারা আল্লাহর কথা বলে বলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। তখন আমি বাড়ী ফিরে তাদের পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় করতাম এই ভয়ে যে, তারা হক ছাড়া অন্য কোন ভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনি তো?

ঘটনা বর্ণনা করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আইয়ুব আলাইহিস সালাম তার প্রাকৃতিক কাজ সারতে বের হতেন। কাজ সারার পর তার স্ত্রী তার হাত ধরে নিয়ে আসতেন। একদিন তিনি তাঁর প্রাকৃতিক কাজ সারার পর তার স্ত্রীর কাছে ফিরতে দেরী করছিলেন এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ুব আলাইহিস সালামের কাছে ওহী পাঠালেন যে, "আপনি আপনার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করুন, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।" [সূরা সোয়াদ: ৪২]

তার স্ত্রী তার আগমনে দেরী দেখে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার কাছে পৌছলেন। তখন আইয়ুব আলাইহিস সালামের যাবতীয় মুসিবত দূর হয়ে তিনি পূর্বের ন্যায় সুন্দর হয়ে গেলেন। তার স্ত্রী তাকে দেখে বললেনঃ হে মানুষ! আল্লাহ আপনার উপর বরকত দিন, আপনি কি ঐ বিপদগ্রস্ত আল্লাহর নবীকে দেখেছেন? আল্লাহর শপথ, যখন সে সুস্থ ছিল তখন সে ছিল আপনার মতই দেখতে। তখন আইয়ুব আলাইহিস সালাম বললেন যে, আমিই সেই ব্যক্তি। আইয়ুব আলাইহিস সালামের দুটি উঠান ছিল। একটি গম শুকানোর অপরটি যব শুকানোর। আল্লাহ্ তা'আলা সে দু'টির উপর দুখণ্ড মেঘ পাঠালেন। এক খণ্ড মেঘ সে গমের উঠোনে এমনভাবে স্বর্ণ ফেললো যে, সেটি পূর্ণ হয়ে

গেল। অপর মেঘ খণ্ডটি সেটির উপর এমনভাবে রৌপ্য বর্ষণ করল যে, সেটাও পূর্ণ হয়ে গেল। [সহীহ ইবন হিব্বান: ৭/১৫৭, হাদীস নং ২৮৯৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬৩৫, ৪১১৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একবার আইয়ুব আলাইহিস সালাম কাপড় খুলে গোসল করছিলেন, এমতাবস্থায় এক ঝাক স্বর্ণের টিডিড (পঙ্গপাল) তার উপর পড়তে আরম্ভ করল, তিনি সেগুলো মুঠি মুঠি তার কাপড়ে জমা করছিলেন। তখন তার প্রভু তাকে ডেকে বললেনঃ হে আইয়ুব, আমি কি আপনাকে যা দেখছেন তা থেকেও বেশী প্রদান করে ধনী করে দেইনি? উত্তরে আইয়ুব আলাইহিস সালাম বললেনঃ অবশ্যই হে প্রভু! তবে আপনার দেয়া বরকত থেকে আমি কখনো অমুখাপেক্ষী হবো না। [বুখারী: ৩৩৯১, ২৭৯] এ ছাড়া আইয়ুব আলাইহিস সালাম সংক্রান্ত আরো কিছু কাহিনী বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে এসেছে কিন্তু সেগুলো খুব বেশী গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি বিধায় এখানে উল্লেখ করা গেল না।

দোয়ার ধরন অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! সংক্ষিপ্ত বাক্যের সাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন- "তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" পরে কেন অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোন জিনিসের দাবী নেই। দোয়ার এই ভংগিমা যে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন চিত্রটি তুলে ধরে তা হচ্ছে এই যে, কোন পরম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি দিনের পর দিন অনাহার ক্লিষ্টতার দুঃসহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে কোন পরমদাতা ও দয়ালু ব্যক্তির সামনে কেবলমাত্র এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়, "আমি অনাহারে আছি এবং আপনি বড়ই দানশীল।" এরপর সে আর মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

৮৪. অতঃপর আমরা তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম, তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং আরো দিলাম তাদের সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ, আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

পবিত্র কুরআনে আইয়ুব (আঃ)-কে ধৈর্যশীল বলা হয়েছে। (সূরা স্বাদঃ ৪৪) এর অর্থ, তাঁকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল, যাতে তিনি ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা করতে ছাড়েননি। এই পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট কি ধরনের ছিল তার কোন প্রামাণিক বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও কুরআনের বর্ণনা হতে বুঝতে পারা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ধন-দৌলত, সন্তানাদি দান করেছিলেন। অতঃপর পরীক্ষা স্বরূপ তিনি এক সময় তাঁর কাছ হতে সমস্ত কিছু কেড়ে নিলেন। এমনকি তিনি শারীরিক সুস্থতা থেকেও বঞ্চিত হলেন এবং নানান রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। কথিত আছে যে, আঠারো বছর দীর্ঘ পরীক্ষার পর তিনি আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং সুস্থতার সাথে সাথে ধন-দৌলত ও সন্তানাদি দ্বিগুণ দান করলেন। বিপদে আপত্তি, অভিযোগ ও অনুযোগ করা এবং ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করা ধৈর্যের পরিপন্থী। আর এ সকল কাজ আইয়ুব (আঃ) কখনও করেননি। অবশ্য মুক্তি প্রার্থনা ধৈর্যের পরিপন্থী নয়। সেই কারণে আল্লাহ তাআলা তার জন্য "আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) তে বলেন যে, ঐ লোকদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। কারো কারো ধারণামতে তার স্ত্রীর নাম ছিল রহমত। এই

উক্তি যদি এই আয়াত দ্বারা বুঝা হয়ে থাকে তবে তো এটা বহু দূরের বিষয়। আর যদি আহলে কিতাব হতে নেয়া হয়ে থাকে তবে এটা সত্য বা মিথ্যা কোনটাই বলা যাবে না। ইবনু আসাকির (রাঃ) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আইয়ুবের (আঃ) স্ত্রীর নাম বলেছেনঃ লাইয়া। তিনি হলেন লাইয়া বিতে মীশা ইবনু ইউসুফ ইবনু ইয়াকূব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (আঃ)। একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত লাইয়া ছিলেন হযরত ইয়াকুবের (আঃ) কন্যা এবং হযরত আইয়ুবের (আঃ) স্ত্রী। তিনি হযরত আইয়ুবের (আঃ) সাথে সানিয়া নামক স্থানে ছিলেন।

হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেন যে, তাকে বলা হয়ঃ "হে আইয়ূব (আঃ)! তোমার আহ্ল (পরিবার পরিজন) সব জান্নাতী। তুমি যদি চাও তবে তাদের সবাইকে দুনিয়ায় এনে দিই, আর যদি চাও তবে তাদেরকে তোমার জন্যে জান্নাতেই রেখে দিই এবং প্রতিদান হিসেবে দুনিয়ায় তোমার তাদের অনুরূপ প্রদান করি।" তিনি বললেনঃ 'না, বরং তাদেরকে জান্নাতেই রেখে দিন। তখন তাদেরকে জান্নাতেই রেখে দেয়া হয় এবং দুনিয়ায় তাঁকে তাদের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা ছিল আমার বিশেষ রহমত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। এসব কিছু এজন্যেই হলো যে, বিপদে পতিত ব্যক্তিরা যেন হযরত আইয়ুবের (আঃ) নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ধৈর্য হারা হয়ে যেন অকৃতজ্ঞ না হয়ে যায়। আর লোকেরা তাদেরকে খারাপ বান্দা বলে ধারনা না করে। হযরত আইয়ূব (আঃ) ছিলেন ধৈর্যের পর্বত স্বরূপ এবং স্থিরতার নুমনা ছিলেন। আল্লাহর তাকদীরের লিখন ও তাঁর পরীক্ষার উপর মানুষের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। এতে যে তাঁর কি হিকমত বা রহস্য নিহিত রয়েছে তা মানুষের জানা নেই।

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ

৮৫. এবং স্মরণ করুন ইসমাঈল, ইদরীসও যুলকিফলকে, তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ

৮৬. আর আমরা তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে প্রবেশ করালাম; তারা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিন জন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ইসমাঈল ও ইদরীস যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কুরআনে তাদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয় জন হচ্ছেন। যুলকিফল। ইবনে কাসীর বলেনঃ তার নাম দু'জন নবীর সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি নবীদের কাতারভুক্ত ছিলেন না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। তবে সঠিক মত হলো এই যে, তিনি নবী ও রাসূলই ছিলেন। তার সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য জানা যায় না। আর আল্লাহই ভালো জানেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ও শ্রেষ্ঠ বান্দাদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা 'আলার বাণী: "স্মরণ কর! ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুল-কিফলের কথা, তারাও প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা স্ব-দ ৩৮:৪৮)

এখানে নবীদের একটা গুণ পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে যে, তারা সবরকারী। কুরআনে অন্যান্য আয়াতে বিভিন্ন নবীদের এই গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। কখনো কখনো নবী ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কখনো তাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করা হয়েছে। নবুয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য এই গুণাবলী অতি গুরুত্বপূর্ণ। মুমিন তার জীবনে ভারসাম্যপূর্ণ ও সফল হিসাবে গড় তুলতে হলে অবশ্যই অবশ্যই এই গুণাবলী অর্জন করতে হবে। এবং সেই তাকিদই কুরআনে বারবার দেওয়া হয়েছে।

পরের আয়াত নবীদের আরেকটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হলো- তারা প্রত্যকেই ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ। কুরআনে বারবার সৎকাজ করারও জন্য মুমিনদের তাকিদ দেওয়া হয়েছে।

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

৮৭. আর স্মরণ করুন, যুন-নূনকে, যখন তিনি ক্রোধ ভরে চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না। তারপর তিনি অন্ধকারে এ আহবান করেছিলেন যে, আপনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই; আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান, নিশ্চয়ই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি!

ইউনুস ইবনে মাত্তা আলাইহিস সালাম এর কাহিনী পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুস, সূরা আল-আম্বিয়া, সূরা আস-সাফফাত ও সূরা আল-কালামে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তার আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও যুন-নুন এবং কোথাও ছাহেবুল হূত উল্লেখ করা হয়েছে। নুন ও হূত উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নুন ও সাহেবুল হুতের অর্থ মাছওয়ালা। ইউনুস আলাইহিস সালামকে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে যুন-নুন বা ছাহেবুল হূত শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন তাফসীরে এসেছে যে, ইউনুস আলাইহিস সালামকে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়াতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্ম করার দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস আলাইহিস সালাম তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আযাবের ভয় দেখিয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে এখন আযাব এসেই যাবে। (কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল) তাই অনতিবিলম্বে তারা শির্ক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মা দের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের খাঁটি তাওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এদিকে ইউনুস আলাইহিস সালাম ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তার সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তার সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এর ফলে ইউনুস আলাইহিস সালাম এর প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন।

পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহন করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলে ঘটনাক্রমে এখানে ইউনুস আলাইহিস সালাম এর নাম বের হল। এই লটারীর কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে "লটারীর ব্যবস্থা করা হলে তার (ইউনুস আলাইহিস সালাম এর) নামই তাতে বের হয়।" [সূরা আস-সাফফাতঃ ১৪১] তখন ইউনুস আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস আলাইহিস সালাম-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস আলাইহিস সালাম এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয় সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্যে তার কয়েদখানা।

ঐ অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে হযরত ইউনুস (আঃ) মহান আল্লাহকে ডাকতে শুরু করেন। সেখানে সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার এবং রাত্রির অন্ধকার এই তিন অন্ধকার একত্রিত হয়েছিল। তিনি সমুদ্রের তলদেশের কংকর গুলির তাসবীহ পাঠ শুনে নিজেও তাসবীহ পাঠ করতে শুরু করেন। তিনি মাছের পেটে গিয়ে প্রথমতঃ মনে করে ছিলেন যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর তিনি পা নাড়িয়ে দেখেন এবং তা নড়ে ওঠে। সুতরাং মাছের পেটের মধ্যেই তিনি সিজদায় পড়ে যান এবং বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন এক জায়গাকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছি। যে, সতঃ কেউই এই জায়গাকে ইতিপূর্বে সিজদার জায়গা বানায় নাই।

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ) চল্লিশ দিন মাছের পেটে ছিলেন। তাফসীরে ইবনু জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআলা যখন হযরত ইউনুসকে (আঃ) বন্দী করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি মাছকে নির্দেশ দেনঃ "তুমি তাকে গিলে নাও, কিন্তু তার মাংস ভক্ষণ করো না এবং অস্থিও ভেঙ্গে ফেলো না।" যখন তিনি সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছেন তখন সেখানে তাসবীহ পাঠ শুনে তিনি হতবাক হয়ে যান। ওয়াহীর মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এটা হলো সমুদ্রের জন্তু গুলির তাসবীহ পাঠ। তখন তিনিও আল্লাহর তাসবীহ পাঠ শুরু করে দেন। তার তাসবীহ পাঠ শুনে ফেরেশতারা বলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! এটা খুবই দুরের শব্দ এবং খুবই দুর্বল অওয়ায, কার আওয়ায এটা? আমরা তে বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তরে বললেনঃ "এটা আমার বান্দা ইউনুসের (আঃ) শব্দ। সে আমার নাফরমানী করেছে বলে আমি তাকে মাছের পেটে বন্দী করেছি।"

ফেরেশতারা তখন বললেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! তার নেক আমলগুলি তো দিনরাত্রির সব সময় আকাশে উঠতেই থাকতো।?" উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "হা।" তখন তারা তার জন্যে সুপারিশ করেন। আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবূল করেন। তিনি মাছকে নির্দের্শ দেন যে, সে যেন তাঁকে সমুদ্রের তীরে উগলিয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ অর্থাৎ "অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।" (৩৭:১৪৫) উপরে বর্ণিত রিওয়াইয়াতটির ঐ একটি মাত্র সনদ।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন- এই কালেমাটির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন তখন এই কালেমাটি আরূশের চারদিকে ঘুরতে থাকে। তখন ফেরেশতারা বলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! এটা তো খুবই দূরের শব্দ। কিন্তু কান এ শব্দের সাথে পরিচিত। এটা অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষীণ শব্দ!" আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এটা কার শব্দ তা কি তোমরা জান না?" উত্তরে তারা বলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! না তো! কে তিনি?" আল্লাহ তাআলা তখন বলেনঃ "এটা হলো আমার বান্দা ইউনুসের (আঃ) শব্দ। ফেরেশতারা তখন বলেনঃ "তা হলে তিনি তো সেই ইউনস (আঃ} যার ককূলকৃত পবিত্র আমল প্রত্যেক দিন আপনার নিকট উঠে আসতো এবং যার প্রার্থনা আপনি ককূল করতেন! হে আমাদের প্রতিপালক! তিনি যখন সুখের সময় ভাল আমল করতেন তখন এই বিপদের সময় আপনি তার প্রতি দয়া করুন!" তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলা মাছকে হুকুম করলেন যে, সে যেন কোন কষ্ট না দিয়েই তাকে সমুদ্রের তীরে নিক্ষেপ করে। (এ হাদীসটি ইবনু আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করলাম দুশ্চিন্তা হতে। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। সে বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে যখন আমাকে আহবান করলো, আমি তখন তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং ঐ বিপদ থেকে তাকে মুক্তি দান করলাম।

বিশেষ করে যারা বিপদ আপদের সময় এই দুআয়ে ইউনুস (আঃ) পাঠ করে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ঐ সব বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করে থাকেন। এ ব্যাপারে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পক্ষ হতে খুবই উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

হযরত সা'দ ইবনু আবি অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি মসজিদে হযরত উছমান ইবনু আফানের (রাঃ) নিকট গমন করি। আমি তাকে সালাম করি। তিনি আমাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন, কিন্তু আমার সালামের জবাব দিলেন না। আমি তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনু খাত্তাবের (রাঃ) নিকট গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি। তিনি হযরত উছমানকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বলেনঃ "আপনি আপনার এই মুসলমান ভাই-এর সালামের জবাব দেন নাই কেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি এরূপ করি নাই (অর্থাৎ তিনি আমার কাছে আসেন নাই এবং সালামও দেন নাই।" আমি। বললামঃ হাঁ (অর্থাৎ আমি এসেছি ও সালাম দিয়েছি)। শেষ পর্যন্ত তিনি শপথ করলেন এবং আমিও শপথ করলাম। তারপর কি মনে করে তিনি বললেনঃ "আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার কাছে তাওবা করছি। অবশ্যই ইতিপূর্বে আমার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় আমি মনে মনে ঐকথা বলছিলাম যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে শুনেছিলাম। আল্লাহর শপথ! যখন আমার ঐ কথা মনে হয়ে যায় তখন শুধু আমার চোখের উপরই পর্দা পড়ে না, বরং আমার অন্তরের উপরও পর্দা পড়ে যায়। আমি তখন বললামঃ আমি আপনাকে ঐ খবর দিচ্ছি। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সামনে প্রথম দুআ'র বর্ণনা দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) কথার মোড় নিজের দিকে ফিরিয়ে নেন। এভাবে অনেক্ষণ কেটে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখান থেকে উঠে পড়েন এবং নিজের বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করেন। আমিও তার পিছনে পিছনে চলতে থাকি। যখন তিনি বাড়ীর কাছাকাছি হয়ে যান তখন আমি আশংকা করি যে, তিনি হয়তো বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবেন, আর আমি এখানেই রয়ে যাবো। সুতরাং আমি জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলাম। আমার জুতার শব্দ শুনে তিনি আমার দিকে ফিরে তাকান এবং বলেনঃ "আরে, তুমি আবু ইসহাক?" আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাঁ, আমিই বটে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “খবর কি?” আমি জবাব দিলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি প্রথম দুআ’র বর্ণনা দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ বেদুঈন এসে পড়েছিল এবং আপনার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তিনি আমার একথা শুনে বললেনঃ “হ্যাঁ, হ্যাঁ।” ওটা ছিল যুন নূনের (আঃ) দুআ যা তিনি মাছের পেটের মধ্যে থাকা অবস্থায় করেছিলেন। এই দুআ’টি। জেনে রেখো যে, যে কোন মুসলমান যে কোন ব্যাপারে যখনই তার প্রতিপালকের কাছে এই দুআ’টি করবে, তিনি তা কবূল করবেন।” (এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন)

হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে কেউই হযরত ইউনুসের (আঃ) এই দুআ’র মাধ্যমে দুআ করবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার দুআ কবূল করবেন।” (এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে) হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতেই এরপরেই রয়েছেঃ “এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।”

হযরত সা'দ ইবনু আবি অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ “আল্লাহ তাআলার ঐ নামটি যার মাধ্যমে তাঁকে ডাকলে তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন এবং কিছু চাইলে প্রদান করে থাকেন তা হলো হযরত ইউনুস ইবনু মাত্তার (আঃ) দুআটি।” হযরত সাদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি হযরত ইউনুসের (আঃ) জন্যে বিশিষ্ট ছিল, না সমস্ত মুসলমানের জন্যেই সাধারণ?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “তুমি কি কুরআন কারীমে পড় নাই যে, তাতে রয়েছেঃ “আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম ও তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করে ছিলাম এবং এভাবেই আম মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।” সুতরাং যে কেউই এই দুআ করবে আল্লাহ তা কবূল করার ওয়াদা করেছেন।” (এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

৮৮. তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করেছিলাম, আর এভাবেই আমরা মুমিনদের উদ্ধার করে থাকি।

আল্লাহ তা’আলা বলেন: যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। (সূরা সাফফাত ১৪৩-১৪৪)।

অর্থাৎ যদি মাছের পেটে যাওয়ার পূর্ব থেকেই তাঁর অধিক ইবাদত ও সৎ আমল না থাকত এবং মাছের পেটে যাওয়ার পর তাওবাহ ইস্তিগফার ও তাসবীহ পাঠ না করত তাহলে মাছের পেটেই থেকে যেতো, সেখানেই তার কবর হতো এবং সেখান হতেই কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান হতো। তাওবাহ-ইস্তিগফার ও তাসবীহ দ্বারা বিপদাপদ দূর হয় এবং তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তিনি মাছের পেটে থাকাবস্থায় বিশেষভাবে এ কালেমা পাঠ করতেন- لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ ‘তুমি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা‘বূদ নেই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।’ (সূরা আম্বিয়া ২১:৮৭)

তাঁর অধিক পরিমাণ ইবাদত ও সৎ আমল এবং তাওবা ইস্তিগফারের ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর তাওবা কবূল করত মাছের পেট থেকে জীবিত অবস্থায় নদীর তীরে তরুলতাহীন শূন্য এলাকায় রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

তখন ইউনুস (আঃ) স্বাভাবিকভাবেই রুগ্ন ছিলেন। ঐ অবস্থায় সেখানে উদ্গত লাউ জাতীয় গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন যা পুষ্টিসমৃদ্ধ ছিল। কোন বর্ণনাতে লাউ গাছের কথা উল্লেখ রয়েছে। ছায়া ও অন্যান্য উপকার নেয়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা বিপদ থেকে তাঁকে মুক্ত করেন। সূরা সফফাতের ১৩৯-১৪৮ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। (فَظَنَّ لَنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ) "সে মনে করেছিল আমি তার প্রতি সংকীর্ণতা করব না।" এর দুটি অর্থ হতে পারে, দুটিই সঠিক ১. ইউনুস (আঃ) ধারণা করেছিলেন তাঁর প্রতি মাছের পেটের ভিতরে আল্লাহ ত'আলা সংকীর্ণতা সৃষ্টি করবেন না। ২. অথবা আল্লাহ তা 'আলা তাঁর ওপর শাস্তির ফয়সালা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর ক্ষমতা রাখেন না বা পাকড়াও করতে পারবেন না এমন ব্যাখ্যা করা ভুল, কারণ কোন নাবীরই আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এমন ধারণা থাকতে পারে না।

সুতরাং দীনের পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে অধৈর্য হওয়া যাবে না, বরং সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে হবে। তবে কেউ বিপদে পড়লে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে উদ্ধার করবেন। কারণ শেষ আয়াতে মু'মিনদেরকে সে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

৮৯. আর স্মরণ করুন যাকারিয়্যাকে, যখন তিনি তার রবকে ডেকে বলেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রেখে দিবেন না, আপনি তো শ্রেষ্ঠ ওয়ারিশ।

উক্ত আয়াতগুলোতে যাকারিয়া (আঃ)-এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি, স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা। তিনি মারা গেলে নবুওয়াতের কোন উত্তরাধিকার থাকবে না। তাই আল্লাহ তা 'আলার কাছে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ তা 'আলা আমাকে নির্বংশ করো না, আমার একজন বংশধর দান করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "সে বলেছিল, 'হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি। 'আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী, 'যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকূবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে কর সন্তোষভাজন' ।" (সূরা মারইয়াম ১৯:৪-৬)

"সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী আপনিই" মানে হচ্ছে, সন্তান না দিলে কোন দুঃখ নেই। আপনার পবিত্র সত্তা-উত্তরাধিকারী হবার জন্য যথেষ্ট। কারণ আমার জানা আছে যে, আপনারা দ্বীনের জন্য আপনি কাউকে না কাউকে মনোনীত করবেন। যিনি আপনার দ্বীনকে সঠিকভাবে প্রচার করতে পারবে।

যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোআ করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে এটাও বলেছিলেন যে, পুত্র পাই বা না পাই; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ। এটা নবীসূলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন বৈ নয়। আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, ওয়ারিশ বানানোর মালিক তো আপনিই। আপনিই

তো দিতে পারেন। আপনার দ্বীন কখনও ধ্বংস হবে। না। কিন্তু আমার ইচ্ছা আমার বংশ এ ফযীলত থেকে বঞ্চিত না হউক।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

৯০. অতঃপর আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া, আর তার জন্য তার স্ত্রীকে (গর্ভধারণের) যোগ্য করেছিলাম তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর তারা আমাদেরকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমাদের নিকট ভীত-অবনত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবূল করে ইয়াহইয়া (আঃ) কে সন্তান হিসেবে দান করলেন। যাকারিয়া (আঃ) এর স্ত্রী যে বন্ধ্যা ছিলেন এবং বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার কারণে সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে গেছেন তা দূর করে সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা দিয়ে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো। তারা আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা তাঁর এক ভাষণে বলেনঃ "হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে থাকা, পূর্ণভাবে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, লোভ ও ভয়ের সাথে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনায় বিনয় প্রকাশ করার উপদেশ দিচ্ছি। দেখো, আল্লাহ তাআলা হযরত যাকারিয়্যার (আঃ) পরিবারের লোকদের এই ফযীলতই বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি- এই আয়াতাংশ টুকু পাঠ করেন।

'তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে' দু'আ কবূলের জন্য এ সকল গুণের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। কারণ দু'আ কবূলের অন্যতম উপায় হল বেশি বেশি সৎ আমল করা, আল্লাহ তা'আলার কাছে বিনীত হওয়া, কাকুতি-মিনতিসহ প্রার্থনা করা। আশা ও ভয় উভয়টাসহ তাঁকে ডাকা। এ সর্ম্পকে সূরা মারইয়ামের ২ নং থেকে ১৫ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ

৯১. এবং স্মরণ করুন সে নারীকে, যে নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমরা আমাদের রূহ ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম সৃষ্টিজগতের জন্য এক নিদর্শন।

কুরআন কারীমে প্রায়ই হযরত যাকারিয়া (আঃ) ও হযরত ইয়াহইয়ার (আঃ) ঘটনার সাথে সাথেই হযরত মারইয়াম (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে পুরোপুরি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে। হযরত যাকারিয়্যা (আঃ) পূর্ণ বার্ধক্যে পদার্পণ করেছিলেন এবং তার স্ত্রীও ছিলেন বন্ধ্যা। আর তিনিও বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সন্তান দান করেছিলেন। মহান

আল্লাহ নিজের এই ক্ষমতা প্রদর্শনের পর স্বামী ছাড়াই শুধু স্ত্রী লোককে সন্তান দান করে তিনি নিজের আর এক ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। সরায়ে আল-ইমরান ও সুরায়ে মারইয়ামেও এই শ্রেণী বিন্যাসই রয়েছে।

এখানে যেভাবে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথা বলা হলো অন্যত্র তদ্রুপ আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও এসেছে, যেমন বলা হয়েছেঃ "আমি মাটি থেকে একটি মানুষ তৈরী করছি। কাজেই যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে তৈরী করে নেবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেবো। তখন (হে ফেরেশতারা!) তোমরা তার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে যাবে।" [সূরা সাদঃ ৭১-৭২] আদম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথা যেভাবে বলা হয়েছে তেমনিভাবে ঈসা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ "আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালেমা, যা মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তার পক্ষ থেকে একটি রূহ।" [সূরা আন-নিসাঃ ১৭১] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আর ইমরানের মেয়ে মারইয়াম, যে নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছিল, কাজেই ফুঁকে দিলাম আমরা তার মধ্যে আমাদের রূহ।" [সূরা আত-তাহরীমঃ ১২] এ সংগে এ বিষয়টিও সামনে থাকা দরকার যে, মহান আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম ও আদমের আলাইহিস সালামের জন্মকে পরস্পরের সদৃশ গণ্য করেন। তাই অন্য সূরায় আল্লাহ বলেনঃ "ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে আদমের মতো, যাকে আল্লাহ মাটি থেকে তৈরী করেন তারপর বলেন, "হয়ে যাও" এবং সে হয়ে যায়। [সূরা আলে ইমরানঃ ৫৯] এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে একথা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক সৃষ্টি পদ্ধতির পরিবর্তে যখন আল্লাহ কাউকে নিজের হুকুমের সাহায্যে অস্তিত্বশীল করে জীবন দান করেন তখন একে "নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছি" শব্দাবলীর সাহায্যে বিবৃত করেন। এ রূহের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সম্ভবত এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফুঁকে দেয়াটা অলৌকিক ধরনের। ফলে সম্মানসূচক এ রূহকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের বলে সম্পর্কিত করেছেন, এটি সৃষ্ট রূহ।

আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে (মাইরাম আঃ) ও তার পুত্রকে (ইসা আঃ) করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্যে এক নিদর্শন। যাতে বিশ্ববাসী আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রকারের ক্ষমতা, সৃষ্টি কৌশলের ব্যাপক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর কুদরতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

৯২. নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি—এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর।

পূর্বের আয়াতগুলোতে বিভিন্ন নাবীদের কথা আল্লাহ ত'আলা নিয়ে এসে নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উত্তম পন্থায় ও মর্যাদার সাথে স্মরণ করতে বলেছেন। কারণ এসব নাবীদেরকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন তাওহীদের দিকে স্বজাতিকে আহ্বান করার জন্য। সে সাথে তাদেরকে হিকমত, জ্ঞান ও অনেক নিয়ামত দান করেছিলেন। তারা যখন বিপদে পড়েছেন তখন আল্লাহ তা'আলাকে আহ্বান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। সুতরাং হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তুমি দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সাহায্য করবেন।

এখানে “তোমরা” শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে সমস্ত মানুষকে। এখানে ‘উম্মাহ’ (উম্মত বা জাতি) বলতে দ্বীন ও ধর্মকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, হে মানবজাতি! তোমরা সবাই আসলে একই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। । আর তা হল তাওহীদ (একতত্ত্ববাদ, অদ্বিতীয়বাদ বা একেশ্বরবাদের) ধর্ম; যার প্রতি সকল আম্বিয়া মানুষকে আহবান করেছেন এবং মিল্লাত হল মিল্লাতে ইসলাম যা ছিল সকল আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)-দের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ)। যেমন নবী (সাঃ) বলেছেন, “আমরা নবীর দল আপোসে বৈমাত্রেয় ভাই (সকলের পিতা এক, মা পৃথক পৃথক); আমাদের দ্বীন একই। পরবর্তীকালে যতগুলো ধর্ম তৈরী হয়েছে সবগুলোই এ দ্বীনেরই বিকৃত রূপ। অন্যত্র রাসূলদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, “আর আপনাদের এ যে জাতি এ তো একই জাতি এবং আমিই আপনাদের রব; অতএব আমার তাকওয়া অবলম্বন করুন।” [সূরা আল-মুমিনুনঃ ৫২] সুতরাং যে রাসূলদের কথা বলা হলো, তারা তোমাদের নেতা, তোমাদেরকে তাদেরই অনুসরণ করতে হবে, তাদের হেদায়াতই তোমাদের জন্য পাথেয়। তারা সবাই একই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের পথ একটিই, তাদের রবও একজনই।

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

৯৩. কিন্তু তারা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।

মানুষের তাওহীদের পথ থেকে সরে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল, রাসূলদের নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করল। একদল মুশরিক হয়ে গেল, আরেক দল কাফির হয়ে গেল। আজ মুসলিমরাও এমন চক্রে পড়ে বিবিধ দলে বিভক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, সুতরাং সকলকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর কাছে কর্মের হিসাব দিতে হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সৎ আমল করবে তার আমল অস্বীকার করা হবে না। বরং যথার্থ প্রতিদান দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী: “যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে আমি তার শ্রমফল নষ্ট করি না যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে।” (সূরা কাহ্ফ ১৮:৩০)

ফুটনোট

আলোচ্য আয়াতগুলোতে তিনজন নবীর দোয়া কবুলের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

- অসুস্থ অবস্থা আইয়ুব আঃ দোয়া করেছিলেন- أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!
- বিপদে পড়ে ইউনুস আঃ দোয়া করেছিলেন- أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!
- সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়া আঃ দোয়া করেছিলেন- رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ - হে আমার রব! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রেখে দিবেন না, আপনি তো শ্রেষ্ঠ ওয়ারিশ।

এই দোয়াগুলো আল্লাহ্‌র বাব্বুল আমাদের জন্যও শিক্ষনীয় করে দেখে দিয়েছেন যাতে আমরা দোয়া করতে পারি।

৮৩-৮৪ আয়াতে উল্লেখিত আইয়ুব আঃ এর ঘটনা থেকে যে শিক্ষা আমরা পাই-

* বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে। অধৈর্য হয়ে নিরাশ হওয়া যাবে না।
* ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেন।
* প্রকৃত স্ত্রী তিনিই যিনি সর্বাবস্থায় নেককার স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। আইয়ূব আঃ -এর স্ত্রী ছিলেন বিশ্বের পুণ্যবতী মহিলাদের শীর্ষস্থানীয় দৃষ্টান্ত।
* অসুস্থতা দিয়ে নবীদের পরীক্ষা করা হয়েছে। আমাদেরও অসুস্থতা দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। ধৈর্য্যধারণের মাধ্যমেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
* যখন আপনি সর্বস্বও হারাবেন তবুও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ধৈর্য্য রাখুন এবং শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হবেন না। শয়তান আইয়ুব (আঃ) কে আল্লাহর ইবাদত বন্ধ করতে বা তাকে সবকিছু ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আইয়ূব আঃ ধৈর্য ধরেছিলেন এবং আল্লাহর ইবাদত করেছিলেন।
* আপনি যখন কষ্টে থাকবেন, আল্লাহ আপনাকে অতীতে যে সব ভাল অফুরন্ত নিয়ামত অতীতে দিয়েছিলেন তা মনে রাখবেন। সেগুলোর জন্য সব সময় কৃতজ্ঞ থাকবেন এমনকি কষ্টের সময়ও। আইয়ুব (আঃ) আল্লাহর কাছে তার আরোগ্য কামনা করতে লজ্জিত বোধ করেছিলেন কারণ তিনি এত বছর সুখে এবং খুব কম কষ্টে কাটিয়েছিলেন। তিনি তার অতীতের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন।
* অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা উর্ত্তীণ হওয়া ফলে আল্লাহ্ রাব্বুল পুরস্কারে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন। যেমন- আইয়ূব আঃ কে সুস্থতা দিলেন, পরিবারকে ফিরিয়ে দিলেন, কয়েকগুণ সম্পদ বাড়িয়ে দিলেন এবং এই ঘটনা মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত করে রাখলেন।

৮৫-৮৬ আয়াত

* যুল-কিফল (আঃ) একজন নাবী, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াত দিয়েছেন।
* সৎ বান্দাদেরকে সর্বদা আল্লাহ তা'আলা রহম করে থাকেন।
* তিনজন নবী পরিচয় দেওয়া হচ্ছে যে তারা ছিলেন- ধৈর্য্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ

৮৭-৮৮ আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

* কোন অবস্থাতেই অধৈর্য হওয়া যাবে না, ধৈর্যধারণ করে যা অর্জন সম্ভব ধৈর্যহারা হয়ে তা সম্ভব নয়।
* যেকোন কঠিন মুহূর্তে কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইতে হবে।
* কাজ করার পর আফসোস করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা উচিত।
* নেক নিয়তে বিপদগ্রস্ত অবস্থায়- (لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ) এ দু'আ পড়লে আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দেন।
* যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আস্থাশীল তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাহায্য করবেন।
* আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন কাজ করা উচিত নয়। ইউনুস (আঃ) আল্লাহকে অনুমতি ছাড়া শহরের বাহিরে চলে গিয়েছিলেন।
* আল্লাহ সব করতে পারেন। তিনি ইউনুস (আঃ) কে কিয়ামত পর্যন্ত তিমির পেটে রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, কিন্তু আন্তরিক তাওবাহের কারণে তাকে ক্ষমা করা হয়েছিল। আল্লাহও আমাদেরও যেকোনো অপরাধ ক্ষমা করবেন যদি আন্তরিকভাবে তাওবাহ করা হয়।

*** আল্লাহর ইচ্ছায় নবী ইউনুস (আঃ) তিন ধরনের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। তিমির পেটে, রাত এবং সমুদ্রের তলদেশে।**

* সুতরাং দীনের পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে অধৈর্য হওয়া যাবে না, বরং সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে হবে। তবে কেউ বিপদে পড়লে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে উদ্ধার করবেন। কারণ শেষ আয়াতে মু'মিনদেরকে সে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

* নুন ও হূত উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নুন ও সাহেবুল হুতের অর্থ মাছওয়ালা। ইউনুস আলাইহিস সালামকে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে যুন-নুন বা ছাহেবুল হূত শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৮৯- ৯০ আয়াত থেকে শিক্ষণীয় দিক-

*** সন্তান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাই তাঁর কাছে চাইতে হবে, অন্য কেউ তা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না।**

* সৎ কাজের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা প্রসংশনীয়। অতএব সৎ কাজের প্রতিযোগিতা করা উচিত।

* আশা ও ভীতি সহকারে আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে সেটা কবুল করা হবে।

*** হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন যেন তিনি মারা যাওয়ার পর তার সন্তান বনী ইসরাইলকে পথ দেখাতে পারেন। আমরাও এইরকম উত্তম ওয়ারিশের জন্য দোয়া করা।**

* যাকারিয়া (আঃ) এর দোয়া ফলে আল্লাহ্‌ তাঁকে দান করেছিলেন- ইয়াহইয়া আঃ-কে। তিনিও নবী ছিলেন।

৯১ আয়াত থেকে শিক্ষণীয় দিক-

* মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) নিজের সতীত্বকে হেফাযত করেছিলেন, কোন পরপুরুষের সাথে খারাপ কাজ করেন নি।

* মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) ও ঈসা (আলাইহাস সালাম) উভয়ে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন।

৯২-৯৩ আয়াত থেকে শিক্ষণীয় দিক-

* সকল নাবীদের দীনের মূলনীতি ছিল একই, আর তা হল আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই।

* সৎ কর্মশীলদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। তাদের কর্মফল নষ্ট করা হবে না।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৯

সূরা আলে ইমরান ১৩০-১৪৩ আয়াত

সুরা আল-ইমরান কুরআনের তৃতীয় সূরা এবং সর্বসম্মতভাবে মাদানি সুরা। সুরার আয়াত সংখ্যা ২০০। রুকু সংখ্যা ২০।

সূরার নামকরণঃ

এ সূরার ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতদ্বয়ে আলে-ইমরানের কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এ সূরার আরেক নাম আয-যাহরাহ বা আলোকচ্ছটা। [মুসলিমঃ ৮০৪]

এছাড়াও এ সূরাকে সূরা তাইবাহ, আল-কানুয, আল-আমান, আল-মুজাদালাহ, আল-ইস্তেগফার, আল-মানিয়াহ ইত্যাদি নাম দেয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল ও বিষয়বস্তুর অংশসমূহঃ

প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রুকূ'র প্রথম দু'আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটিঃ (আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের সারা দুনিয়াবাসীর ওপর প্রধান্য দিয়ে নিজের রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন) আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে । ৯ হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকূ'র শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকূ'র শেষ অব্দি চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয়।

চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকূ থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়।

সম্বোধন ও আলোচ্য বিষয়াবলীঃ

এই বিভিন্ন ভাষণকে এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি সুগ্রথিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল বক্তব্য ও কেন্দীয় বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও একমুখীনতা । সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হচ্ছে, আহলী কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টান) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে এমন সব লোক যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল।

সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে সেই একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা হয়েছে। তাদের আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্পর্কে সর্তক করে দিয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই রসূল এবং এই কুরআন এমন এক দীনের দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নবীই যার দাওয়াত নিয়ে আসছেন এবং আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দীন। এই দীনের সোজা

পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো তা যেসব কিতাবকে তোমরা আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করো তাদের দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারো না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।

দ্বিতীয় দলটি এখন শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে। এই প্রসংগে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ শুরু হয়েছিল এখানে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়ে তাকে তাদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে সে কিতাবে কাজ করবে এবং যেসব আহ্‌লি কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহর পথে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করবে, তাও তাকে জানানো হয়েছে। ওহোদ যুদ্ধে তার মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্যও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এভাবে এ সূরাটি শুধুমাত্র নিজের অংশগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি এবং নিজের অংশগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেনি বরং সূরা বাকারার সাথেও এর নিকট সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এটি একেবারেই তার পরিশিষ্ট মনে হচ্ছে। সূরা বাকারার লাগোয়া আসনই তার স্বাভাবিক আসন বলে অনুভূত হচ্ছে।

সূরার ফযীলতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ, তা পাঠকারীর জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটি আলোকচ্ছটাময় সূরা আল-বাকারাহ ও সূরা আলে-ইমরান পড়; কেননা, এ দুটি সূরা কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যেন দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি ছায়া অথবা দু'বাক পাখির মত। তারা এসে এ দু'সূরা পাঠকারীদের পক্ষ নেবে। ’ [মুসলিমঃ ৮০৪]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, ‘কেয়ামতের দিন কুরআন আসবে যারা কুরআনের উপর আমল করেছে, তাদের পক্ষ হয়ে। তখন সূরা আল-বাকারাহ ও সূরা আলে-ইমরান থাকবে সবার অগ্রে।’ [মুসলিমঃ ৮০৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

১৩০. হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমর ইবনে আকইয়াশের জাহেলী যুগের কিছু সুদের কারবার ছিল সে তা উসুল করা জন্য ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। তারপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন আসল, সে জিজ্ঞাসা করল, আমার চাচাত ভাই অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করতঃ অমুক কোথায়? তারা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করলঃ অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ সেও উহুদের প্রান্তরে। এতে সে তার যুদ্ধাস্ত্র পরে নিয়ে উহুদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। মুসলিমগণ যখন তাকে দেখল তখন তারা বললঃ আমর! তুমি আমাদের থেকে দূরে থাক। কিন্তু সে জবাব দিল আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারপর সে যুদ্ধ করে আহত হলো, তাকে তার পরিবারের কাছে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হল।

সা'দ ইবনে মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তার বোনকে বললেন তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর সে কি জাতিকে বাঁচানোর জন্য, নাকি তাদের ক্রোধে শরীক হওয়ার জন্য, নাকি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করেছে? তখন আমর জবাবে

বললঃ বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছি। তারপর তিনি মারা গেলেন। ফলে জান্নাতে প্রবেশ করলেন, অথচ আল্লাহর জন্য এক ওয়াক্ত সালাত পড়ারও সুযোগ তার হয়নি। [আবু দাউদঃ ২৫৩৭, ইসাবাঃ ২/৫২৬] হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আমি সর্বদা খুঁজে বেড়াতাম যে, আল্লাহ তা'আলা উহুদের ঘটনার মাঝখানে সুদের কথা কেন নিয়ে আসলেন, তারপর যখন এ ঘটনা পড়লাম তখন আমার কাছে এ আয়াতকে এখানে আনার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হলো। [আল উজাবঃ ২/৭৫৩]

আরবী ভাষায় সুদের প্রতিশব্দ রিবা। বাংলাভাষায় ‘সুদ’ শব্দটি যেমন সুপরিচিত, তেমনি আরবী ভাষায়ও ‘রিবা’ শব্দের ব্যবহার বহুলপ্রচলিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওত লাভ এবং কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবের জাহেলী যুগেও ‘রিবা’ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয়, সে সময় রিবা অর্থাৎ সুদের লেনদেনও চালু ছিল। সূরা নিসার আয়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা আ.-এর যুগেও ইহুদীদের মধ্যে সুদের লেনদেনের রেওয়াজ ছিল এবং মূসা আ.-এর নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ তাওরাতেও ‘রিবা’ অর্থাৎ সুদের লেনদেনকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুতরাং যে শব্দটি প্রাচীনকাল থেকে আরব ও তার আশপাশের এলাকায় পরিচিত ছিল এবং সে অনুযায়ী লেনদেনের রেওয়াজ ছিল, পবিত্র কুরআনে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার পাশাপাশি এ কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূসা আ.-এর উম্মতের জন্যও রিবা তথা সুদ হারাম করা হয়েছিল; তাই তা এমন কোনো বিষয় নয়, যা কুরআন নাজিল হওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে বুঝা বা বুঝানো কঠিন ছিল। তারা সকলেই রিবার হাকীকত বুঝতেন। তাদের কাছে একথা স্পষ্ট ছিল- যে ঋণ ঋণদাতার জন্য কোনো ধরনের মুনাফা বয়ে আনে সেটাই রিবা।

এ কারণে অষ্টম হিজরীতে সূরা বাকারার রিবা সম্পর্কিত আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে রিবা’র নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক বিধান বুঝতে এবং মেনে নিতে কোনোরূপ বেগ পেতে হয়নি। মদ্যপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা যেমন তাঁরা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি রিবা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা নাজিল হওয়ার পর তাও তাঁরা অকপটে মেনে নিয়ে সবধরনের সুদী লেনদেন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় আরবে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তা দূর করার জন্য এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে এ নয় যে, চক্রবৃদ্ধি আকারে না হলে সুদ খাওয়া হালাল হয়ে যাবে। কারণ, অন্যান্য আয়াতে তো যে কোনো রকমের সুদ খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে।

এখন আমরা দেখি, সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কারীমের কয়েকটি ভাষ্য-

যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই। আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৫

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৬

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৮-২৭৯

সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হলো : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে-যে ব্যক্তি সুদ খায় এবং যে সুদ খাওয়ায় উভয়কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৯৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৬; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৫১০৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে ৭টি গুনাহকে বড় গুনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হল সুদ খাওয়া। -মুসনাদে বাযযার; আল মু'জামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১০২; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৫৭০৯

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, যে সাক্ষী থাকে এবং যে ব্যক্তি সুদের হিসাব-নিকাশ বা সুদের চুক্তিপত্র ইত্যাদি লিখে দেয় সকলের প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৩৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৬

এ ছাড়াও আরও অসংখ্য হাদীসে সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া এবং সুদের সাথে কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

১৩১. আর তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের সবার সাথে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে কথা বলবেন যে, তার ও আল্লাহর মাঝে কোন অনুবাদকারী থাকবে না। তারপর প্রত্যেকে তার সামনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সামনে তাকিয়ে দেখবে যে, জাহান্নাম তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসছে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন একটি খেজুরের অংশ বিশেষ দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচায়।" [বুখারী: ৬৫৩৯]

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

১৩২. আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ (এক) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলের আনুগত্য হুবহু আল্লাহর আনুগত্য বোঝায়। তারপরও এখানে রাসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার তাৎপর্য স্বয়ং আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহর করুণালাভের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্যকরা হয়েছে, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কুরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রাসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত

বাণী ইসলাম ও ঈমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ তথা অস্তিত্ব, প্রভুত্ব, নাম ও গুণ এবং ইবাদাত তথা দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা। (দুই) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহেযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবীকে বলা হয় না, বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বর্ণনা আসছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন, কেননা তাদের একচ্ছত্র আনুগত্য করলে আল্লাহ তা'আলা রহম করবেন। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার রহমতের পরিবর্তে আমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। আর নিজেদের আমল নষ্ট কর না।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৩)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

১৩৩. আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

এ আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামুলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ আল্লাহর কাছে সরাসরি ক্ষমা চাওয়া হতে পারে। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে এমন সব সৎকর্ম এর উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। এটাই মত। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'কর্তব্য পালন' ইবনে-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, 'ইসলাম'। আবুল আলিয়া বলেছেন 'হিজরত'। আনাস ইবনে-মালেক বলেছেন 'সালাতের প্রথম তাকবীর'। সায়ীদ ইবনে-জুবায়ের বলেছেন ইবাদাত পালন। দাহহাক বলেন 'জিহাদ'। আর ইকরিমা বলেছেন 'তওবা'। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দুটি বিষয় জানা আবশ্যক। এক. শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকারঃ

এক, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণতঃ শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশী হওয়া ইত্যাদি। দুই, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এ গুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। [যেমন, সূরা আন-নিসা ৩২] কারণ, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ স্বীয় হেকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নাই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক না কেন এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। তবে যে সব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মানুষের ইচ্ছা শক্তি কাজ করে থাকে সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ বহু আয়াতে দেয়া হয়েছে। ঠিক এ আয়াতেও আল্লাহর ক্ষমার কারণ হয় এমন যাবতীয় কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেননা এটা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়।

দুই. আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মুল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি। তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ “সততা ও সত্য অবলম্বন কর, মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললোঃ আপনাকেও নয়কি- ইয়া রাসূলাল্লাহ। উত্তর হলোঃ আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না। তবে আল্লাহ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।” [বুখারীঃ ৫৩৪৯, মুসলিমঃ ২৮১৬] মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ্ তাআয়ালার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐবান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে। বরং সৎকর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব সৎকর্ম সম্পাদনে ক্রটি করা উচিৎ নয়।

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের চাইতে বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে জান্নাতের প্রস্থতাকে এ দু’টির সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। অবশ্য কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ জান্নাত দৈর্ঘ ও প্রস্থে সমান। কেননা তা আরশের নীচে গম্বুজের মত। গম্বুজের মত গোলাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হয়ে থাকে। এ বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, তিনি বলেছেনঃ “তোমরা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে; কেননা তা সর্বোচ্চ জান্নাত, সবচেয়ে উত্তম ও মধ্যম স্থানে অবস্থিত জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত। আর তার ছাদ হলো দয়াময় আল্লাহর আরশ। [বুখারীঃ ২৭৯০, ৭৪২৩]

তবে আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عرض শব্দের অর্থ طول তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীতে নেয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় মূল্য’ তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়- এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ আয়াতে উল্লেখিত عرض শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকাবেলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছেঃ জান্নাত মুত্তাকীগণের জন্যে নির্মিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাত তৈরী হয়ে আছে। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে সেগুলোতে কোথাও কোথাও স্পষ্ট করে বলা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। যেমন জান্নাতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতের এক ইট রৌপ্যের ও এক ইট স্বর্ণের, তার নীচের আস্তর সুগন্ধি মিশকের, তার পাথরকুচিগুলো হীরে-মুতি-পান্নার সমষ্টি, মিশ্রণ হচ্ছে, ওয়ারস ও যা’ফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে সে তাতে

স্থায়ী হবে, মরবে না, নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, হতভাগা হবে না, যৌবন কখনও ফুরিয়ে যাবে না, কাপড়ও কখনও ছিড়ে যাবে না।" [মুসনাদে আহমাদ ২/৩০৪, ৩০৫, সহীহ ইবন হিব্বান: ১৬/৩৯৬]

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন;

মোত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয় কার্য অব্যাহত রাখে। বেশী হলে বেশী এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। অপর দিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখলে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন। স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, এ দু'অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তামগ্ন হয়ে আল্লাহর প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহকে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঘায়েল বা পরাভূত করতে পারাটাই বীর হওয়ার লক্ষণ নয়, বীর হল ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে ক্রোধের সময় সম্বরণ করতে পেরেছে। [বুখারীঃ ৬১১৪, মুসলিমঃ ২৬০৯] অনুরূপভাবে এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ আমাকে এমন একটি কথা বলুন যা আমার কাজে আসবে, আর তা সংক্ষেপে বলুন যাতে আমি তা আয়ত্ব করতে পারি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ রাগ করো না। সাহাবী বার বার একই প্রশ্ন করলেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন। [বুখারী: ৬১১৬; মুসনাদের আহমাদঃ ৫/৩৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ক্ষমার বিনিময়ে কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন। [তিরমিযীঃ ২৩২৫, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৩১] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ক্রোধকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া সত্বেও দমন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে ডেকে যে কোন হুর পছন্দ করে নেয়ার অধিকার দিবেন।" [ইবন মাজাহঃ ৪১৮৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর কাছে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্রোধ সম্বরণ করার চেয়ে বড় কোন সম্বরণ বেশী সওয়াবের নেই।" [ইবন মাজাহ: ৪১৮৯]

সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হলো এই যে, তাদের ক্রোধ বাইরে প্রকাশ পায় না এবং তাদের পক্ষ হতে লোকের প্রতি কোন অন্যায় হয় না। বরং তারা উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখে। আর তারা আল্লাহকে ভয় করতঃ পুণ্যের আশায় সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করে। তারা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। আত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করে না। একেই বলে অনুগ্রহ এবং এরূপ অনুগ্রহশীল বান্দাকেই আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তিনটি কথার উপর আমি শপথ গ্রহণ

করছিঃ (১) সাদকা দ্বারা মাল হ্রাস পায় না, (২) মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান বেড়ে যায় এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা বিনয় প্রকাশকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। মুসতাদরিক-ই-হাকীমে হাদীস রয়েছে, যে ব্যক্তি চায় যে, তার ভিত্তি উঁচু হোক এবং মর্যাদা বেড়ে যাক তার জন্যে উচিত হবে যে, সে যেন অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করে দেয়, যারা দেয় না তাদেরকে প্রদান করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত **করে**। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এক আহবানকারী ডাক দিয়ে বলবেনঃ "হে জনগণকে ক্ষমাকারীগণ! তোমাদের প্রভুর নিকট এসো এবং স্বীয় প্রতিদান গ্রহণ কর। ক্ষমাকারী প্রত্যেক মুসলমানের জান্নাতে যাওয়ার অধিকার রয়েছে।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

১৩৫. আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনরায় করতে থাকে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন এক ব্যক্তি গোনাহ করার পর বললঃ হে আল্লাহ! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বললঃ হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বললঃ হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম, সে যাই করুক না কেন। [বুখারীঃ ৭৫০৭, মুসলিমঃ ২৭৫৮]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে আবু বকর হাদীস শুনিয়েছে। আর আবু বকর সত্য বলেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "কোন লোক যদি গুনাহ করে, তারপর পাক-পবিত্র হয় এবং সালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন।" [তিরমিযী: ৪০৬; ইবন মাজাহঃ ১৩৯৫; আবু দাউদ ১৫২১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমরা দয়া কর, তোমাদেরকেও রহমত করা হবে, তোমরা ক্ষমা করে দাও আল্লাহও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, যারা কোন কথা না শোনার জন্য নিজেদেরকে বন্ধ করে নিয়েছে তাদের জন্য ধ্বংস, যারা অন্যায় করার পর জেনে-বুঝে বারবার করে তাদের জন্যও ধ্বংস।" [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৬৫]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, শয়তান বলে, হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের শপথ যতদিন তোমার বান্দাদের দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতেই থাকব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার

ইজ্জত ও মহত্বের শপথ, যতক্ষণ বান্দা আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ততক্ষণ আমি তাকে ক্ষমা করবো। (আহমাদ হা: ১১২৪৪, হাসান)

'তার ওপর জেনে-শুনে অটল থাকে না।' মু'মিনদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল তারা অপরাধ কাজ জানার পর সে অপরাধে অটল থাকে না। আল্লাহ তা'আলা অপরাধ ক্ষমা করবেন, শর্ত হল জেনেশুনে বারবার করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা মানুষের ওপর দয়া কর, তোমাদেরকে দয়া করা হবে। মানুষকে ক্ষমা করে দাও, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যারা কথা বানিয়ে বলে তাদের জন্য দুর্ভোগ এবং দুর্ভোগ তাদের যারা জেনেশুনে পাপ কাজকে আঁকড়ে ধরে থাকে। (আদাবুল মুফরাদ হা: ৩৮০, সহীহ)

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

১৩৬. তারাই, যাদের পুরস্কার হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতইনা উত্তম!

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু (জাতির) চরিত গত হয়েছে, কাজেই তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কি পরিণাম।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সাতশ'। তাদের মধ্য থেকে ৫০ জন তীরন্দাজের একটি দলকে রসূল (সাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে (জাবালে রুমাত) ছোট পাহাড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে নিযুক্ত করে বলেছিলেন, আমরা জিতে যাই বা হেরে যাই, কোন অবস্থাতেই তোমরা এখান থেকে নড়বে না। তোমাদের কাজ হবে, কোন অশবারোহী এদিকে এলে তাকে তীর ছুঁড়ে পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য করা। কিন্তু যখন মুসলিমরা বিজয় লাভ করে গনীমতের মাল জমা করছিলেন, তখন এই দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে নড়া হবে না। এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, কাফেররা পশ্চাদপসরণ করেছে। অতএব আর এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই তাঁরা সেখান থেকে চলে এসে মাল-পত্র জমা করার কাজে লেগে গেলেন। সেখানে নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশের আনুগত্য করে কেবল দশজন সাহাবী রয়ে গেলেন। এদিকে ঘাঁটি শূন্য পেয়ে কাফেরা উপকৃত হল। তাদের অশবারোহী দল মুসলিমদের পিছন থেকে পাল্টা আক্রমণ করে বসল। অতর্কিতে এই আক্রমণের কারণে মুসলিমদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং তাঁরা স্বাভাবিকভাবে বহু কষ্টের শিকারও হলেন। এই আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, তোমাদের সাথে যা কিছু হয়েছে, তা নতুন কিছু নয়; পূর্বেও এ রকম হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ও বরবাদী তাদের ভাগ্যেই নেমে আসে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

১৩৮. এগুলো মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

১৩৯. তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও।

আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদের হতাশ না হতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কতিপয় ক্রটি-বিচ্যুতির কারণে ওহুদের যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর কিছুক্ষণের জন্য মুসলিমরা পরাজয় বরণ করে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়। এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। (এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি।

(দুই) খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। (তিন) মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিমদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহছিল চোখের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিলো। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। (এক) অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ। (দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্য মুসলিমগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অঙ্কুরেই মনোবল হারিয়ে না ফেলে।

এ দুইটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্যে কুরআনের এ বাণীতে বলা হয় যে, ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও আল্লাহর পথে জেহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে। উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যে সব ক্রটি-বিচূতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যতে সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রাসূলের আনুগত্য উজ্জল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো ওদেরও লেগেছে। মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমরা এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ মুমিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

এখানেও অন্য এক ভঙ্গিমায় মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, উহুদ যুদ্ধে তোমাদের কিছু লোক আহত হয়েছে তো কি হয়েছে? তোমাদের বিরোধী দলও তো বদরের যুদ্ধে এবং উহুদ যুদ্ধের প্রথম দিকে এইভাবেই আহত হয়েছিল। আর মহান আল্লাহ তাঁর হিকমতের দাবীতে হার-জিতের পালা পরিবর্তন করতে থাকেন। কখনো বিজয়ীকে পরাজিত করেন, আবার কখনো পরাজিতকে করেন বিজয়ী।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

১৪১. আর যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমরা তাঁদের অবহেলার কারণে সাময়িকভাবে যে পরাজয়ের শিকার হন, তাতেও ভবিষ্যতের জন্য এমন কয়েকটি যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে, যা মহান আল্লাহ পরের আয়াতে বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করে দেখিয়ে দেন। (কারণ, ধৈর্য ও সুদৃঢ় থাকা ঈমানের দাবী।) যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে এবং মসীবতের সময় যাঁরা ধৈর্য ও সুদৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, অবশ্যই তাঁরা সকলেই মু'মিন। দ্বিতীয়তঃ কিছু লোককে শাহাদতের মর্যাদা দানে ধন্য করেন। তৃতীয়তঃ ঈমানদারদেরকে তাঁদের সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র করেন। تَمْحِيْصٌ শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়ঃ যেমন, বেছে নেওয়া এবং পবিত্র, পরিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ করা। আর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ বলতে, পাপ থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। (ফাতহুল ক্বাদীর) আর চতুর্থতঃ কাফেরদের ধ্বংস সাধন। কারণ, সাময়িকভাবে জয়লাভে তাদের অবাধ্যতা ও দাম্ভিকতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে এই জিনিসই তাদের ধ্বংস ও বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি?

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে যে, তিনি কাউকে পরীক্ষা না করে জান্নাতে দিবেন না। তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে তারপর সে পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। পবিত্র কুরআনে এ কথাটি বারবার ঘোষিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেন, “তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সংগী-সাথী ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৪] আরও বলেন, “তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং কারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও

অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি?" [আত-তাওবাহ; ১৬] আরও এসেছে "মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি। এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?" [সূরা আল-আনকাবুত: ২]

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

১৪৩. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার আগে তোমরা তো তা কামনা করতে, এখনতো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে।

মৃত্যু বা বিপদ কামনা করা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাত কামনা করো না; আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও, তবে যদি তারপরও সাক্ষাত হয়ে যায় তা হলে ধৈর্য ধারন কর এবং জেনে রাখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে'। [বুখারীঃ ২৯৬৬, মুসলিমঃ ১৭৪২]

ফুটনোট

* সুদ খাওয়া, দেওয়া, সাক্ষ্য হওয়া কোনোভাবে সুদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না।

* যে আয়াতে সুদের কথা বলা হয়েছে সেই একই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাকওয়া অর্জন করার মাঝে রয়েছে সফলতা। অর্থাৎ সুদ গ্রহন করে ধনী হওয়াকে যে সফলতা মনে করা হয় সেটা প্রকৃত সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতা হচ্ছে সুদের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া এবং তাকওয়া অর্জন করা।

* সুদ গ্রহণ না করার পুরস্কার – জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নেওয়া।

* সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের পুরস্কার - আল্লাহ্‌র রহম পাওয়া

* ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামুলকভাবে অগ্রসর হওয়ার

* যারা দ্রুত রাগ দমন করতে পারে তাদের অনেক ফযীলত রয়েছে। তাই মুমিনের উচিত নিজেদের রাগ দমিয়ে রাখা

* সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করা। আপনি কোনো বিপদে আছেন, কোনো পরীক্ষার মাঝ দিয়ে যাচ্ছে সাদকাহর পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ পথে ব্যয় বিপদ-মুসিবত দূর করে দেয়। অনুরূপভাবে সচ্ছল অবস্থায় বেশী বেশী আল্লাহ শুকরিয়া স্বরূপ দান করুন আল্লাহ্ আরো বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ্ পথে ব্যয় সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়।

* মানুষকে ক্ষমা করে দিন। ক্ষমা করা আল্লাহ্‌র গুণ। মানুষ যখন এই গুণ চর্চা করে আল্লাহ্ তখন সেটা পছন্দ করেন। এবং যারা মানুষদেরকে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহও তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান বেড়ে যায়।

* অপরাধ ঘটে গেলে দ্রুত তাওবাহ করা। ক্ষমা প্রার্থনা করা ও একই পাপ কাজ না করার অনেক ফযীলত রয়েছে।

* মিথ্যুকদের পরিণতি সর্বদা খারাপ হয়, তারা সফলকাম হতে পারে না।

* কুরআনের প্রত্যেক আয়াতে হিদায়াত ও উপদেশ রয়েছে।

*. ঈমানদারগণ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলকাম।

* কোন অবস্থাতেই মৃত্যু কামনা করা যাবে না।

* হতাশ হওয়া, চিন্তিত হওয়া কোনো বিজিত জাতির মধ্যে থাকতে পারে না। তাই মুমিনদের বিজয়ী হতে হলে- হতাশ হওয়া যাবে বা, চিন্তিত হওয়া যাবে না।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২০

সূরা আলে ইমরান ১০-২০ আয়াত

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

১০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে আল্লাহর নিকট তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না এবং এরাই আগুনের ইন্ধন।

মহান আল্লাহ এ আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কে এটা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। "যেদিন যালেমদের কোন ওজর-আপত্তি কাজে আসবে না, আর তাদের জন্য থাকবে লা'নত এবং তাদের জন্য থাকবে খারাপ আবাস" [গাফের: ৫২] দুনিয়াতে তাদেরকে যে সমস্ত সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হয়েছিল তাও তাদের কোন উপকার দিবে না এবং তাদেরকে আল্লাহর কঠোর শাস্তি ও কঠিন পাকড়াও থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হবে না। অন্য আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন, "কাজেই ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ তো এসবের দ্বারাই ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা কাফের থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে" [আত-তাওবাহঃ ৫৫] আরও বলেন, "যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই আপনাকে বিভ্রান্ত না করে। এ তো স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র; তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস আর ওটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল! [সূরা আলে ইমরান: ১৯৬-১৯৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যে সাহায্য করে থাকি, তা দ্বারা আমি তাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না।" (সূরা মু'মিনুন ২৩:৫৫-৫৬)

আর যারা সন্তান-সন্ততি দ্বারা নাজাতের আশা করবে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করবে তারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে আল্লাহর (শাস্তি থেকে রক্ষা করতে) তাদের সন্তান ও সম্পদ কখনও কোন কাজে আসবে না। আর তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা আলি-ইমরান ৩:১১৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: "তারা বলত: আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না।" (সূরা সাবা ৩৪:৩৫)

তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না যেমনভাবে ফিরআউন ও তার পূর্ববর্তী কাফিরদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি তাদের কোন কাজে আসেনি। আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন এবং তাঁর শাস্তি বড়ই বেদনাদায়ক। কেউ কোন ক্ষমতা বলে ঐ শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারে না এবং তা সরিয়ে দিতেও পারে না। সুতরাং যারা কুফরী করবে তাদের অবস্থাও পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মতই হবে।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

১১. তাদের অভ্যাস ফির'আউনী সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায়, তারা আমার আয়াতগুলোতে মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

এ আয়াতে ফিরআউনের পূর্বেকার যে সমস্ত সম্প্রদায়কে তাদের অপরাধের কারণে পাকড়াও করা হয়েছিল তাদের পরিচয় ও অপরাধের বিবরণ দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র তাদেরকে নুহ, হুদ, সালেহ, লুত ও শু'আইবের সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সমস্ত স্থানে তাদের অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল এবং রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। যেমন, সামূদ সম্প্রদায় কর্তৃক উষ্ট্রী হত্যা, লুত সম্প্রদায়ের সমকামিতা, শু'আইব এর সম্প্রদায় কর্তৃক মাপ ও ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি।

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

১২. যারা কুফরী করে তাদেরকে বলুন, তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল।

'যারা কুফরী করেছে তাদেরকে বল' আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলেন: হে নাবী! তুমি অবিশ্বাসীদেরকে বলে দাও যে, তারা পৃথিবীতেও পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং মুসলিমদের অধীনস্থ থাকতে বাধ্য হবে এবং কিয়ামাতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে। আর এটা হচ্ছে জঘন্যতম স্থান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:"আল্লাহর পথ হতে লোকেদের নিবৃত্ত করার জন্য কাফিরগণ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে; অতঃপর তা তাদের (আফসোসের) কারণ হবে, এর পর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।" (সূরা আনফাল ৮:৩৬)

আর তথায় তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:"এবং যারা কাফির তারা কুফরী করত বলে তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় ও মর্মান্তিক শাস্তি।" (সূরা ইউনূস ১০:৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:"আর যারা কুফরী করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা হজ্জ ২২:৫৭)

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

১৩. দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। একদল যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে, অন্য দল ছিল কাফের; তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দেখছিল তাদের দ্বিগুণ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

দু'টি দল যুদ্ধে পরস্পর সম্মুখীন হয়। একটি সাহাবা-ই-কিরামের দল এবং অপরটি মুশরিক কুরাইশদের দল। এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। সেদিন মুশরিকদের উপর এমন প্রভাব পড়ে (মুসলমানদের) এবং মহান আল্লাহ

মুসলমানদেরকে এমনভাবে সাহায্য করেন যে, যদিও মুসলমানেরা সংখ্যায় মুশরিকদের অপেক্ষা বহু কম ছিল, কিন্তু মুশরিকরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মুশরিকরা উমায়ের ইবনে সাদকে গোয়েন্দাগিরির জন্যে প্রেরণ করেছিল। সে এসে সংবাদ দেয় যে, মুসলমানদের সংখ্যা কিছু কম বেশী তিনশ জন। আসলেও তাই ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ দশ এবং আর কয়েকজন বেশী। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট ও নির্বাচিত এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। একটি অর্থ তো এই। দ্বিতীয় ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাফিরদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ ছিল, এটা মুসলমানেরা জানতো এবং প্রত্যক্ষও করছিল। তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করতঃ কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বদরী সাহাবীরা (রাঃ) ছিলেন তিনশ তেরোজন এবং মুশরিকরা ছিল দু'শ ষোল জন। কিন্তু ইতিহাসের পুস্তকগুলোতে মুশরিকদের ন'শ হতে এক হাজার বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে সম্ভবতঃ হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ) কুরআন শরীফের শব্দ দ্বারাই দলীল গ্রহণ করে থাকবেন। বানূ হাজ্জাজ গোত্রের একটি কৃষ্ণ বর্ণের ক্রীতদাস যে ধৃত হয়ে এসেছিল, তাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করলে সে বলেঃ 'অনেক। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ "তারা দৈনিক কতটি উট যবেহ করছে?' সে বলেঃ 'একদিন নয়টি এবং আর একদিন দশটি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ তাহলে মুশরিকদের সংখ্যা নয়শ এবং এক হাজারের মধ্যবর্তী।' সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, মুশরিকরা মুসলমানদের তিনগুণ ছিল। কিন্তু এটা স্মরণ রাখবার বিষয় যে, আরববাসী বলে থাকে, আমার নিকট এক হাজার তো রয়েছে কিন্তু আমার আরও এর দ্বিগুণ প্রয়োজন এবং তার তিন হাজারের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাহলে কোন অসুবিধা থাকলো না কিন্তু প্রশ্ন আরও একটি রয়েছে, তা এই যে, কুরআন কারীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ (আরবী) অর্থাৎ যখন তোমরা মুখোমুখী হয়ে গেলে তখন আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের চোখে কম দেখালেন যেন আল্লাহ যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হয়ে যায়। (৮:৪৪)

সুতরাং এ পবিত্র আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত সংখ্যার চেয়েও অল্প পরিলক্ষিত হয়। আর উপরোক্ত আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে। যে, বেশী এমন কি দ্বিগুণ পরিলক্ষিত হয়। তাহলে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কিরূপে হতে পারে? উত্তর এই যে, ঐ আয়াতে অবস্থা ছিল এক রকম এবং এ আয়াতে অবস্থা ছিল অন্য রকম। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ বদরের দিন মুশরিকদের সংখ্যা আমাদের চোখে মোটেই বেশী দেখায়নি। আমরা আবার গভীরভাবে দৃষ্টিপতি করেও বুঝতে পারি যে, তাদের সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা বেশী নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'মুশরিকদের সংখ্যা আমাদের নিকট এত অল্প মনে হলো যে, আমি আমার পাশ্ববর্তী একজনকে বললাম-এরা সত্তরজন হবে। ঐ লোকটি তখন বললোঃ না না,একশজন হবে। তাদের একজন লোক ধৃত হলে আমরা তাকে মুশরিকদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করি। সে বলেঃ এক হাজার। অতঃপর যখন উভয় পক্ষ সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় তখন মুসলমাদের মনে হয় যে, মুশরিকরা তাদের দ্বিগুণ হবে। এটা এ জন্যই যে, যেন তারা নিজেদের দুর্বলতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, সমস্ত মনোযোগ তারই দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং তারই নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়। অনুরূপভাবে মুশরিকদের নিকটও মুসলমানদের সংখ্যা তাদের দ্বিগুণ অনুভূত হয়, যেন তাদের অন্তরে ভয় ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

অতঃপর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তখন প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় অন্য দলের সংখ্যা কম পরিলক্ষিত হয় যেন উভয় দলই উদ্যমের সাথে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ তাআলা সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট মীমাংসা করে দেন। যেন কুফর ও ঔদ্ধত্যের উপর ঈমানের বিজয় লাভ ঘটে এবং যেন মুসলমানেরা সম্মানিত হয় এবং কাফিরেরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ অর্থাৎ আল্লাহ বদরের দিন তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা সে সময় দুর্বল ছিলে।' (৩:১২৩)

এ জন্যেই এখানেও বলেছেন- "আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তদীয় সাহায্যদানে শক্তিশালী করে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুষ্মনদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অর্থাৎ যারা স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে উঠেপড়ে লেগে যাবে এবং বুঝে নেবে যে, আল্লাহ পাক তাঁর মনোনীত বান্দাদেরকে এ ইহলৌকিক জগতেও সাহায্য করবেন এবং কিয়ামতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

১৪. নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তিনি পার্থিব জীবনকে বিভিন্ন প্রকারের উপভোগ্য বস্তু দ্বারা সুশোভিত করে দিয়েছেন।

حُبُّ الشَّهَوٰتِ বা প্রবৃত্তির ভালবাসা, প্রবৃত্তির আনুগত্য করা। জান্নাত প্রবৃত্তির অনুসরণকে বর্জন ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: জান্নাত কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা বেষ্টন করে রাখা হয়েছে, আর জাহান্নাম চাকচিক্যময় বস্তু ও প্রবৃত্তির অনুসরণ দ্বারা বেষ্টন করে রাখা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম হা: ২৮২৩)। সুতরাং জান্নাত পেতে হলে কষ্ট ও কাঠিন্যতা অতিক্রম করতে হবে। আর জাহান্নামে যেতে হলে প্রবৃত্তির অনুসরণে কোন বাধা নেই যেমন খুশি তেমন চলতেও কোন বাধা নেই।

'কাম্য জিনিস' বলতে এমন সব জিনিসকে বুঝানো হয়েছে যা স্বভাবত মানুষ পছন্দ করে ও ভালবাসে। এ সব জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বা তা ভালবাসা অপছন্দনীয় নয়; তবে তা হতে হবে শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে; কারণ দুনিয়ার সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য আল্লাহ তা 'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা-সৌন্দর্য করেছি, মানুষের মধ্যে কর্মের দিক থেকে কে সর্বোত্তম তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য।" (সূরা কাহফ ১৮:৭)

কাম্য জিনিসের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে নারী; কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে যেসব জিনিসের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয় তার প্রধান হল নারী। একজন পুরুষ সাবালক হবার পর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বোধ করে একজন সঙ্গিণীর। তাছাড়া পুরুষের কাছে নারী সর্বাধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: মহিলা ও সুগন্ধি আমার কাছে অতি প্রিয় জিনিস। (নাসায়ী হা: ৩৯৪৯, আহমাদ হা: ৩৪৮২, হাসান) অন্যত্র তিনি বলেন:

গোটা দুনিয়া হলো সম্পদ, আর তন্মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হল সতী-সাধ্বী নারী। (সহীহ মুসলিম হা: ৩৭১৬, নাসায়ী হা: ৩২৩২)। সুতরাং যদি নারীর প্রতি ভালবাসা শরীয়তের সীমালঙ্ঘন না করে তা হলে তা উত্তম। পক্ষান্তরে নারীরাই সবচেয়ে বেশি ফেতনার কারণ। তাই তাদের থেকে সাবধান হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমি পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ও ফেতনার কারণ আর কিছু ছেড়ে যাইনি। (সহীহ বুখরী হা: ৫০৯৬, সহীহ মুসলিম হা: ২০৯৭-৯৮)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: বানী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম ফেতনা সৃষ্টি হয়েছিল মহিলাদের ব্যাপারে। (সহীহ মুসলিম হা: ২৭৪২)

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তা'আলা সন্তান, ধন-সম্পদ, চতুস্পদ জন্তু ইত্যাদির কথাও উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি এ সব সম্পদ দ্বারা দুনিয়াকে সুশোভিত করে দিয়েছেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ সবকিছু পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন: আর জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।" (সূরা আনফাল ৮:২৮)।

সুতরাং দুনিয়ার এসব সম্পদের মোহে আকৃষ্ট হয়ে পরকালকে ভুলে গেলে চলবে না, বরং দুনিয়ার সম্পদকে পরকালের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মানুষের সন্তান ও সম্পদ উভয় জগতে তার কাজে আসবে যদি তা দীনের আলোকে গড়ে তুলা যায় । যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি আমল ব্যতীতঃ সদাকায়ে জারিয়া অথবা এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় অথবা সৎ সন্তান, যে তার জন্য দ'আ করবে। (সহীহ মুসলিম হা: ১৬৩১)

তেমনিভাবে মানুষ যখন তার সম্পদের হক আদায় করবে তখন তার সম্পদ তার উপকারে আসবে। আর যদি হক আদায় না করে তবে সম্পদ তার জন্য পরকালে ক্ষতির কারণ হবে।

(وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ) "অঢেল ধন-সম্পদ" অঢেল সম্পদের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ পাওয়া যায়। কেউ বলেন, এর পরিমাণ হচ্ছে বড় পাহাড়ের সমান। অন্য একদল বলেন: দু'হাজার উকিয়া। হাসান বসরী (রহঃ) বলেন: বার শত স্বর্ণমুদ্রা। কারো মতে, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

চিহ্নিত ঘোড়া' এমন ঘোড়া যাকে চারণভূমিতে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে অথবা এমন ঘোড়া যাকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে কিংবা এমন ঘোড়া যাকে অন্য থেকে পার্থক্য করার জন্য কোন কিছু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ঘোড়া তিন প্রকার:
১. যে ব্যক্তি ঘোড়া প্রতিপালন করবে মানুষকে দেখানোর জন্য, গর্ব করার জন্য ও ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য, এমন ঘোড়া তার জন্য পাপের কারণ হবে।
২. যে ব্যক্তি ঘোড়া প্রতিপালন করবে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যবহারের জন্য, কিন্তু তার দ্বারা নিজে উপকৃত হলেও আল্লাহ তা'আলার হক ভুলে যায় না। এমন উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালনের কারণে সে ব্যক্তির জন্য তা জাহান্নামের অন্তরায় হবে।

৩. এমন ঘোড়া যা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করার জন্য প্রতিপালন করা হয় সে ঘোড়া প্রতিপালকের জন্য নেকীর কারণ হবে। (সহীহ মুসলিম হা: ৯৮৭)

এগুলো হল দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকট যে সমস্ত জিনিস রয়েছে তা এ সমস্ত বস্তু অপেক্ষা উত্তম। সেগুলো হল চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর এগুলো হল তাদের জন্য যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে, তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর আদেশ নিষেধ মানবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:"এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে তারাই জান্নাতবাসী।" (সূরা বাকারাহ ২:৮২)

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

১৫. বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর নিকট থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ 'এগুলো পার্থিব জীবনের লোভনীয় সম্পদ। অর্থাৎ এগুলো ইহলৌকিক জীবনের লোভনীয় বস্তু, এগুলো সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠতম অবস্থান স্থল ও উত্তম বিনিময় প্রাপ্তির জায়গা মহান আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, যখন (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি যখন আমাদের জন্যে এটাকে সুশোভিত করেছেন তাহলে এখন'? তখন পরবর্তী আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এখানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়ঃ (হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও আমি তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উত্তম জিনিসের সংবাদ দিচ্ছি। এ পার্থিব জিনিসগুলো তো একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে যেসব জিনিসের কথা বলছি সেগুলো অস্থায়ী নয় বরং চিরস্থায়ী। জেনে রেখো যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যে তাদের প্রভুর নিকট এমন সুখময় জান্নাত রয়েছে যার ধারে ধারে ও যার বৃক্ষাদির মধ্যস্থলে বিভিন্ন প্রকারের স্রোতস্বিনী সমূহ বয়ে যাচ্ছে। কোন স্থানে রয়েছে মধুর নদী, কোন জায়গায় রয়েছে দুধের নদী, কোথাও বা রয়েছে সুরার স্রোতস্বিনী এবং কোন স্থলে রয়েছে স্বচ্ছ পানির প্রস্রবণ। আরও এমন এমন সুখ-সম্পদ রয়েছে যা না শ্রবণ করেছে কোন কর্ণ, না দর্শন করেছে কোন চক্ষু, ধারণা করেছে কেন অন্তর। এরূপ সুখময় ও আরামদায়ক স্থানে মুত্তাকী লোকেরা চিরকাল অবস্থান করবে। তথা হতে তাদেরকে বের করে দেয়া হবে। না, তাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতরাজী কমে যাবে না এবং ধ্বংসও হবে না। অতঃপর তথায় এমন সহধর্মিণী পাওয়া যাবে যারা ময়লা মালিন্য, অপবিত্রতা, ঋতুরক্তক্ষরণ ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রকারের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বিরাজ করবে। সর্বোপরি খুশীর কারণ এই যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। এর পরেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন ভয় থাকবে না। এজন্যেই সূরা-ই-বারাআতের নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে 'এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই খুব বড় জিনিস'। (২:৭২) অর্থাৎ নিয়ামত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ। সমস্ত বান্দাই আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। কে তাঁর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় তা তিনিই ভাল জানেন।

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

১৬. যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী।

অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ঈমান আনবে। দ্বিতীয়তঃ তারা কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইবে। তৃতীয়তঃ জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

এসব বৈশিষ্ট্যধারী মুত্তাকীরাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার ওপর ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আনুগত্যশীল এবং সাহরীর সময় তথা ফজরের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

জীবনের উপর কঠিন ও কষ্টকর হলেও তারা সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। তারা বিনয় ও নমতা প্রকাশকারী। তারা নিজেদের ধন-মাল আল্লাহর পথে তার নির্দেশ মত ব্যয় করে থাকে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, মানুষকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং তাদের দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে। তারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য দানে পরিতুষ্ট করে এবং ভোর রাত্রে উঠে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ সময় ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব অত্যধিক। এও বলা হয়েছে যে, হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে যে সময় বলেছিলেনঃ (আরবী) আল্লাহর পথে তাঁর অর্থাৎ 'অতিসত্বরই আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।' (১২:৯৮) ওটার ভাবার্থ ঊষাকালই বটে। অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেনঃ 'প্রাতঃকালে তোমাদের জন্যে আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রে এক তৃতীয়াংশ রাত্র অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেনঃ 'কোন যাজ্ঞাকারী আছে কি যাকে আমি দান করবো? কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যার প্রার্থনা আমি কবূল করবো? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করবো?

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আর ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও, আল্লাহ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের এককত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনিই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। তিনি সাক্ষ্য দানকারীদের মধ্যে অধিক সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। অতঃপর তিনি নিজের সাক্ষ্যের সাথে ফেরেশতাদের সাক্ষ্যকে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:"কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা

অবতীর্ণ করেছেন এর মাধ্যমে সাক্ষ্য দেন। তিনি তা নিজ জ্ঞানে নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা নিসা ৪:১৬৬)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এককত্বের ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্যের সাথে শুধু ফেরেশতাদের সাক্ষ্য সম্পৃক্ত করেননি; বরং আলিম সমাজকেও স্বীয় সাক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে মর্যাদাশীল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আলিমরা নাবীদের ওয়ারিশ। আমি তাদেরকে টাকা-পয়সার ওয়ারিশ বানিয়ে যাননি। তাদেরকে কেবল ইলম বা জ্ঞানের ওয়ারিশ বানিয়েছি। (তিরমিযী হা: ২৬৮২ আবূ দাঊদ হা: ৩৬৪১, সহীহ)

অতএব এ আয়াত ও হাদীস প্রমাণ করে যে, সেসব আলিমই সম্মানিত ও মর্যাদাশীল যারা তাওহীদের সাক্ষ্যে দৃঢ় থাকেন। আর যাদের তাওহীদের বিষয়ে পদস্খলন ঘটেছে, শির্কে লিপ্ত হয়েছে আকীদাহ-বিশ্বাস অথবা ইবাদত-বন্দেগীতে, তারা যতই জ্ঞানের সাগর হোক না কেন, তারা কখনও সম্মানিত নয়, তারা লাঞ্ছিত ধিকৃত।

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

১৯. নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা কেবলমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে কুফরী করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহনকারী।

ইসলাম সেই মনোনীত দ্বীন, যার প্রতি সকল নবীগণ সব সব যুগে আহবান করেছেন এবং যার শিক্ষা দিয়েছেন। আর এখন এই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ হল সেটাই, যা শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। যাতে আছে যে, তাওহীদ, রিসালাত এবং আখেরাতের উপর ঐভাবেই ঈমান আনতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে, যেভাবে নবী করীম (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। এখন কেবল আল্লাহকে এক মনে করে নিলেই অথবা কিছু সৎকর্ম করে নিলেই যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে এবং আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে তা নয়; বরং ঈমান, ইসলামের দাবী হল, আল্লাহকে এক মনে করে কেবল তাঁরই ইবাদত করা। মুহাম্মাদ (সাঃ) সহ সকল নবীদের উপর ঈমান আনা। নবী করীম (সাঃ)-এর পর আর কোন নবী আসবেন না, এ কথাও স্বীকার করে নেওয়া। আর এই ঈমানের সাথে সাথে সেই আকীদা ও আমলগুলো পালন করতে হবে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এখন আল্লাহর নিকট দ্বীনে-ইসলাম ব্যতীত আর কোন দ্বীন গৃহীত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, "যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।" (সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত) নবী করীম (সাঃ)-এর নবুঅত ও রিসালাত সমগ্র মানবতার জন্য। "বলে দাও, হে মানবমন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রসূল।" (সূরা আ'রাফ ১৫৮ আয়াত) "পরম বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে সমগ্র বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হয়।" (সূরা ফুরকান ১ আয়াত)। হাদীসে রসূল (সাঃ) বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ যার

হাতে আমার প্রাণ আছে! ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের যে কেউ আমার উপর ঈমান না এনেই মারা যাবে, সে জাহান্নামী হবে।" (সহীহ মুসলিম) তিনি আরো বলেন, "আমি সাদা-কালো সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।" (সকল মানুষের জন্য নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি।) আর এই কারণেই তিনি সেই সময়ের সমস্ত বাদশাহদের প্রতি পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে কাসীর)

'মতানৈক্য' বলতে তাদের পারস্পরিক এমন মতবিরোধ যা একই ধর্মের অনুসারীরা আপোসে বাধিয়ে রেখেছিল। যেমন, ইয়াহুদীদের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং আপোসের বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি। অনুরূপ খ্রিষ্টানদের পারস্পরিক বিরোধিতা ও আপোসের বিচ্ছিন্নতা। তাছাড়া আহলে কিতাবদের পারস্পরিক মতবিরোধকেও বুঝানো হয়েছে। যে বিরোধ ও মতানৈক্যের কারণে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা একে অপরকে বলত, "কোন কিছুর উপর তোমাদের ভিত্তি নেই।" মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং ঈসা (আঃ)-এর নবুঅতকে নিয়ে যে বিরোধ, তাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই সকল মতবিরোধ কোন দলীলের ভিত্তিতে ছিল না। কেবল হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার কারণে ছিল। অর্থাৎ, তারা সত্যকে জেনে ও চিনেছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবল দুনিয়ার খেয়ালী স্বার্থের পিছনে পড়ে ভ্রান্তমূলক কথার উপরে কায়েম থাকত এবং সেটাকেই দ্বীন বুঝানোর চেষ্টা করত। যাতে তাদের নাকও যেন উঁচু থাকে এবং জনগণের মাঝে তাদের বিশ্বস্ততাও যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীং মুসলিম উলামাদের এক বিরাট সংখ্যক দল ঠিক এই ধরনেরই জঘন্য উদ্দেশ্য সাধনের তাকীদে তাদের মতনই ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে চলেছে। আল্লাহ তাদেরকে ও আমাদেরকে হিদায়াত করুন। আমীন।

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

২০. সুতরাং যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করছি এবং আমার অনুসারিগণও। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলেন, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

আয়াতে বর্ণিত أَسْلَمْتُمْ শব্দটির মূল অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'আত্মসমর্পণ করা' অনুবাদ করা হয়েছে। এর আরেক অনুবাদ এভাবেও করা যায় যে, যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, আমি ইসলামকে কবুল করেছি এবং আমার অনুসারিগণও। এর মাধ্যমে অপরাপর ধর্মের অনুসারীরা মুসলিমদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে যে, তাদেরকে আবার বিভ্রান্ত করার সুযোগ নেই।

আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে ও নিরক্ষর (الأُمِّيِّيْن। 'নিরক্ষর' বলতে আরবের মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে।) ও তাদের অনুসারীদেরকে বলুন, 'তোমরাও কি ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছ? যদি তারা তোমরা যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছ সেভাবে ইসলামকে কবুল করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে এবং তারা তোমাদের ভাই-বন্ধুতে পরিণত হবে। আর যদি তারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। প্রচারের সওয়াব আপনি অবশ্যই পাবেন। তাদের উপরও আল্লাহর পক্ষ থেকে যাতে করে তাদের শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হয়।

ফুটনোট

- যারা কুফরী করে তাদের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবেনা।
- যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতকে অস্বীকার করে তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।
- কাফিররা দুনিয়াতে সংখ্যায় ও অস্ত্রে অধিক হলেও মুসলিমদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।
- সঠিক ঈমান ও আমল থাকলে মু'মিনরাই বিজয় লাভ করবে।
- বদরের দু'বাহিনীর যুদ্ধের মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা হল- সত্যের বিজয় হবেই, মিথ্যা পরাজিত হবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
- দুনিয়াকে বিভিন্ন জিনিস দ্বারা সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে।
- দুনিয়ার মোহে পড়ে পরকালকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।
- সন্তান ও সম্পদ সঠিক পন্থায় ব্যবহার করলে উপকারে আসবে অন্যথায় তা ক্ষতির কারণ হবে।
- আহলে কিতাবগণ সঠিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কোন কথা বললে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে; অন্যথায় নয়।
- আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ প্রমাণের জন্য তাঁর কথাই যথেষ্ট।
- যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোন বিধানকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ত্যাগ করে তারা তা প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
- ইসলাম ব্যতীত সকল দীন বাতিল।
- সত্যের পথে দাওয়াত দেয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রত্যেক অনুসারীর ওপর আবশ্যক।
- হিংসা মানুষের সঠিক পথ গ্রহণে অন্যতম অন্তরায়।
- মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-
    - যারা দোয়া করে- رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করেছি; অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।)
    - যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দানশীল এবং রাত্রির শেষাংশে ক্ষমাপ্রার্থী।
- রাতের শেষভাগে ক্ষমা চাওয়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ এবং এ সময় কবূল হওয়াও আশাব্যঞ্জক।
- আল্লাহ তা'আলা রাতের শেষভাগে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, তবে তা কিভাবে, তা তিনিই জানেন।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২১

সূরা বাকারাহ ২৭৪-২৮১ আয়াত

সূরা বাকারা, কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘতম সূরা, আয়াত সংখ্যা ২৮৬,এটি সূরা ফাতিহার পর দ্বিতীয় ক্রমে এর অবস্থান। রেওয়ায়েত রয়েছে যে ইহা মদিনায় নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম সূরা। রুকু সংখ্যা ৪০।

নামকরণ

বাকারাহ মানে গাভী। এ সূরার ৬৭ থেকে ৭৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত হযরত মুসা এর সময়কার বনি ইসরাইল এর গাভী কুরবানীর ঘটনা উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে।

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরা আল ফাতিহার ৫ম আয়াতে সরল সঠিক পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে। আর সূরা আল বাকারাতেই আল্লাহ্ সঠিক পথের সন্ধান খুঁজার মাধ্যম বলে দিয়েছেন। সূরা বাকারাহের ২য় আয়াতে কুরআনকেই আল্লাহ সরল সঠিক পথ হিসাবে বর্ননা করেছেন!

এই সূরা (২য় সূরা আল বাকারা) এর মূল বিষয় হলো ঈমান, আর পরের ৩য় সূরা আলে ইমরানের মূল বিষয় হলো ঈমানের পরের ধাপ; ইসলাম। এছাড়া আরো অনেক সম্পর্ক রয়েছে।

সূরা বাকারার বৈশিষ্ট্য

সূরা আল-বাকারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

- এটি কোরানের দীর্ঘতম সূরা।
- এতে পবিত্র কোরআনের শেষ আয়াত রয়েছে।
- এটি কোরানের দীর্ঘতম আয়াত (ঋণের দায়েনা আয়াত) ধারণ করে।
- এতে রয়েছে কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত (আয়াতুল কুরসি)।
- নবীর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, এ সূরা কিয়ামতের দিন তার পাঠকের পক্ষে লড়বে, এ সূরাতে রয়েছে ইসমে আজম, তাকে এটি দ্বারা ডাকা হলে তিনি উত্তর দেন এবং এটি আকড়ে ধরা আশীর্বাদ এবং এটি ছেড়ে যাওয়া অনুশোচনা, এবং যাদুকরেরা এটি বহন করতে পারে না।

সূরার ফযিলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না। যে ঘরে সূরা বাক্বারা পড়া হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়।" [সহিহ মুসলিম ৭৮০]

নাওওয়াস ইবনু সাম'আন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি কিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন অনুযায়ী যারা 'আমল করত তাদেরকে আনা হবে। সূরাহ আল বাকারাহ ও সূরাহ আ-লি ইমরান অগ্রভাগে থাকবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাহ দু'টি সম্পর্কে তিনটি উদাহরণ

দিয়েছিলেন যা আমি কখনো ভুলিনি। তিনি বলেছিলেনঃ এ সূরাহ দুটি দু খণ্ড ছায়াদানকারী মেঘের আকারে অথবা দু'টি কালো চাদরের মতো ছায়াদানকারী হিসেবে আসবে যার মধ্যখানে আলোর ঝলকানি অথবা সারিবদ্ধ দু' ঝাক পাখীর আকারে আসবে এবং পাঠকারীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিতে থাকবে। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৭৪৬, ইসলামীক সেন্টার ১৭৫৩)

নাওয়াস ইবনে সাম'আন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "কুরআন ও ইহজগতে তার উপর আমলকারীদেরকে (বিচারের দিন মহান আল্লাহর সামনে) পেশ করা হবে। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান তার আগে আগে থাকবে এবং তাদের পাঠকারীদের স্বপক্ষে (প্রভুর সঙ্গে) বাদানুবাদে লিপ্ত হবে। (মুসলিম)

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান তাদের রব-এর নিকট রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

এ আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-সদকার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিনরাতেরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়্যতে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়্যত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে দান করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশংকা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

২৭৫. যারা সুদ খায় তারা তার ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এ জন্য যে তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। অতএব যার নিকট তার রব-এর পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

الربا (সূদ) এর আভিধানিক অর্থ হল, বাড়তি এবং বৃদ্ধি। শরীয়তে সূদ দুই প্রকার; 'রিবাল ফাফ্ল' এবং 'রিবান নাসীয়াহ'। 'রিবাল ফাফ্ল' সেই সূদকে বলা হয় যা ছয়টি জিনিসের বিনিময়কালে কমবেশী অথবা নগদ ও ধারের কারণে হয়ে থাকে। (যার বিশদ বর্ণনা হাদীসে আছে।) যেমন, গমের পরিবর্তন যদি গম দ্বারা করা হয়, তাহলে প্রথমতঃ তা সমান সমান হতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ তা নগদ-নগদ হতে হবে। এতে যদি কমবেশী হয় তাও এবং নগদ নগদ না হয়ে যদি একটি নগদ এবং অপরটি ধারে হয় অথবা দু' টিই যদি ধারে হয় তবুও তা সূদ হবে। আর 'রিবান নাসীয়াহ' হল, কাউকে ছয় মাসের জন্য এই শর্তের ভিত্তিতে ১০০ টাকা দেওয়া যে, পরিশোধ করার সময় ১২৫ টাকা দিতে হবে। ছয় মাস পর নেওয়ার কারণে ২৫ টাকা বাড়তি নেওয়া। যাবতীয় রিবাই হারাম।

এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, **আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা** বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা, খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি খাওয়া' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই।

আরবরা পাগল ও দেওয়ানাকে বলতো, 'মজনূন' (অর্থাৎ জিন বা প্রেতগ্রস্ত)। কোন ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে, একথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে দ্বারা বলতো, উমুককে জিনে ধরেছে। এই প্রবাদটি ব্যবহার করে কুরআন সুদখোরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছে যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তি যেমন ভারসাম্যহীন কথা বলতে ও কাজ করতে শুরু করে, অনুরূপভাবে সুদখোরও টাকার পেছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন কথা ও কাজের মহড়া দেয়। নিজের স্বার্থপর মনোবৃত্তির চাপে পাগলের মতো সে কোন কিছুরই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে কোন্ কোন্ পর্যায় মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির শিকড় কেটে গেলো, সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন ধরণের ধ্বংসকর প্রভাব পড়লো এবং কতগুলো লোকের দুরবস্থার বিনিময়ে সে নিজের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করলো-এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যাথাই থাকে না। দুনিয়াতে তার এই পাগলপারা অবস্থা। আর যেহেতু মানুষকে আখেরাতে সেই অবস্থায় ওঠানো হবে যে অবস্থায় সে এই দুনিয়ায় মারা গিয়েছিল, তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি একজন পাগল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে।

এ আয়াতে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে, তারা দুটি অপরাধ করেছেঃ (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছেঃ 'ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত'। অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এক্ষেত্রে বাহ্যতঃ তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলত, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়বিক্রয়কেও হারাম বল।

ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই পার্থক্য নিম্নরূপঃ(ক) ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার সমান

বিনিময় হয়। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে একটি পণ্য কিনে ক্রেতা তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে ক্রেতার জন্য ঐ পণ্যটি যোগাড় করার ব্যাপারে বিক্রেতা নিজের যে বুদ্ধি, শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিল তার মূল্য গ্রহণ করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনের ব্যাপারে মুনাফার সমান বিনিময় হয় না। সুদ গ্রহণকারী অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করে। এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু অন্যদিকে সুদ প্রদানকারী কেবলমাত্র 'সময়' লাভ করে, যার লাভজনক হওয়া নিশ্চিত নয়। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য যদি সে ঐ ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঐ 'সময়' তার জন্যে নিশ্চিতভাবে অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারিগরি সংস্থা অথবা কৃষি কাজে লাগাবার জন্য ঐ অর্থ নিয়ে থাকে, তবুও 'সময়' তার জন্য যেমন লাভ আনবে তেমনি ক্ষতিও আনবে, দু' টোরই সম্ভাবনা সমান। কাজেই সুদের ব্যাপারটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি দলের লাভ ও অন্য দলের লোকসানের ওপর অথবা একটি দলের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ ও অন্য দলের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের ওপর।(খ) ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে যত বেশী লাভ গ্রহণ করুক না কেন, সে মাত্র একবারই তা গ্রহণ করে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী নিজের অর্থের জন্য অনবরত মুনাফা নিতে থাকে। আবার সময়ের গতির সাথে সাথে তার মুনাফাও বেড়ে যেতে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার অর্থ থেকে যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ঋণদাতা এই লাভ থেকে যে মুনাফা অর্জন করে তার কোন সীমা নেই। এমনও হতে পারে, সে ঋণগ্রহীতার সমস্ত উপার্জন, তার সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ এমনকি তার পরনের কাপড়-চোপড় ও ঘরের বাসন-কোসনও উদরস্থ করে ফেলতে পারে এবং এরপরও তার দাবী অপূর্ণ থেকে যাবে।(গ) ব্যবসায়ে পণ্যের সাথে তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতাকে আর কোন জিনিস বিক্রেতার হাতে ফেরত দিতে হয় না। গৃহ, জমি বা মালপত্রের ভাড়ার ব্যাপারে আসল যে বস্তুটি যার ব্যবহারের জন্য মূল্য দিতে হয়, তা ব্যয়িত হয় না বরং অবিকৃত থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় তা ভাড়াদানকারীর কাছে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা আসল পুঁজি ব্যয় করে ফেলে তারপর ব্যয়িত অর্থ পুনর্বার উৎপাদন করে বৃদ্ধি সহকারে ফেরত দেয়।(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও কৃষিতে মানুষ শ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু সুদী কারবারে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে কোন প্রকার শ্রম ও কষ্ট ছাড়াই অন্যের উপার্জনের সিংহভাগের অংশীদার হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকে "অংশীদার" বলা হয় লাভ-লোকসান উভয় ক্ষেত্রে যে অংশীদার থাকে এবং লাভের ক্ষেত্রে লাভের হার অনুযায়ী যার অংশীদারীত্ব হয়, তেমন অংশীদারের মর্যাদা সে লাভ করে না। বরং সে এমন অংশীদার হয়, যে লাভ-লোকসান ও লাভের হারের কোন পরোয়া না করেই নিজের নির্ধারিত মুনাফার দাবীদার হয়।এসব কারণে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক মর্যাদা ও সুদের অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। এর ফলে ব্যবসায় মানবিক তামাদ্দুনের লালন ও পুনর্গঠনকারী শক্তিতে পরিণত হয়। বিপরীতপক্ষে সুদ তার ধ্বংসের কারণ হয়। আবার নৈতিক দিক দিয়ে সুদের প্রকৃতিই হচ্ছে, তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, কঠোরতা ও অর্থগৃধ্নুতা সৃষ্টি করে এবং সহানুভূতি ও পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট করে দেয়। তাই অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই সুদ মানবতার জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

"যার নিকট তার রব-এর পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

একথা বলা হয়নি যে, যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হচ্ছে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে থাকছে। এই বাক্য থেকে জানা যায়, "যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই" বাক্যের অর্থ এ নয় যে, যা কিছু ইতিপূর্বে খেয়ে ফেলেছে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে বরং এখানে শুধুমাত্র আইনগত সুবিধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সুদ সে খেয়ে ফেলেছে আইনগতভাবে তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হবে না। কারণ তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হলে মামলা-মোকদ্দামার এমন একটা ধারাবাহিকতা চক্র শুরু হয়ে যাবে যা আর শেষ হবে না। তবে সুদী কারবারের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেছে নৈতিক দিক দিয়ে তার অপবিত্রতা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি তার মনে যথার্থই আল্লাহর ভীতি স্থান লাভ করে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভংগি যদি সত্যিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই এই হারাম পথে উপার্জিত ধন-সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের অর্থ-সম্পদ তার কাছে আছে তাদের সন্ধান লাভ করার জন্য নিজস্ব পর্যায়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। হকদারদের সন্ধান পাবার পর তাদের হক ফিরিয়ে দেবে। আর যেসব হকদারের সন্ধান পাবে না তাদের সম্পদগুলো সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। এই কার্যক্রম তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। তবে যে ব্যক্তি তার পূর্বেকার সুদলব্ধ অর্থ যথারীতি ভোগ করতে থাকে, সে যদি তার এই হারাম খাওয়ার শাস্তি লাভ করেই যায়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

২৭৬. আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ কোন অধিক কুফরকারী, পাপীকে ভালবাসেন না।

এই আয়াতে এমন একটি অকাট্য সত্যের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক দিক দিয়েও সত্য। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, সুদের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ কমে যাচ্ছে তবুও আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে এই যে, সুদ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক উন্নতির কেবল প্রতিবন্ধকতাই নয় বরং অবনতির সহায়ক। বিপরীতপক্ষে দান-খয়রাতের (করযা-ই-হাসানা বা উত্তম ঋণ) মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি এবং তামাদ্দুন ও অর্থনীতি সবকিছুই উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে।নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুদ আসলে স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা ইত্যাকার অসৎ গুণাবলীর ফল এবং এই গুণগুলোই সে মানুষের মধ্যে বিকশিত করে। অন্যদিকে দানশীলতা, সহানুভূতি, উদারতা ও মহানুভবতা ইত্যাকার গুণাবলীই দান-খয়রাতের জন্ম দেয় এবং দান-খয়রাতের মাধ্যমে আর নিয়মিত দান-খয়রাত করতে থাকলে এই গুণগুলো মানুষের মধ্যে লালিত ও বিকশিত হতেও থাকে। এমন কে আছে যে, এই উভয় ধরনের নৈতিক গুণাবলীর মধ্য থেকে প্রথমগুলোকে নিকৃষ্ট ও শেষেরগুলোকে উৎকৃষ্ট বলবে না?তামাদ্দুনিক দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, যে সমাজের লোকেরা পরস্পরের সাথে স্বার্থবাদী আচরণ করে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে অন্যের কোন কাজ করে না, একজনের প্রয়োজন ও অভাবকে অন্যজন নিজের মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ মনে করে তা থেকে পুরোপুরি লাভবান হয় এবং ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, সে সমাজ কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। সে সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও অনাগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আর বিভিন্ন অংশ হামেশা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। অন্যান্য কারণগুলো যদি এই অবস্থার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এহেন সমাজের বিভিন্ন অংশের

পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়াটাও মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। অন্যদিকে যে সমাজের সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যার সদস্যরা পরস্পরের সাথে ঔদার্য পূর্ণ আচরণ করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন ও অভাবের সময় আন্তরিকতার সাথে ও প্রশস্ত মনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একজন সামর্থ্য ও সক্ষম ব্যক্তি তার একজন অক্ষম ও অসামর্থ্য ভাইকে সাহায্য অথবা কমপক্ষে ন্যায়সঙ্গত সহায়তার নীতি অবলম্বন করে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক প্রীতি, কল্যাণাকাংখা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের সমাজের অংশগুলো একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত থাকবে। সেখানে আভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিরোধ ও সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোন সুযোগই পাবে না। পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সাহায্য সহযোগিতার কারণে সেখানে উন্নতির গতিধারা প্রথম ধরনের সমাজের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত হবে।এবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করা যাক। অর্থনীতির বিচারে সুদী লেনদেন দুই ধরনের হয়। এক, অভাবীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহন করার জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণগ্রহণ করে। দুই, পেশাদার লোকেরা নিজেদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথম ধরনের ঋণটি সম্পর্কে সবাই জানে, এর ওপর সুদ আদায় করার পদ্ধতি মারাত্মক ধ্বংসকর। দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই যেখানে মহাজনরা ও মহাজনী সংস্থাগুলো এই পদ্ধতিতে গরীব, শ্রমিক, মজুর, কৃষক ও স্বল্প আয়ের লোকদের রক্ত চুষে চলছে না। সুদের কারণে এই ধরণের ঋণ আদায় করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বরং অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপর এক ঋণ আদায় করার জন্য দ্বিতীয় ঋণ এবং তারপর তৃতীয় ঋণ, এভাবে ঋণের পর ঋণ নিতে থাকে। ঋণের মূল অংকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সুদ আদায় করার পরও মূল অংক যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। শ্রমিকদের আয়ের বৃহত্তম অংশ মহাজনের পেটে যায়। তার নিজের মাথা ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিনান্তে তার নিজের ও সন্তান-পরিজনদের পেটের আহার যোগাতে সক্ষম হয় না। এ অবস্থায় কাজের প্রতি শ্রমিক ও কর্মচারীদের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে এবং একদিন তা শূন্য পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কারণ তাদের মেহনতের ফল যদি অন্যেরা নিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা কোনদিন মন দিয়ে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারে না। তারপর সুদী ঋণের জালে আবদ্ধ লোকরা সর্বক্ষণ এমন দুর্ভাবনা ও পেরেশানির মধ্যে জীবন কাটায় এবং অভাবের কারণে তাদের জন্য সঠিক খাদ্য ও চিকিৎসা এমনই দুর্লভ হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের স্বাস্থ্য কখনো ভালো থাকে না। প্রায়ই তারা রোগ-পীড়ায় জর্জরিত থাকে। এভাবে সুদী ঋণের নীট ফল এই দাঁড়ায়ঃ গুটিকয় লোক লাখো লোকের রক্ত চুষে মোটা হতে থাকে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির অর্থ উৎপাদন সম্ভাব্য পরিমাণ থেকে অনেক কমে যায়। পরিণামে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ত চোষারাও নিষ্কৃতি পায় না। কারণ তাদের স্বার্থগৃধুতায় সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষোভ, ঘৃণা ও ক্রোধ লালিত হতে থাকে। তারপর একদিন কোন বিপ্লবের তরংগাভিঘাতে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। তখন এই জালেম ধনিক সমাজকে তাদের অর্থ-সম্পদের সাথে সাথে প্রাণ সম্পদও বিসর্জন দিতে হয়।আর দ্বিতীয় ধরনের সুদী ঋণ সম্পর্কে বলা যায়, ব্যবসায় খাটাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে এই ঋণ গ্রহণ করার ফলে যে অসংখ্য ক্ষতি হয় তার মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকটি এখানে বিবৃত করছি।একঃ যে কাজটি প্রচলিত সুদের হারের সমান লাভ উৎপাদনে সক্ষম নয়, তা দেশ ও জাতির জন্য যতই প্রয়োজনীয় ও উপকারী হোক না কেন, তাতে খাটাবার জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। আবার দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ একযোগে এমন সব কাজের দিকে দৌঁড়ে আসে, যেগুলো বাজারে প্রচলিত সুদের হারের সমান বা তার চাইতে বেশী উৎপাদন করতে পারে, সামগ্রিক দিক দিয়ে তাদের প্রয়োজন বা উপকারী ক্ষমতা অনেক কম অথবা একেবারে শূন্যের কোটায় থাকলেও। দুইঃ ব্যবসায়, শিল্প বা কৃষি সংক্রান্ত যেসব কাজের জন্য সুদে টাকা পাওয়া যায়, তাদের কোন একটিতেও এ ধরনের কোন গ্যারান্টি নেই যে, সবসময়

সব অবস্থায় তার মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যেন শতকরা পাঁচ, ছয় বা দশ অথবা তার ওপরে থাকবে এবং এর নীচে কখনো নামবে না। মুনাফার এই হারের গ্যারান্টি তো দূরের থাক সেখানে অবশ্যি মুনাফা হবে, কখনো লোকসান হবে না, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই যে ব্যবসায়ে এমন ধরনের পুঁজি খাটানো হয় যাতে পুঁজিপতিকে একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী মুনাফা দেয়ার নিশ্চয়তা দান করা হয়ে থাকে, তা কখনো ক্ষতি ওআশঙ্কা মুক্ত হতে পারে না।তিনঃ যেহেতু মুল ঋণদাতা ব্যবসায়ের লাভ লোকসানে অংশীদার হয় না, কেবলমাত্র মুনাফার অংশীদার হয় এবং তাও আবার একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়ার ভিত্তিতে মূলধন দেয়, তাই ব্যবসায়ের ভালো-মন্দের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ থাকে না। সে চরম স্বার্থপরতা সহকারে কেবলমাত্র নিজের মুনাফার ওপর নজর রাখে। যখনই বাজারে সামান্য মন্দাভাব দেখা দেয়ার আশঙ্কা হয় তখনই সে সবার আগে নিজের টাকাটা টেনে নেয়ার চিন্তা করে। এভাবে কখনো কখনো নিছক তার স্বার্থপরতা সুলভ আশঙ্কার কারণে সত্যি সত্যিই বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়। কখনো অন্য কোন কারণে বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়ে গেলে পুঁজিপতির স্বার্থপরতা তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের সূচনা করে।সুদের এ তিনটি ক্ষতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অর্থনীতির সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি এগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না। এরপর একথা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, যথার্থই সুদ অর্থনৈতিক সম্পদ বাড়ায় না বরং কমায়। এবার দান-খয়রাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ও ফলাফলের কথায় আসা যাক। সমাজের সচ্ছল লোকেরা যদি নিজেদের অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে নিঃসংকোচে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেয় এরপর তাদের কাছে যে পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তা গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেয়, যাতে তারাও নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে পারে, তারপরও যে টাকা বাড়তি থেকে যায় তা ব্যবসায়ীদের বিনা সুদে ঋণ দেয় অথবা অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে লাভ লোকসানের শরীক হয়ে যায় অথবা সমাজ ও সমষ্টির সেবায় বিনিয়োগ করার জন্য সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়, তাহলে এহেন সমাজে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি চরম উন্নতি লাভ করবে, সমাজের সাধারণ লোকদের সচ্ছলতা বেড়ে যেতে থাকবে এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থা ভিত্তিক সমাজের তুলনায় সেখানে সামগ্রিকভাবে অর্থ উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাবে, একথা যে কেউ সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝতে পারবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে "আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফের গোনাহগারকে পছন্দ করেন না" । এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যতঃ সুদ খায়, তারা গোনাহগার ও পাপাচারী।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

২৭৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

এই রুকূ' তে মহান আল্লাহ বারবার দুই ধরনের লোকদের তুলনা করেছেন। এক ধরনের লোক হচ্ছে, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু ও শাইলক প্রকৃতির, তারা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের অধিকারের পরোয়া না করে টাকা গুনতে থাকে, প্রত্যেকটি টাকা গুনে গুনে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে থাকে এবং সপ্তাহ ও মাসের হিসেবে তা বাড়াবার ও এই বাড়তি টাকার হিসেব রাখার মধ্যে ডুবে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের লোক হচ্ছে, আল্লাহর অনুগত, দানশীল ও

মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আল্লাহ ও তার বান্দার উভয়ের অধিকার সংরক্ষেণর প্রতি নজর রাখে, নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে নিজেদের চাহিদাপূরণ করে এবং অন্যদের চাহিদা পূরণেরও ব্যবস্থা করে। আর এই সঙ্গে নিজেদের অর্থ ব্যাপকভাবে সৎকাজে ব্যয় করে। প্রথম ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এই ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদের সাহায্যে দুনিয়ায় কোন সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। আখেরাতেও তারা দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও বিপদ-মুসিবত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। বিপরীতপক্ষে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। তাদের সাহায্যেই দুনিয়ায় সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে এবং আখারাতে তারাই কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

২৭৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে ভয় করে ও ঐ কার্যাবলী হতে বিরত থাকে যেসব কার্যে তিনি অসন্তুষ্ট। তাই তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সদা লক্ষ্য রাখ, প্রতিটি কাজে তাঁকে ভয় করে চল এবং মুসলমানদের উপর তোমাদের যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে, সাবধান! যদি তোমরা মুসলমান হও তবে তা নিও না! কেননা এখন তা হারাম হয়ে গেছে। সাকীফ গোত্রের বানু আমর বিন উমায়ের ও বানু মাখযুম গোত্রের বানু মুগীরার সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অজ্ঞতার যুগে তাদের মধ্যে সুদের কারবার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর বানু আমর বানু মুগীরার নিকট সুদ চাইতে থাকে। তারা বলেঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমরা তা দিতে পারি না। অবশেষে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। মক্কার প্রতিনিধি হযরত আত্তাব বিন উসায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই সম্বন্ধে পত্র লিখেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সুদ গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে বানু আমর তাওবা করতঃ তাদের সুদ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। এই আয়াতে ঐ লোকদের ভীষণভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যারা সুদের অবৈধতা জেনে নেয়া সত্ত্বেও ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা না কর তবে আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না।

যদি তোমরা না কর তবে আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও-আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, তবে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহর কারণে কুরআনুল কারীমে এত বড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। [মাআরিফুল কুরআন]

বলা হয়েছে **'যদি তোমরা তাওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবে তোমরা আসল মুলধন ফেরত পেয়ে যাবে'**। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারো উপর যুলুম করতে পার না

এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও যুলুম করতে পারবে না। আয়াতে মূলধন দেয়াকে তাওবার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তাওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত পাবে। এ থেকে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে তাওবা না করলে মূলধনও ফেরত পাবে না। সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তাওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরীআতের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তাওবা করেছে - তার এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকবে।

তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না- এ প্রসঙ্গে প্রথমে বোঝা দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্টবস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যাতে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ-বিচ্ছু, বাঘ-সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন না কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায়, যে জিনিষের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিষের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। রিবা' অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তদ্রুপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর দুনিয়া ও আখেরাতের মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য। প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না। সুতরাং সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভেতরেই থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার স্বীকার হতে হয়।

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

২৮০. আর যদি সে অভাবগ্রস্থ হয় তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তার অবকাশ। আর যদি তোমরা সদকা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

এ আয়াতে সুদখুরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমার খাতক যদি রিক্ত হস্ত হয় - ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরীআতের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয় যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম। সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম ন। হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও

আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়। এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ তা'আলা আইন প্রনয়ণ করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। এখানে ক্ষমা করাকে কুরআনুল কারীম সদকা শব্দে ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা তোমার জন্য সদকা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে। এছাড়াও আরও বলেছেনঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্বের যামানায় এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত আর তার সন্তানদেরকে বলত যে, যখন কোন বিপদগ্রস্ত লোক আসে তখন তার কর্জ ক্ষমা করে দিও। হয়তো আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বলেনঃ অতঃপর (লোকটি মৃত্যুর পর) আল্লাহর সাক্ষাত পেল, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। [বুখারীঃ ৩৪৮০] অন্য এক হাদীসে এসেছেঃ "যে কেউ অভাবীকে অবকাশ দিবে তার জন্য কর্জ পরিশোধের সময় পর্যন্ত প্রতিদিন সদকার সওয়াব লেখা হবে। তারপর যদি আবার তাকে নতুন করে কর্জ পরিশোধের অবকাশ দেয় তবে কর্জ আদায় করার সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তার সদকার সওয়াব লেখা হবে। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৯, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৬০]
এ আয়াত থেকে শরীআতের এ বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, ইসলামী আদালাত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে যাতে তারা তাকে সময় দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীস এসেছে।

সূরা আল-বাকারার ২৭৫ থেকে ২৮০ এ ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সে ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান জিন আসর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান জিন দিশেহারা করে দেয়। [ইমাম ত্বাবারী সহীহ সনদে তার তাফসীরে বর্ণনা করেন।]

তাছাড়া সুদখোরের শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস এসেছে, যেমন: (১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোরকে লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে সুদ খায়, আর যে খাওয়ায়, আর যে লিখে এবং সুদের কর্মকাণ্ডের দুই সাক্ষী, তাদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহর লা'নত হোক। [ইবনে মাজাহঃ ২২৭৭] (২) আবু যুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, যিনার ব্যবসা থেকে নিষেধ করেছেন এবং সুদ দাতা, গ্রহীতা, শরীর খোদাই করে নকশা করা, যে করায়, যে ছবি অংকন করে, এদের সবার উপর লা'নত করেছেন। [বুখারীঃ ৫৯৬২] (৩) সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই তার সাথীদের জিজ্ঞেস করতেনঃ তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে, সে তার নিকট বলত যা আল্লাহ চাইতেন। একদিন সকালে তিনি বললেনঃ রাতে (স্বপ্নে) আমার নিকট দু'জন আগন্তুক (ফেরেশতা) আসল। আমাকে তারা উঠাল। তারপর আমাকে বললঃ চলুন। আমি তাদের দু' জনের সাথে চললাম। ... সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নদীর নিকট পৌছলাম। ... সে নদীতে একজনকে সাতরাতে দেখলাম। নদীর পাড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের এক স্তুপ। সাতারকারী লোকটি সাতরানো শেষ করে যার

নিকট পাথরের স্তুপ ছিল তার নিকট এসে মুখ খুলে দিত। আর সে তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। তারপর সে সাতরাতে চলে যেত। সাতরিয়ে ফিরে এসে আবার অনুরূপ মুখ খুলে দিত। আর ঐ লোকটি তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। .... শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরীল বললেনঃ আর যে লোক ঝর্ণায় সাতরাচ্ছিল, যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন, যে পাথরের লোকমা খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। [বুখারীঃ ৩৪৮০]

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

২৮১. আর তোমরা সেই দিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের যুলুম করা হবে না।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে নসীহত করে বলছেন যে, দুনিয়ার আবাস ক্ষণস্থায়ী। এখান থেকে খুব কম সময়ের পরই তোমাদেরকে চলে যেতে হবে। এখানকার যাবতীয় সম্পদ রেখেই সবাইকে খালি হাতে আমার সামনে আসতে হবে। সুতরাং সে দিনের ব্যাপারে সদা সতর্ক ও সাবধান থাকা জরুরী যখন তোমরা আমার সামনে নীত হবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্ম অনুসারে তোমাদেরকে শাস্তি বা পুরষ্কার দেয়া হবে। সায়ীদ ইবনে জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াত সবশেষে নাযিল হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯ দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে এর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র ৩১ দিন জীবিত ছিলেন

ফুটনোট

- রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করা যাবে।
- সুদখোরদের ভয়ানক পরিণতি বিশেষ করে যারা সুদ হারাম হবার কথা জানার পরেও বিরত থাকবে না।
- সূদ দুই প্রকার; ‘রিবাল ফাফ্ল’এবং ‘রিবান নাসীয়াহ’।
- সুদে সম্পদ বৃদ্ধি হয় না।
- ‘ব্যবসা তো সূদের মতই। এই রকম একটা ভূয়া যুক্তি জাহিলী যুগে সুদখোরা দিতো বর্তমান যুগেও কিছু মানুষ দিয়ে থাকে। তথচ দুইটার মধ্যে নৈতিক ও অর্থিক বিশাল তফাৎ রয়েছে।
- সুদখোরা দুটি অপরাধ করেছেঃ (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছেঃ ‘ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ।
- সুদ খেয়ে থাকলে তা থেকে তাওবাহ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি তাওবাহ করবে সে মূলধন পাবে।
- আখিরাতকে ভয় করে শরীয়ত গর্হিত সকল কর্ম বর্জন করা উচিত, কারণ আখিরাতের অবস্থা বড় কঠিন।
- ঈমানদারদের কোন ভয় নেই চিন্তিত হওয়ার কারণও নেই। ঈমানদারদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।
- আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২২

সূরা বাকারাহ ২৮২-২৮৩ আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

২৮২. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয়; কোন লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না, যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে; এবং যে ব্যক্তির উপর হক্ক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) সে যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং সে যেন তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তা থেকে কিছু যেন না কমায় (ব্যতিক্রম না করে)। অতঃপর যার উপর হক্ক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু সে বলে দিতে না পারে। তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু সে বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক নায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ, অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। আর তা (লেনদেন) ছোট-বড় যাই হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হয়ো না। এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর ও সাক্ষ্যদানের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ার জন্য অধিকতর উপযুক্ত। তবে তোমরা পরস্পর যে নগদ ব্যবসা পরিচালনা কর তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই। আর তোমরা যখন পরস্পর বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো। আর কোন লেখক

ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর, তবে তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী।

অত্র আয়াতকে "আয়াতুদ দাইন" বা ঋণের আয়াত বলা হয়। কুরআনুল কারীমের এটা সবচেয়ে বড় আয়াত। যেহেতু পূর্বের আয়াতে সুদকে কঠোরভাবে হারাম করে দান-সদাকাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে সেহেতু সমাজে বসবাসকারীদের মাঝে ঋণ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবেই। কারণ সুদ হারাম, সব মানুষ দান-সদাকাহ করার ক্ষমতা রাখে না। তাছাড়া সবাই দান-সদাকাহ নিতে পছন্দও করে না। সুতরাং প্রয়োজন সাড়ার অন্যতম উপায় ঋণ আদান-প্রাদান করা। ঋণ দেয়াও বড় ফযীলতের কাজ বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: কিয়ামতের দিন একজন লোককে আল্লাহ তা 'আলার সামনে আনা হবে। তাকে আল্লাহ তা 'আলা জিজ্ঞাসা করবেন: বল, তুমি আমার জন্য কী পুণ্য করেছ? সে বলবে: হে আল্লাহ! আমি এমন একটি অণু পরিমাণও পুণ্যের কাজ করতে পারিনি যার প্রতিদান আমি আপনার নিকট চাইতে পারি। আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় এটাই জিজ্ঞাসা করবেন এবং সে একই উত্তর দেবে। আল্লাহ তা'আলা আবার জিজ্ঞাসা করবেন তখন সে বলবে: হে আল্লাহ! একটি সামান্য কথা মনে পড়েছে। আপনি দয়া করে আমাকে কিছু সম্পদ দান করেছিলেন। আমি ব্যবসায়ী ছিলাম। লোক আমার নিকট হতে কর্জ নিয়ে যেতো। আমি যখন দেখতাম যে, এ লোকটি দরিদ্র এবং পরিশোধ করতে পারছে না তখন তাকে কিছু সময় অবকাশ দিতাম। ধনীদের ওপরও পীড়াপীড়ি করতাম না। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের ক্ষমা করে দিতাম। তখন আল্লাহ তা 'আলা বলেন: তাহলে আমি তোমার পথ সহজ করবো না কেন? আমি তো সর্বাপেক্ষা বেশি সহজকারী। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি জান্নাতে চলে যাও। (সহীহ বুখারী হা: ২০৭৭)

আলোচ্য আয়াতে কারিমাটি আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করেছিলেন প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। ওই সময়ে আরবদের কাছে আজকের মতো সহজলভ্য কাগজ ছিল না। তখন মানুষ লিখত পাতা, চামড়া বা হাড়ের উপরে। পড়ালেখা জানত হাতেগোনা কয়েকজন। সেই অবস্থায়ও আল্লাহ তা'য়ালা ঋণের ব্যাপারে লিখতে বলেছেন। এখান থেকেই বোঝা যায় লিখিত চুক্তি করা কতটা জরুরি। ঋণ নিয়ে মানুষের মধ্যে হাজারো সমস্যা হয় এজন্যই আল্লাহ তা'য়ালা স্বাক্ষীসহ লিখিত চুক্তি করার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। কিন্তু মুসলিম সমাজ নামাজ, রোজা, যাকাতকে ফরজ জেনে যেভাবে গুরুত্বের সাথে নিয়েছে, স্বাক্ষীসহ লিখিত চুক্তির ব্যাপারটা ফরজ হওয়ার পরেও তেমন গুরুত্ব দেন না।

আলোচ্য আয়াতে কারিমাটি হচ্ছে লেনদেন বা ঋণের উপর একটি আইন সঙ্কলন। এ আয়াতে কারিমায় লেনদেন সম্পর্কিত আইনের জরুরি মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর স্বাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে। এ আয়াতে কারিমায় লেনদেন সম্পর্কিত মৌলিক বিধিমালা জারি করা হয়েছে।

প্রথম বিধি- লিপিবদ্ধ করা

লেনদেনে সময় চুক্তি লিপিবদ্ধ করার নির্দেশনা বা লেনদেন সংক্রান্ত প্রথম মূলনীতি বা আইনের বিধান বর্ণনা করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতের প্রথমে বলেন, 'হে ঈমানগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পর ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে রাখ।'

আজকাল লেখালেখির যুগ, লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অতীতে দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলত। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কুরআনুল কারিম এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ আয়াতে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পর ঋণ দেওয়া-নেওয়া কর, তখন তা লিখে নাও।

এখানে প্রথম নির্দেশ এই যে, ধার-কর্জের লেনদেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত, যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোনো পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

সাধারণত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ঋণের লেন-দেনের ব্যাপারে দলীল বা প্রমাণপত্র লেখাকে এবং সাক্ষী রাখাকে দূষণীয় ও আস্থাহীনতার প্রকাশ মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর বাণী হচ্ছে এই যে, ঋণ ও ব্যবসায় সংক্রান্ত লেন-দেনের চুক্তি সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ লিখিত আকারে সম্পাদিত হওয়া উচিত। এর ফলে লোকদের মধ্যে লেনদেন পরিষ্কার থাকবে। হাদীসে বলা হয়েছে তিন ধরনের লোক আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে কিন্তু তাদের ফরিয়াদ শোনা হয় না। এক, যার স্ত্রী অসচ্চরিত্র কিন্তু সে তাকে তালাক দেয় না। দুই, এতিমের বালেগ হবার আগে যে ব্যক্তি তার সম্পদ তার হাতে সোপর্দ করে দেয়। তিন, যে ব্যক্তি কাউকে নিজের অর্থ ঋণ দেয় এবং তাতে কাউকে সাক্ষী রাখে না।

দ্বিতীয় বিধি- লেনদেনে সময় নির্দিষ্ট করা

দ্বিতীয় নির্দেশ হলো ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ বা সময় অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেনদেন বৈধ নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

এ কারণেই ফিকাহবীদগণ বলেছেন, মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনোরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন 'ধান কাটার সময়' এরূপ নির্ধাতির করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধান কাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে।

তৃতীয় বিধি- দলিল বা চুক্তি লেখকের মাধ্যমে লিখে নেয়া

এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোন এক পক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে - যাতে কারো মনে সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের

চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

চতুর্থ বিধি- লেখক ঋণ গ্রাহীতার কথা মতো লিখবেন

এরপর দলীল কোন্ পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ **"যে ব্যক্তির উপর হক্ব রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) সে যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়।"** চুক্তিনামার শর্ত, ঋণ গ্রহন কারীই বলবে। অর্থাৎ যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকী রাখল। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারপত্র।

আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কমবেশি না করে। এখানে ঋণগ্রহীতাকে বুঝানো হয়েছে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং টাকার যেন সঠিক পরিমাণ লেখায়, কম করে যেন না লেখায়। অথাৎ, চুক্তি লেখার সময় সব শর্ত বলবে ঋণ গ্রহীতা, ঋণ দাতা নয়।

পঞ্চম বিধি- ঋণ গ্রহীতা অপারগ হলে অভিভাবকের মাধ্যমে শর্ত নির্ধারণ করা

ঋণ গ্রহীতা অপারগ হলে অভিভাবকের মাধ্যমে শর্ত নির্ধারণ করতে হবে। ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বা শর্ত বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে দলিল বা চুক্তি লেখা সংক্রান্ত নিয়ম বর্ণনা করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতে কারিমার পরের অংশে বলেন: 'কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, অথবা সে লেখার বিষয়বস্তু না বলে দিতে পারে, তাহলে তার অভিভাবক যেন ইনসাফের সাথে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়।'

লেনদেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনো নির্বোধ বা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মুক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলিলের বিষয়বস্তু বলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোনো অভিভাবক চুক্তি লেখাবে। যেমন পাগল ও নাবালেগের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মুক ও অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কুরআনুল কারীমের 'ওলী' শব্দটি উভয় অর্থই বোঝায়। এ আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে, অনন্তর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বা শর্ত বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লেখায়।

ষষ্ঠ বিধি- লেনদেনের সময় বিশ্বস্ত স্বাক্ষী রাখা

এ পর্যন্ত লেনদেনে দলীল লেখা ও লেখানোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষীও রাখবে—যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফিকবিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরীয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না।

আয়াতে এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ (১) সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়। অনুরূপভাবে (২) সাক্ষী মুসলিম হতে হবে। (مِنْ رِجَالِكُمْ) শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষী নির্ভরযোগ্য আদিল' (বিশ্বস্ত) হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ পাপাচারী) হলে চলবে না। (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

সপ্তম বিধি- লেনদেনে স্বাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সাক্ষীর বিরক্ত না হওয়া

শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গোনাহ্ঃ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেনদেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছেঃ লেনদেন ছোট হোক কিংবা বড় হোক —সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেনদেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে।

অষ্টম বিধি- ইচ্ছা হলে নগদ লেনদেনে না লিখে রাখা

'তবে তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ লেনদেন কর, তা না লিখলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।'

এ আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে, ব্যবসায় যে নগদ আদান-প্রদান কর, তা না লিখলে কোনো দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পর বেচাকেনা কর, তখন স্বাক্ষী রাখ। এর অর্থ হচ্ছে, যদিও নিত্যদিনের কেনাবেচার ক্ষেত্রে লেনদেনের বিষয়টি লিখিত থাকা ভালো, যেমন আজকাল ক্যাশ মেমো লেখার পদ্ধিত প্রচলিত আছে, তবুও এমনটি করা অপরিহার্য নয়। অনুরূপভাবে প্রতিবেশী ব্যসায়ীরা পরস্পরের মধ্যে রাত দিন যেসব লেনদেন করতে থাকে, সেগুলোও লিখিত আকারে না থাকলে কোনো ক্ষতি নেই।

নবম বিধি- ঋণ চুক্তির লেখক ও স্বাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা

'আর তোমরা স্বাক্ষী রাখ, যখন তোমরা বেচাকেনা করবে এবং কোনো লেখক ও স্বাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা কর, তাহলে নিশ্চয় তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'

আয়াতের শুরুতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও স্বাক্ষী দিতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়ত মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারত। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে, কোনো লেখক বা স্বাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। নিজের উপকারের জন্য যেন তাদের বিব্রত না করা হয়।

এরপর বলা হয়েছে, তোমরা যদি লেখক বা স্বাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ হবে। এজন্য লেখক কিংবা স্বাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহগণের মতে, লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবি করে কিংবা স্বাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের নায্য অধিকার। তা না দেয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত

ও বিব্রত করার শামিল। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় স্বাক্ষীকে স্বাক্ষ্যদানে বাধ্য করেছে এবং স্বাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে।

আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্ভুল নীতি শিক্ষা দেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে অনেক বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ফিকহবিদ এ আয়াত থেকে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা বের করেছেন। কোরআন পাকের সাধারণ রীতি এই যে, আইন বর্ণনা করার আগে ও পরে আল্লাহ্-ভীতি ও প্রতিদান দিবসের ভীতি স্মরণ করিয়ে মানুষের মনকে নির্দেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এই রীতি অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত আল্লাহ্-ভীতি দ্বারা শেষ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন নয়। তোমরা যদি কোন অবৈধ বাহানার মাধ্যমেও বিরুদ্ধাচরণ কর, তবুও আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে পারবে না।

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে। অতঃপর তোমাদের একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করলে, যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। আর যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবগত।

যদি সফরে ঋণ লেনদেনের প্রয়োজন পড়ে এবং সেখানে লেখার লোক অথবা কাগজ-কলম ইত্যাদি না থাকে, তাহলে তার বিকল্প ব্যবস্থা হল, ঋণগ্রহীতা কোন জিনিস ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বন্ধক রাখা শরীয়ত সম্মত একটি বৈধ জিনিস। নবী করীম (সাঃ)ও তাঁর লোহার বর্মটি একজন ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। (বুখারী ২২০০নং,মুসলিম) এই বন্ধক রাখা জিনিসটি যদি এমন হয় যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাহলে তার উপকারিতার অধিকারী হবে মালিক; ঋণদাতা নয়। অবশ্য বন্ধকে রাখা জিনিসে যদি ঋণদাতার কোন কিছু ব্যয় হয়, তবে সে তার খরচ নিতে পারবে। খরচ নিয়ে নেওয়ার পর অবশিষ্ট লাভ মালিককে দেওয়া জরুরী হবে।

অর্থাৎ, তোমাদের একে অপরের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে কিছু বন্ধক রাখা ছাড়াই ঋণের আদান-প্রদান করতে পার। (এখানে 'আমানত' অর্থ ঋণ।) আল্লাহকে ভয় করে তা (আমানত) সঠিকভাবে আদায় কর।

সাক্ষ্য গোপন করা কাবীরা গুনাহ। এই জন্যই এর কঠোর শাস্তির কথা কুরআনের এই আয়াতে এবং বহু হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ফযীলতও অনেক। এক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ''আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষীদাতার কথা বলে দিবো না? সে হল এমন লোক, যার কাছে সাক্ষী তলব করার পূর্বেই সে নিজেই সাক্ষী নিয়ে উপস্থিত হয়ে যায়।'' (মুসলিম ১৭১৯নং) অপর এক বর্ণনায় নিকৃষ্টতম সাক্ষীদাতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, ''আমি কি তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম সাক্ষীদাতাদের কথা বলে দিবো না?

তারা এমন লোক, যাদের নিকট সাক্ষী চাওয়ার পূর্বেই তারা সাক্ষী দেয়।'' (মুসলিম ২৫৩৫নং) অর্থাৎ, এরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মহাপাপ সম্পাদন করে। আলোচ্য আয়াতে বিশেষ করে অন্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, গোপন করা অন্তরের কাজ। তাছাড়া অন্তর হল অন্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নেতা। এটা গোশতের এমন এক টুকরা যে, যদি এটা ঠিক থাকে, তাহলে সারা দেহ ঠিক থাকবে। আর যদি এর মধ্যে খারাবী আসে, তাহলে সমস্ত দেহ খারাবীর শিকার হয়ে পড়বে।

শোন! শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে যে, যদি তা ঠিক থাকে, তাহলে সারা দেহ ঠিক থাকবে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সারা দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। শোন! তা হল, অন্তর।'' (বুখারী ৫২নং)

ফুটনোট

- সূরা বাকারাহ-এর ২৮২ নং আয়াত কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত। অত্র আয়াতকে ''আয়াতুদ দাইন'' বা ঋণের আয়াত বলা হয়।
- আগের আয়াতগুলোতে সুদের বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এর বিপরীতে ইসলাম সমাধান হিসাবে দান-সাদকা এবং কর্দে হাসান বিষয় নিয়ে এসেছে।
- লেনদেন সম্পর্কিত মৌলিক বিধিমালা হলো-
    - **প্রথম বিধি- লিপিবদ্ধ করা**
    - **দ্বিতীয় বিধি- লেনদেনে সময় নির্দিষ্ট করা**
    - তৃতীয় বিধি- **দলিল বা চুক্তি লেখকের মাধ্যমে লিখে নেয়া**
    - চতুর্থ বিধি- লেখক ঋণ গ্রাহীতার কথা মতো লিখবেন
    - পঞ্চম বিধি- **ঋণ গ্রহীতা অপারগ হলে অভিভাবকের মাধ্যমে শর্ত নির্ধারণ করা**
    - ষষ্ঠ বিধি- **লেনদেনের সময় বিশ্বস্ত স্বাক্ষী রাখা**
    - **সপ্তম বিধি- লেনদেনে স্বাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সাক্ষীর বিরক্ত না হওয়া**
    - **অষ্টম বিধি- ইচ্ছা হলে নগদ লেনদেনে না লিখে রাখা**
    - **নবম বিধি- ঋণ চুক্তির লেখক ও স্বাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা**
- সাক্ষীর বিধান - **সংখ্যাঃ** সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু' জন মহিলা সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়।
  গুণাবলীঃ (১) সাক্ষী মুসলিম হতে হবে। (২) সাক্ষী নির্ভরযোগ্য আদিল' (বিশ্বস্ত) হতে হবে,
- সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের পরিবর্তে দুইজন দুইজন স্ত্রীলোক কেন? এর উত্তরে বলা হয়েছে- যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
- লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।
- সফরে ঋণ লেনদেনের প্রয়োজন পড়ে এবং সেখানে লেখার লোক অথবা কাগজ-কলম ইত্যাদি না থাকে, তাহলে তার বিকল্প ব্যবস্থা হল, ঋণগ্রহীতা কোন জিনিস ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখবে।
- সাক্ষ্য গোপন করা কাবীরা গুনাহ।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২৩

সূরা বাকারাহ ২৪৪-২৮৬আয়াত

لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২৮৪. আল্লাহর জন্যই যা আছে আসমানসমূহে ও যা আছে যমীনে। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ সেগুলোর হিসেব তোমাদের কাছ থেকে নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (لِلّهِ ما فِي السَّمَاواتِ ......قَدِيرٌ) এ আয়াত নাযিল হলে বিষয়টি সাহাবীদের ওপর খুব কঠিন হয়ে যায়। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসল এবং জানু ভরে বসে পড়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে সালাত, সিয়াম, জিহাদ এবং দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা আমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু এখন যে আয়াত নাযিল হয়েছে তা পালন করার শক্তি আমাদের নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা কি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের মত বলতে চাও আমরা শুনলাম আর মানলাম না? বরং তোমাদের বলা উচিত: আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন, আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান হা:১২৭)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা’আলার রুবুবিয়্যাহর আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যেমনি আকাশ ও জমিনের একচ্ছত্র মালিক। সকল কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাজত্ব তাঁর হাতে, তেমনি কাউকে ক্ষমা করা আর না করার কর্তৃত্বও তাঁর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাত দিতে পারেন, এটা আল্লাহ তা ‘আলার অনুগ্রহ। আবার যাকে ইচ্ছা তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন, এতে তিনি জালিম হবেন না বরং তিনি ন্যায়পরায়ণ। কাউকে ক্ষমা করা আর না করার কর্তৃত্ব কোন নাবী-রাসূল, ওলী-আউলিয়া ও পীর-বুযুর্গকে দেয়া হয়নি।

ইবনু উমার (রাঃ) বলেন: (....إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) এ আয়াতটি তার পরের আয়াত তথা ২৮৬ নং আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫৪৬)

বুখারী-মুসলিম এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসটিও এর সমর্থন করে, “অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরে উদীয়মান খেয়ালের কোন বিচার করবেন না, যে পর্যন্ত না তা কাজে পরিণত করবে অথবা মুখে উচ্চারণ করবে। (বুখারী ২৫২৮-মুসলিম ১২৭নং) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্তরে উদিত খেয়ালের কোন হিসাব হবে না। কেবল সেই খেয়ালের হিসাব হবে, যা কাজে পরিণত করা হবে। (উক্ত) আয়াতের ব্যাপারে ইমাম ইবনে জারীরের বিপরীত মন্তব্য রয়েছে। তাঁর খেয়াল হল, আয়াতকে রহিত করা হয়নি। কেননা, হিসাব হলেই যে শাস্তি হবে তা জরুরী নয়। অর্থাৎ, এটা জরুরী নয় যে, মহান আল্লাহ যারই হিসাব নিবেন, তাকেই শাস্তি দিবেন। বরং তিনি হিসাব তো প্রত্যেকেরই নিবেন, কিন্তু অনেক মানুষ এমনও থাকবে যাদের হিসাব নেওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। কিছু লোকের সাথে তো এমনও ব্যবহার করা হবে যে, তাদের একটি একটি পাপকে স্মরণ করিয়ে স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন, দুনিয়ায় এই পাপগুলোকে আমি গোপন করে রেখেছিলাম। যাও, আজ এগুলোকে আমি মাফ করে দিলাম। (এই হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর) কোন কোন উলামা বলেছেন, এখানে ‘নাসখ’ (রহিত করণ) পারিভাষিক অর্থে বলা হয়নি, বরং কখনো কখনো ‘নাসখ’ ব্যবহার করা হয় কোন জিনিসকে আরো পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করে দেওয়ার অর্থে। তাই সাহাবাদের অন্তরে এই আয়াত থেকে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল সেটাকে দূর করে দেওয়া হল

{لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} এই আয়াত এবং “অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরের খেয়ালের বিচার করবেন না---। এই হাদীস দ্বারা। এভাবে উভয় আয়াতের একটিকে ‘নাসিখ’ এবং অপরটি ‘মানসূখ’ ভাবার কোন প্রয়োজন হবে না।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

২৮৫. রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ এবং তার রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগনের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলেঃ আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব। আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।

এ আয়াত দু’টি হচ্ছে সম্পূর্ণ সূরার এমনি এক পরিশিষ্ট ও সংক্ষিপ্তসার যাতে সূরার মূল আলোচিত বিষয়গুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এতে ঈমানের ধরন ও সত্যিকার মু’মিনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে এবং বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

ফযীলত: ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি সূরা বাকারার এ আয়াত দু’টি রাতে তেলাওয়াত করবে তার জন্য এ দু’টিই (রাতের ইবাদত হিসেবে ও সকল অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য) যথেষ্ট। (সহীহ বুখারী হা: ৪০০৮)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমাকে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ দু’টি আয়াত আরশের নীচের ধনভাণ্ডার থেকে দেয়া হয়েছে। আমার পূর্বে কোন নাবীকে তা দেয়া হয়নি। (হাকিম: ১/৫৫৯, সিলসিলা সহীহাহ হা:১৪৮২)

নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা আকাশ-জমিন সৃষ্টি করার দু’হাজার বছর আগে একটি কিতাব লিখেছেন তা থেকে সূরা বাকারার শেষ দু’টি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যে বাড়িতে তিন রাত এ আয়াতদ্বয় তেলাওয়াত করা হবে সে বাড়িতে শয়তান থাকবে না। (তিরমিযী হা: ২৮৮২, সনদ সহীহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা— রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা’আলা এ দু’টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা’আলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর এ দু’টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদরাক হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা’আলা এ দু’টি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে এ দু’টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু’টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

এ ছাড়াও সূরা বাকারার শেষ দু’টি আয়াতের আরো অনেক ফযীলত রয়েছে।

এ আয়াতদ্বয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাকারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে অনুগত মু’মিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা’আলার যাবতীয় বিধান শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মনে দেখা দিয়েছিল।প্রশ্নটি ছিল এই - যখন এ আঘাত অবতীর্ণ হলোঃ

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ অর্থাৎ ’তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা’ আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ্ তা’আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও ত্রুটি বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যত ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেওয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রসূল (সা)-এর কাছে আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী (সা) আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে আপাতত আদেশ দিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন–মু’মিনের কাজ তো মেনে নেওয়া। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা’ আলার প্রত্যেক আদেশ শুনে তোমাদের একথা বলা উচিতঃ

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ অর্থাৎ– হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোন ত্রুটি বা ভুল হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করুন। কেননা, আমাদের সবাইকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মত কাজ করলেন; যদিও তাঁদের মনে এ খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ দ'টি আয়াত নাযিল করেন। প্রথম আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম আয়াতটি হচ্ছেঃ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থাৎ রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী (সা)-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'রসূল' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেনঃ وَالْمُؤْمِنُونَ অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর যেমন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস আছে তেমনি সাধারণ মু'মিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রাসূল (সা)-এর বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মু'মিনদের বিশ্বাস পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বর্ণনাভঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখার ভিত্তিতে।

এরপর মহানবী (সা) ও অন্য মু'মিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ঈমানের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি পূর্ণতার যাবতীয় গুণে তাঁর গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ তা'আলার গ্রন্থাবলী ও পয়গম্বরগণের সকলেরই সত্য হওয়ার প্রতি। এরপর বলা হয়েছে যে, এ উম্মতের মু'মিনগণ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মত আল্লাহ্ তা' আলার পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রভেদ করবে না যে, কাউকে পয়গম্বর মানবে এবং কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদীরা হযরত মূসা (আ)-কে এবং খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে পয়গম্বর মানে, কিন্তু শেষ নবী (সা)-কে পয়গম্বর মানে না। এ উম্মতের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন পয়গম্বরকে অস্বীকার করে না। এরপর সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুখে এ বাক্য বলেছিলেনঃ

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

২৮৬. আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে তার প্রতিফল তার উপরই বর্তায়। হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না যার সামর্থ আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও ত্রুটি-বিচুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে, অনিচ্ছকৃত ধারণারও হিসাব নেয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়।

মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে আপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন - মুমিনের কাজ হলো তা মেনে নেয়া। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশমত কাজ করলেন; যদিও তাদের মনে এ সংশয় ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে মুসলিমদের আনুগত্যের প্রশংসা করেন এবং বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজের নির্দেশ দেন না।

কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কু-চিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ তা'আলার কাছে মাফযোগ্য। যেসব কাজ ইচ্ছে করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে। কুরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৪১২, ১/৩৩২: মুসলিম: ১২৫] তারপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে একটি বিশেষ দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

যাতে ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষমা প্রার্থনার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের মত শাস্তিও যেন এ উম্মতের উপর না আসে, তার জন্য বিশেষভাবে দো'আ করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না।

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের সামর্থ্য অনুযায়ী তার দায়িত্ব বিবেচিত হয়। মানুষ কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখে না অথচ আল্লাহ তাকে সে কাজটি না করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এমনটি কখনো হবে না। অথবা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ বা জিনিস থেকে দূরে থাকার সামর্থ্যই মানুষের ছিল না, সেক্ষেত্রে তাতে জড়িত হয়ে পড়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, নিজের শক্তি-সামর্থ্য আছে কিনা, এ সম্পর্কে মানুষ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কিসের শক্তি-সামর্থ্য ছিল আর কিসের ছিল না-এ সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে গোনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তারই উপর বর্তাবে।

এটি আল্লাহ প্রদত্ত মানবিক ইখতিয়ার বিধির দ্বিতীয় মূলনীতি। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে কাজ করেছে তার পুরস্কার পাবে। একজনের কাজের পুরস্কার অন্যজন পাবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে দোষ করেছে সেজন্য পাকড়াও হবে। একজন দোষ করবে আর অন্যজন পাকাড়ও হবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। তবে এটা সম্ভব, এক ব্যক্তি কোন সৎকাজের ভিত্তি রাখলো এবং দুনিয়ায় হাজার বছর পর্যন্ত তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো, এক্ষেত্রে এগুলো সব তার আমলনামায় লেখা হবে। আবার অন্য এক ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের ভিত্তি রাখলো এবং শত শত বছর পর্যন্ত দুনিয়ায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো। এ অবস্থায় এ গুলোর গোনাহ ঐ প্রথম জালেমের আমলনামায় লেখা হবে। তবে এক্ষেত্রে ভালো বা মন্দ যা কিছু ফল হবে সবই হবে মানুষের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি। মোটকথা যে ভালো বা মন্দ কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা, সংকল্প, প্রচেষ্টা ও সাধনার কোন অংশই নেই, তার শাস্তি বা পুরস্কার সে পাবে, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কর্মফল হস্তান্তর হওয়ার মতো জিনিস নয়।

হে আমাদের রব! ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা যেসব গোনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না। হে প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে।

অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তীরা তোমার পথে চলতে গিয়ে যেসব পরীক্ষা, ভয়াবহ বিপদ, দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটের সম্মুখীন হয়, তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো। যদিও আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করার সংকল্প করেছে, তাকেই তিনি কঠিন পরীক্ষা ও সংকটের সাগরে নিক্ষেপ করেছেন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হলে মু'মিনের কাজই হচ্ছে, পূর্ণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করা, তবুও মু'মিনকে আল্লাহর কাছে এই দোয়াই করতে হবে যে, তিনি যেন তার জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা সহজ করে দেন।

হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না।

অর্থাৎ সমস্যা ও সংকটের এমন বোঝা আমাদের ওপর চাপাও, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যে পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্বাধীন তেমনি পরীক্ষায় আমাদের নিক্ষেপ করো। আমাদের

সহ্য ক্ষমতার বেশী দুঃখ-কষ্ট-বিপদ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। তাহলে আমরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো।

এই দোয়াটির পূর্ণ প্রাণসত্তা অনুধাবন করার জন্য এর নিম্নোক্ত প্রেক্ষাপটটি সামনে রাখতে হবে। হিজরতের প্রায় এক বছর আগে মি'রাজের সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তখন মক্কায় ইসলাম ও কুফরের লড়াই চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলমানদের মাথায় বিপদ ও সংকটের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। কেবল মক্কাতেই নয়, আরব ভূ-খণ্ডের কোথাও এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে কোন ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার জন্য আল্লাহর যমীনে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েনি। এ অবস্থায় মুসলমানদের আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হলো। দানকারী নিজেই যখন চাওয়ার পদ্ধতি বাতলে দেন তখন তা পাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই এই দোয়া সেদিন মুসলমানদের জন্য অসাধারণ মানসিক নিশ্চিন্ততার কারণ হয়। এছাড়াও এই দোয়ায় পরোক্ষভাবে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে কখনো অসঙ্গত ও অনুপযোগী ধারায় প্রবাহিত করো না বরং সেগুলোকে এই দোয়ার ছাঁচে ঢালাই করো। একদিকে নিছক সত্যানুসারিতা ও সত্যের প্রতি সমর্থন দানের কারণে লোকদের ওপর যেসব হৃদয় বিদারক জুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে শত্রুদের বিরুদ্ধে সামান্য তিক্ততার নামগন্ধও নেই। একদিকে এই সত্যানুসারীরা যেসব শারীরিক দুর্ভোগ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে পার্থিব স্বার্থের সামান্য প্রত্যাশাও নেই, একদিকে সত্যানুসারীদের চরম দুরবস্থা দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়ায় উৎসারিত উন্নত ও পবিত্র আবেগ–উদ্দীপনা দেখুন। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সে সময় ঈমানদারদের কোন্ ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন দেয়া হচ্ছিল, তা সঠিক ও নির্ভুলভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

ফুটনোট

- সূরা বাকারাহের শেষ দুই আয়াতের অনেক ফযীলত রয়েছে। তাই আমরা চেষ্টা করবো এই দুই আয়াত মুখস্ত করে নেওয়ার। এই দোয়াগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শিখিয়ে দিচ্ছিন। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে এই দোয়াগুলো কাজে লাগবে।
- আল্লাহ কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না।
- প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে গোনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তারই উপর বর্তাবে।
- ঈমান আনার বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে- আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ এবং তার রাসূলগণের উপর।
- মুমিন রাসূলগনের কারও মধ্যে তারতম্য করে না।
- ঈমানদারদের সামনে যখন আল্লাহ্র কোনো বিধান আসে তখন তারা বলে- আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২৪ (শেষ পর্ব)

সূরা ফাতিহা

‘সূরাতুল ফাতিহাহ’ অর্থ মুখবন্ধ বা ভূমিকার সূরা। ইমাম কুরতুবী বলেন, একে ‘ফাতিহাহ’ এজন্য বলা হয় যে, এই সূরার মাধ্যমে কুরআন পাঠ শুরু করা হয়। এই সূরার মাধ্যমে কুরআনের সংকলন কাজ শুরু হয়েছে এবং এই সূরার মাধ্যমে সালাত শুরু করা হয়’। এটি মক্কায় অবতীর্ণ ১ম ও পূর্ণাঙ্গ সূরা। এতে ৭টি আয়াত, ২৫টি কালেমা বা শব্দ এবং ১১৩টি হরফ বা বর্ণ রয়েছে। সূরাটি কুরআনের মূল, কুরআনের ভূমিকা ও ছালাতের প্রতি রাক‘আতে পঠিতব্য সাতটি আয়াতের সমষ্টি ‘আস-সাব‘উল মাছানী’ নামে সহীহ হাদীসে ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেন - ‘আমরা তোমাকে প্রদান করেছি বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন’ *(হিজর ১৫/৮৭)*।

নামকরণ

ভিন্ন হাদীস, আছার ও বিদ্বানগণের নামকরণের মাধ্যমে অন্যূন ৩০টি নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সহীহ হাদীসসমূহে এসেছে ৮টি। যেমন : (১) উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল)। (২) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল)। (৩) আস-সাব‘উল মাছানী (সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত)। (৪) আল-কুরআনুল ‘আযীম (মহান কুরআন)। (৫) আল-হামদু (যাবতীয় প্রশংসা)। (৬) সালাত। (৭) রুক্বিয়াহ (ফুঁকদান)। (৮) ফাতিহাতুল কিতাব (কুরআনের মুখবন্ধ)।

সূরা ফাতিহার আরো কিছু নাম হলো- শিফা (আরোগ্য), আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি), কাফিয়াহ (যথেষ্ট), ওয়াফিয়াহ (পূর্ণ), ওয়াক্বিয়াহ (হেফাযতকারী), ফাতিহাতুল কুরআন, সূরাতুল হাম্দ, শুক্র, ফাতিহাহ, মিন্নাহ, দো‘আ, সওয়াল, মুনাজাত, তাফভীয, মাসআলাহ, রা-ক্বিয়াহ, নূর, আল-হাম্দুলিল্লাহ, ইল্মুল ইয়াক্বীন, সূরাতুল হাম্দিল ঊলা, সূরাতুল হাম্দিল কুছরা’। এইভাবে নাম বৃদ্ধির ফলে সূরা ফাতিহার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবতরণকাল

সর্বপ্রথম সূরা ‘আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত মক্কায় নাযিল হয়। অতঃপর কয়েক দিন অহি-র বিরতিকাল শেষে সূরা মুদ্দাছ্ছির-এর প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হয়। অন্য বর্ণনায় ৭টি আয়াতের কথা এসেছে। তারপরে সর্বপ্রথম পূর্ণাংগ সূরা হিসাবে সূরা ফাতিহা নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু

আসলে এ সূরাটি হচ্ছে একটি দোয়া। যে কোন ব্যক্তি এ গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলে আল্লাহ প্রথমে তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দেন। গ্রন্থের শুরুতে এর স্থান দেয়ার অর্থই হচ্ছে এই যে, যদি যথার্থই এ গ্রন্থ থেকে তুমি লাভবান হতে চাও, তাহলে নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করো।
মানুষের মনে যে বস্তুটির আকাংখা ও চাহিদা থাকে স্বভাবত মানুষ সেটিই চায় এবং সে জন্য দোয়া করে। আবার এমন অবস্থায় সে এই দোয়া করে যখন অনুভব করে যে, যে সত্তার কাছে সে দোয়া করছে তার আকাংখিত বস্তুটি তারই কাছে আছে। কাজেই কুরআনের শুরুতে এই দোয়ার শিক্ষা দিয়ে যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া

হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান লাভের জন্য এ গ্রন্থটি পড়, সত্য অনুসন্ধানের মানসিকতা নিয়ে এর পাতা ওলটাও এবং নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন জ্ঞানের একমাত্র উৎস--- একথা জেনে নিয়ে একমাত্র তাঁর কাছেই পথনির্দেশনার আর্জি পেশ করেই এ গ্রন্থটি পাঠের সূচনা কর।

এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন ও সূরা ফাতিহার মধ্যকার আসল সম্পর্ক কোন বই ও তার ভূমিকার সম্পর্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এ মধ্যকার আসল সম্পর্কটি দোয়া ও দোয়ার জবাবের পর্যায়ভুক্ত। সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন- এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ।

দো'আর আদব :

অত্র সূরাতে দো'আ করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ১ম হ'তে ৩য় আয়াত পর্যন্ত যার নিকটে প্রার্থনা করা হবে, সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। অতঃপর ৪র্থ আয়াতে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছে ও কেবলমাত্র তাঁর নিকট থেকেই সাহায্য কামনার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর ৫ম আয়াতে মূল দো'আর বিষয়বস্তু সিরাতে মুস্তাক্বীম-এর হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতদ্বয় মূলতঃ ৫ম আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে। এইভাবে প্রার্থনা নিবেদন শেষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে 'আমীন' বলে দো'আ কবুলের আবেদন করতে বলেছেন। মোটকথা প্রথমে প্রশংসা ও আনুগত্য নিবেদন করার পরে দো'আ পেশ করা হয়েছে। একইভাবে সালাতের বাইরে আল্লাহর জন্য হামদ ও রাসূল (সাঃ)-এর উপর দরূদ পেশ করার পরে দো'আ করা হ'ল দো'আর সুন্নাতী তরীকা।

সূরা ফাতিহার বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত

(১) এই সূরা কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদামন্ডিত সূরা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তাওরাত, যবূর, ইনজীল এবং কুরআনে এই সূরার তুলনীয় কোন সূরা নেই।[বুখারী হা/৪৭০৩; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪২]

(২) এই সূরা এবং সূরায়ে বাক্বারাহর শেষ তিনটি আয়াত হল আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত বিশেষ নূর, যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। [মুসলিম হা/৮০৬ অধ্যায়-৬, 'সূরা ফাতিহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৪৩, মিশকাত হা/২১২৪]

(৩) উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, *(লা ছালা-তা লিমান লাম ইয়াক্বরা' বিফা-তিহাতিল কিতা-ব)* 'ঐ ব্যক্তির সালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না'।

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'ঐ সালাত সিদ্ধ নয়, যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না'...।

(৬) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন ও তিনি সুস্থ হন...। এজন্য এ সূরাকে রাসূল (সাঃ) 'রুক্বইয়াহ' (الرُّقْيَةُ) বলেছেন। কেননা এই সূরা পড়ে ফুঁক দিলে আল্লাহর হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

(৭) ইমাম কুরতুবী বলেন, সূরা ফাতিহাতে যে সকল 'ছিফাত' রয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই। এমনকি একেই 'আল-কুরআনুল আযীম' বা মহান কুরআন বলা হয়েছে (*হিজর ১৫/৮৭*)।

পরের সূরার সাথে সম্পর্কঃ এই সূরার ৫ম আয়াতে আমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান চাই। তার রেসপন্স আল্লাহ পরের (২য়) সূরা আল বাকারাতেই দিয়ে দিয়েছেন। সূরার ২য় আয়াতেই কুরআনকেই আল্লাহ সরল সঠিক পথ হিসাবে বর্ননা করেছেন!

শেষ সূরার সাথে মিলঃ সূরা আল ফাতিহার ১ম আয়াতে 'রব্বিল আলামীন' (সারা জাহানের রব) বলা হয়েছে আল্লাহকে আর শেষ সূরায় 'রব্বিন নাস' (মানুষের রব) বলা হয়েছে। সূরা আল ফাতিহার ৩য় আয়াতে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (বিচার দিনের মালিক) বলা হয়েছে আর সূরা আন নাসের ২য় আয়াতে 'মালিকিন নাস' (মানুষের মালিক) বলা হয়েছে। সূরা আল ফাতিহার ৪র্থ আয়াতে 'ইয়্যাকা না'বুদু' (আমরা তোমারই ইবাদত করি) বলা হয়েছে আর সূরা আন নাসের ৩য় আয়াতে বলা হচ্ছে 'ইলাহিন নাস' (মানুষের মাবুদের নিকট)। সূরা আল ফাতিহায় পথনির্দেশ চাওয়া হয়েছে আর সূরা আন নাসে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলাম মানুষকে একটি বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি রীতি। সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এ রীতির অনুসারী হলে অনিবার্যভাবে তিনটি সুফল লাভ করা যাবে। একঃ মানুষ অনেক খারাপ কাজ করা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কারণ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার অভ্যাস তাকে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে একথা চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, যথার্থই এ কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার তার আছে কি না? দুইঃ বৈধ সঠিক ও সৎকাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহর নাম নেয়ার কারণে মানুষের মনোভাব ও মানসিকতা সঠিক দিকে মোড় নেবে। সে সবসময় সবচেয়ে নির্ভুল বিন্দু থেকে তার কাজ শুরু করবে। তিনঃ এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নামে যখন সে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগী হবে। তার প্রচেষ্টায় বরকত হবে। শয়তানের বিপর্যয় ও ধ্বংসকারিতা থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখা হবে। বান্দা যখন আল্লাহর দিকে ফেরে তখন আল্লাহও বান্দার দিকে ফেরেন, এটাই আল্লাহর রীতি।

বিভিন্ন শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে বহু হাদীছ এসেছে। 'বিসমিল্লাহ' হল দুষ্ট জিন ও মানুষের লজ্জাস্থানের পর্দা স্বরূপ। গৃহে প্রবেশ করা ও বের হওয়া, বাড়ীর দরজা বন্ধ করা, বাতি নেভানো, পাত্র ঢাকা, বোতলের মুখ লাগানো, চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা, ওযূ-গোসল, খানা-পিনা, যবহ ইত্যাদি সকল শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার জন্য হাদীছে স্পষ্টভাবে নির্দেশ এসেছে। কিন্তু যেসকল ইবাদতের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলার বিধান নেই, সেসবের শুরুতে তা বলা যাবে না। যেমন আযান, ইক্বামত, ছালাত প্রভৃতির শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা। এ ব্যাপারে আরও বহু সহীহ হাদীস এসেছে। আবার কোথাও কোথাও 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিবও বটে যেমন, যবাই করতে [বুখারী: ৯৮৫, মুসলিম: ১৯৬০]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১. সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

আরবী ভাষায় **হামদ** অর্থ নির্মল ও সম্ভ্রমপূর্ণ প্রশংসা। গুণ ও সিফাত সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়ে থাকে। তা ভালও হয় আবার মন্দও হয়। কিন্তু হামদ শব্দটি কেবলমাত্র ভাল গুণ প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশ্ব জাহানের যা কিছু এবং যতকিছু ভাল, সৌন্দর্য-মাধুর্য, পূর্ণতা মাহাত্ম দান ও অনুগ্রহ রয়েছে তা যেখানেই এবং যে কোন রূপে ও যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তা সবই একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট, একমাত্র তিনিই-তার মহান সত্তাই সে সব পাওয়ার অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্যই এর যোগ্য হতে পারে না। কেননা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং তার সব সৃষ্টিই অতীব সুন্দর। এর অধিক সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তার সৃষ্টি, লালন-পালন-সংরক্ষণ-প্রবৃদ্ধি সাধনের সৌন্দর্য তুলনাহীন। তাই এর দরুন মানব মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠা প্রশংসা ও ইচ্ছামূলক প্রশংসাকে হামদ বলা হয়। এখানে এটা বিশেষভাবে জানা আবশ্যক যে, "আল-হামদু" কথাটি 'আশ-শুকর' থেকে অনেক ব্যাপক, যা আধিক্য ও পরিপূর্ণতা বুঝায়। কেউ যদি কোন নিয়ামত পায়, তা হলে সেই নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া প্রকাশ করা হয়। সে ব্যক্তি যদি কোন নিয়ামত না পায় (অথবা তার পরিবর্তে অন্য কোন লোক নিয়ামতটি পায়) স্বভাবতঃই তার বেলায় এজন্য শুকরিয়া নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ামত পায়, সে-ই শুকরিয়া আদায় করে। যে ব্যক্তি নিয়ামত পায় না, সে শুকরিয়া আদায় করে না। এ হিসেবে 'আশ-শুকর লিল্লাহ' বলার অর্থ হতো এই যে, আমি আল্লাহর যে নিয়ামত পেয়েছি, সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। অপরদিকে 'আল-হামদুলিল্লাহ' অনেক ব্যাপক। এর সম্পর্ক শুধু নিয়ামত প্রাপ্তির সাথে নয়। আল্লাহর যত নেয়ামত আছে, তা পাওয়া যাক, বা না পাওয়া যাক; সে নিয়ামত কোন ব্যক্তি নিজে পেলো, বা অন্যরা পেলো, সবকিছুর জন্যই যে প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য সেটিই হচ্ছে হামদ। এ প্রেক্ষিতে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে বান্দা যেন ঘোষণা করে, হে আল্লাহ! সব নিয়ামতের উৎস আপনি, আমি তা পাই বা না পাই, সকল সৃষ্টিজগতই তা পাচ্ছে; আর সেজন্য সকল প্রশংসা একান্তভাবে আপনার আর কারও নয়। কেউ আপনার প্রশংসা করলে আপনি প্রশংসিত হবেন আর কেউ প্রশংসা না করলে প্রশংসিত হবেন না, ব্যাপারটি এমন নয়। আপনি স্বপ্রশংসিত। প্রশংসা আপনার স্থায়ী গুণ। প্রশংসা আপনি ভালবাসেন। আপনার প্রশংসা কোন দানের বিনিময়ে হতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। [ইবন কাসীর]

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে الْحَمْدُ لِلَّهِ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। أَحْمَدُ اللهَ 'আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি' এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, আহমাদুল্লাহ বা 'আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি' এ বাক্যটি বর্তমানকালের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি বর্তমানকালে আল্লাহর প্রশংসা করছি। অন্যদিকে আল-হামদুলিল্লাহ বা 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' সর্বকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে) প্রযোজ্য। আর এ জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلَّهِ "সবচেয়ে উত্তম দো'আ হলো, আল-হামদুলিল্লাহ"। [তিরমিযী: ৩৩৮৩] কারণ, তা সর্বকাল ব্যাপী। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ "আর 'আল-হামদুলিল্লাহ' মীযান পূর্ণ করে" [মুসলিম: ২২৩] এ জন্য অধিকাংশ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিন-রাত্রির যিকর ও সালাতের পরের যিকর এর মধ্যে এ "আল-হামদুলিল্লাহ" শব্দই শিখিয়েছেন। এ "আল-হামদুলিল্লাহ" পুর্ণমাত্রার প্রশংসা হওয়ার কারণেই আল্লাহ এতে খুশী হন। বিশেষ করে নেয়ামত পাওয়ার পর বান্দাকে কিভাবে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে তাও "আল-হামদুলিল্লাহ" শব্দের মাধ্যমে করার জন্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শিখিয়ে দিয়েছেন। দেখুন, [ইবনে মাজাহ, ৩৮০৫] এভাবে "আল-হামদুলিল্লাহ" হলো সীমাহীন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার রূপ। আল্লাহর হামদ প্রকাশ করার

ক্ষেত্র, মানুষের মন-মানষ, মুখ ও কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় শক্তি দিয়ে আল্লাহর হামদ করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা শুধু মুখেই সীমাবদ্ধ রাখে। অনেকে মুখে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে, কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর প্রশংসা আসেনি আর তার কর্মকাণ্ডেও সেটার প্রকাশ ঘটে না।

সকল হামদ আল্লাহর এ কথাটুকু দ্বারা এক বিরাট গভীর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পৃথিবীর যেখানেই যে বস্তুতেই যা কিছু সৌন্দর্য ভাল প্রশংসার যোগ্য গুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে, মনে করতে হবে যে, তা তার নিজস্ব সম্পদ ও স্বকীয় গৌরবের বস্তু নয়। কেননা সেই গুণ মূলতঃই তার নিজের সৃষ্টি নয়; তা সেই আল্লাহ্ তা'আলারই নিরঙ্কুশ দান, যিনি নিজের কুদরতে সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্য ও সমস্ত ভালোর মূল উৎস। মানুষ, ফেরেশতা, গ্রহ-নক্ষত্র, বিশ্ব-প্রকৃতি, চন্দ্র-সূর্য-যেখানেই যা কিছু সৌন্দর্য ও কল্যাণ রয়েছে, তা তাদের কারো নিজস্ব নয়, সবই আল্লাহর দান। অতএব এসব কারণে যা কিছু প্রশংসা হতে পারে তা সবই আল্লাহর প্রাপ্য। এসব সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেহেতু আল্লাহর সাথে কেউ শরীক ছিলনা, কাজেই এসব কারণে যে প্রশংসা প্রাপ্য হতে পারে তাতেও আল্লাহর সাথে কারো এক বিন্দু অংশীদারিত্ব থাকতে পারে না। সুন্দর, অনুগ্রহকারী, সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালনকর্তা, রক্ষকর্তা ও ক্রমবিকাশদাতা আল্লাহ্র প্রতি মানুষ যা কিছু ভক্তি-শ্রদ্ধা ইবাদত-বন্দেগী এবং আনুগত্য পেশ করতে পারে; তা সবই একমাত্র আল্লাহর সামনেই নিবেদন করতে হবে। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তিই তার এক বিন্দুরও দাবীদার হতে পারে না। বরং তারই রয়েছে যাবতীয় হামদ। হামদ জাতীয় সবকিছু কেবল তারই প্রাপ্য, কেবল তিনিই সেটার একমাত্র যোগ্য। তাছাড়া ভালো বা মন্দ সকল অবস্থায় কেবল এক সত্তারই হামদ বা প্রশংসা করতে হয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেউ যদি কোন খারাপ কিছুর সম্মুখীন হয়, তখনও যেন বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ বা সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্যই যাবতীয় হামদ। [ইবন মাজাহ: ৩৮০৩]

কুরআন হাদীস হতে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির গুণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার এতখানি প্রশংসাও করা যায় না যাতে তার ব্যক্তিত্বকেই অসাধারণভাবে বড় করে তোলা হয় এবং সে আল্লাহর সমকক্ষতার পর্যায়ে পৌছে যায়। মূলতঃ এইরূপ প্রশংসাই মানুষকে তাদের পূজার কঠিন পাপে নিমজ্জিত করে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে বলেছেনঃ "যখন বেশী বেশী প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে, তখন তাদের মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ কর।" [মুসলিম: ৩০০২] নতুবা তার মনে গৌরব ও অহংকারী ভাবধারার উদ্রেক হতে পারে। হয়ত মনে করতে পারে যে, সে বহুবিধ গুণ-গরিমার অধিকারী, তার বিরাট যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে। আর কোন মানুষ যখন এই ধরনের খেয়াল নিজের মনে স্থান দেয় তখন তার পতন হতে শুরু হয় এবং সে পতন হতে উদ্ধার হওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মানুষ যখন আল্লাহ ছাড়া অপর কারো গুণ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করতে শুরু করে, তখন মানুষ তার ভক্তি-শ্রদ্ধার জালে বন্দী হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে মানুষের দাসত্ব ও মানুষের পূজা করতে আরম্ভ করে। এই অবস্থা মানুষকে শেষ পর্যন্ত চরম পঙ্কিল শির্কের পথে পরিচালিত করতে পারে। সে জন্যই যাবতীয় 'হামদ' একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

'আলামীন' বহুবচন শব্দ, একবচনে 'আলাম'। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, 'আলাম' বলা হয় সেই জিনিসকে, যা অপর কোন জিনিস সম্পর্কে জানবার মাধ্যম হয়; যার দ্বারা অন্য কোন বৃহত্তর জিনিস জানতে পারা যায়।

সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি অংশ স্বতঃই এমন এক মহান সত্তার অস্তিত্বের নিদর্শন, যিনি তার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পৃষ্ঠপোষক ও সুব্যবস্থাপক। এই জন্য সৃষ্টিজগতকে আলাম এবং বহুবচনে আলামীন বলা হয়। [কাশশাফ] আলামীন' বলতে কি বুঝায়, যদিও এখানে তার ব্যাখ্যা করা হয় নি, কিন্তু অপর আয়াতে তা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে, قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ফির'আউন বললঃ রাব্বুল আলামীন কি? মূসা বললেনঃ যিনি আসমান-যমীন এবং এ দুটির মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের রব। (সূরা আশ-শু'আরা: ২৩-২৪] এতে আলামীন' এর তাফসীর হয়ে গেছে যে, সৃষ্টি জগতের আর সব কিছুই এর অধীন। আসমান ও যমীনে এত অসংখ্য 'আলাম' বিদ্যমান যে, মানুষ আজ পর্যন্ত সেগুলোর কোন সীমা নির্ধারণ করতে সমর্থ হয় নি। মানব-জগত, পশু-জগত, উদ্ভিদ-জগত-এই জগত সমূহের কোন সীমা-সংখ্যা নাই, বরং এগুলো অসীম অতলস্পর্শ জগত-সমুদ্রের কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র। মানব-বুদ্ধি সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে একেবারেই সমর্থ নয়।

'রব' শব্দের বাংলা অর্থ করা হয় প্রভু-লালন পালনকারী। কিন্তু কুরআনে প্রয়োগভেদে এ শব্দের অর্থঃ-সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন ও আইন বিধান দেওয়া, কোন জিনিসের মালিক হওয়া, লালন-পালন করা, রিযিক দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। তাছাড়া ভাঙ্গা গড়ার অধিকারী হওয়া, জীবনদান করা, মৃত্যু প্রদান করা, সন্তান দেয়া, আরোগ্য প্রদান করা ইত্যাদি যাবতীয় অর্থই এতে নিহিত আছে। আর যিনি এক সঙ্গে এই সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন তিনিই হচ্ছেন রব। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আলায় এইরূপ ব্যাপক অর্থে রব্ব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ পাঠ করুন, যিনি মহান উচ্চ; যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন; এবং যিনি সঠিকরূপে প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর জীবন যাপন পন্থা প্রদর্শন করেছেন"। সূরা আল-আলা: ১-৩] এই আয়াত হতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, রব্ব তাকেই বলতে হবে যার মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করার, সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান ও সজ্জিত করার, প্রত্যেকটির পরিমাণ নির্ধারণ করার এবং হেদায়েত, দ্বীন ও শরীআত প্রদান করার যোগ্যতা রয়েছে। যিনি নিজ সত্তার গুণে মানুষ ও সমগ্র বিশ্ব-ভূবনকে সৃষ্টি করেছেন; শুধু সৃষ্টিই নয়-যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দান করেছেন ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গই পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে নিজ নিজ স্থানে বসে গেছে। রব্ব তিনিই-যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্বও দিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্য নিজের একটি ক্ষেত্র এবং তার সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا "যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, এবং তার পরিমাণ ঠিক করেছেন [সূরা আল-ফুরকান: ২]

অতএব এক ব্যক্তি যখন আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথারই ঘোষণা করে যে, আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দৈহিক, আধ্যাত্মিক, দ্বীনী ও বৈষয়িক-যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। আমার এই সবকিছু একমাত্র তারই মর্জির উপর নির্ভরশীল। আমার সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক তিনিই। আর কেউ তার কোন কিছু পূরণ করার অধিকারী নয়। বস্তুতঃ সৃষ্টিলোকে আল্লাহর দু'ধরনের রবুবিয়্যাত কার্যকর দেখা যায়: সাধারণ রবুবিয়াত বা প্রকৃতিগত এবং বিশেষ রবুবিয়াত বা শরীআতগত।

ক) প্রকৃতিগত বা সৃষ্টিমূলক- মানুষের জন্ম, তাহার লালন পালন ও ক্রমবিকাশ দান, তার শরীরকে ক্ষুদ্র হতে বিরাটত্বের দিকে, অসম্পূর্ণতা হতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করা এবং তার মানসিক ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষতা দান।

খ) শরীয়াত ভিত্তিক-মানুষের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রকে পথ প্রদর্শন করা, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য নির্দেশের জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ। যারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণত্ব বিধান করেন। এদেরই মাধ্যমে তারা হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়। নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে থাকতে এবং কল্যাণ ও মঙ্গলময় পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।

অতএব, আল্লাহ তা'আলার জন্য মানুষের রব হওয়ার ব্যাপারটি খুবই ব্যাপক। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষের রব হওয়া কেবল এই জন্যই নয় যে, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার দেহের লালন পালন করেছেন এবং তাহার দৈহিক শৃঙ্খলাকে স্থাপন করেছেন। বরং এজন্যও তিনি রব যে, তিনি মানুষকে আল্লাহর বিধান মুতাবিক জীবন যাপনের সুযোগদানের জন্য নবী প্রেরণ করেছেন এবং নবীর মাধ্যমে সেই ইলাহী বিধান দান করেছেন।

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

২. দয়াময়, পরম দয়ালু।

'রহমান-রাহীম' শব্দদ্বয়ের কারণে মূল আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত এবং সকল প্রকার প্রশংসার একচ্ছত্র অধিকারী কেবল এই জন্য নয় যে তিনি রব্বুল আলামীন, বরং এই জন্যও যে, তিনি "আর-রাহমান" ও "আর-রাহীম"। বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার অপার অসীম দয়া ও অনুগ্রহ প্রতিনিয়ত পরিবেশিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক জগতে এই যে নিঃসীম শান্তি শৃংখলা ও সামঞ্জস্য-সুবিন্যাস বিরাজিত রয়েছে, এর একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহর রহমত সাধারণভাবে সব কিছুর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর সৃষ্টিই আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছে। কাফির, মুশরিক, আল্লাহ্দ্রোহী, নাস্তিক, মুনাফিক, কাউকেও আল্লাহ্ তাঁর রহমত হতে জীবন-জীবিকা ও সাধারণ নিয়মে বৈষয়িক উন্নতি কোন কিছু থেকেই– বঞ্চিত করেন নি। এমন কি, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তার বিরোধিতা করতে চাইলেও আল্লাহ নিজ হতে কাউকেও বাধা প্রদান করেন নি; বরং তিনি মানুষকে একটি সীমার মধ্যে যা ইচ্ছে তা করারই সুযোগ দিয়েছেন। এই জড় দুনিয়ার ব্যাপারে এটাই আল্লাহর নিয়ম। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "আর আমার রহমত সব কিছুকেই ব্যাপ্ত করে আছে।" [সূরা আল-আরাফ: ১৫৬]

কিন্তু এই জড় জগত চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাবার পর যে নূতন জগত স্থাপিত হবে, তা হবে নৈতিক নিয়মের বুনিয়াদে স্থাপিত এক আলাদা জগত। সেখানে আল্লাহর দয়া অনুকম্পা আজকের মত সর্বসাধারণের প্রাপ্য হবে না। তখন আল্লাহর রহমত পাবে কেবলমাত্র তারাই যারা দুনিয়ায় আখেরাতের রহমত পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। 'রাব্বুল আলামীন' বলার পর 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহিম' শব্দদ্বয় উল্লেখ করায় এই কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ বিশ্ব-লোকের লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষন ও ক্রমবিকাশ দানের যে সুষ্ঠু ও নিখুত ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করেছেন, তার মূল কারণ সৃষ্টির প্রতি তার অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুরূপভাবে 'রাহমান' এর পর 'রাহীম' উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা এই কথাই বলতে চান যে, দুনিয়াতে আল্লাহর নিরপেক্ষ ও সাধারণ রহমত লাভ করে কেউ যেন অতিরিক্ত মাত্রায় মেতে না যায় এবং আল্লাহ ও তার দেয়া দ্বীনকে ভুলে না বসে। কেননা দুনিয়ার জীবনের পর আরও একটি জগত, আরও একটি জীবন

নিশ্চিতরূপে রয়েছে, যখন আল্লাহর রহমত নির্বিশেষে আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। আর প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনই হবে সর্বোতভাবে সাফল্যমণ্ডিত।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

৩. বিচার দিনের মালিক।

অত্র আয়াতে مَالِكِ ও সূরা নাসে مَلِكِ বলা হয়েছে। مَالِكِ শব্দটির অর্থ অধিকতর ব্যাপক। مَلِكِ النَّاسِ বলে কেবল 'মানুষের অধিপতি' বলা হয়েছে। কিন্তু مَالِكِ বলে এখানে সৃষ্টিকুলের অধিপতি বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সকল কিছুর চিরন্তন মালিকানা তাঁর হাতে। শাসক যেমন অধীনস্তদের নিয়োগ দান করেন ও তাদেরকে শাসকের নিকটে দায়বদ্ধ থাকতে হয়, অমনিভাবে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে বান্দাকে তিনি বিশ্বপরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে সাময়িকভাবে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। বান্দার কর্মজীবনের ছোট-বড় সবকিছুই আল্লাহর গোচরে রয়েছে এবং ক্বিয়ামতের দিন সবকিছুর চূড়ান্ত হিসাব তিনি গ্রহণ করবেন ও সে অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি অথবা জান্নাতের পুরস্কার দান করবেন। তিনি ইচ্ছা করলে কোন বান্দাকে বিনা হিসাবেও জান্নাত দিতে পারেন। ফলতঃ বিচার দিবসের পূর্ণ মালিকানা ও একচ্ছত্র অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই হাতে। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারবে না। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।

الدِّيْنِ-এর অনেকগুলি অর্থ রয়েছে। যেমন প্রতিদান, হিসাব, ফায়সালা, আনুগত্য, রীতি, আচরণ ইত্যাদি। এখানে يَوْمِ الدِّيْنِ-এর অর্থ يَوْمُ الْجَزَاءِ অর্থাৎ প্রতিদান বা হিসাব-এর দিন। যেমন বলা হয়ে থাকে, كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ 'যেমন কর্ম তেমন ফল'।

মোটকথা: আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তিনি তিনি কেবল 'রব্বুল আলামিন, আর-রহমান ও আর-রহিমই নন, তিনি "মালিকি ইয়াওমিদ্দিন"-ও। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেবল এই জীবনের লালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই এই বিরাট জগত-কারখানা স্থাপন করেন নি, এর একটি চূড়ান্ত পরিণতিও তিনি নির্ধারিত করেছেন। অর্থাৎ তোমরা কেউ মনে করো না যে, এই জীবনের অন্তরালে কোন জীবন নেই। এই ধারণাও মনে স্থান দিও না যে, সেদিনও তোমাদের তেমনি স্বেচ্ছাচারিতা চলবে যেমন আজ চলছে বলে তোমরা ধারণা করছ বরং সে দিন নিরঙ্কুশভাবে এক আল্লাহরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও মালিকানা পূর্ণমাত্রায় কার্যকর থাকবে। আজ যেমন তোমরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারছ-অন্তত: এর পথে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় না, সে চূড়ান্ত বিচার দিনে কিন্তু তা কিছু মাত্র চলবে না। সেদিন কেবলমাত্র আল্লাহর মর্জি কার্যকর হবে। আজ যেমন লোকেরা সত্যের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে সুস্পষ্ট অন্যায় ও মারাত্মক যুলুম করেও সুনাম সুখ্যাতিসহ জীবন-যাপন করতে পারছে, সেদিন কিন্তু এসব ধোঁকাবাজী এক বিন্দুও চলবে না।

বিচার দিবসের গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য আন্দাজ করা যায় এই কথা হতে যে, বিচারের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, "আজকার দিনে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব কার?" তার উত্তরে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হবে, "তা সবই একমাত্র সার্বভৌম ও শক্তিমান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট" [সূরা আল-গাফির: ৫৯], অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "এটা সে দিনের কথা যেদিন কোন লোকই অন্য কারও জন্য কিছু করতে সক্ষম হবে না। সে দিন সমস্ত কর্তৃত্বই হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য" [সূরা আল-ইনফিতার: ১৯] আল্লাহর এই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কার্যকর

হবে প্রথম সিংগায় ফুঁক দেয়ার দিন হতেই। বলা হয়েছে, "আর তার নিরঙ্কুশ মালিকানা কার্যকর হবে সিংগায় ফুঁক দেয়ার দিনই [সূরা আল আন'আম: ৭৩]

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

৪. আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

ইবাদতের অর্থ হল, কারো সন্তুষ্টি লাভের জন্য অত্যধিক কাকুতি-মিনতি এবং পূর্ণ নম্রতা প্রকাশ করা। আর ইবনে কাসীর (রঃ) এর উক্তি অনুযায়ী 'শরীয়তে পূর্ণ ভালবাসা, বিনয় এবং ভয়-ভীতির সমষ্টির নাম হল ইবাদত।' অর্থাৎ, যে সত্তার সাথে ভালবাসা থাকবে তাঁর অতিপ্রাকৃত মহাক্ষমতার কাছে অসামর্থ্য ও অক্ষমতার প্রকাশও হবে এবং প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা তাঁর পাকড়াও ও শাস্তির ভয়ও থাকবে। এই আয়াতে সরল বাক্য হল,[نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ] (আমরা তোমার ইবাদত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য চাই।) কিন্তু মহান আল্লাহ এখানে مفعول (কর্মপদকে) فعل(ক্রিয়াপদ)-এর আগে এনে [إِيَاكَ نَعْبُدَ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ] বলেছেন। আর এর উদ্দেশ্য বিশেষত্ব সৃষ্টি করা। (যেহেতু আরবী ব্যকরণে যে পদ সাধারণতঃ পরে ব্যবহার হয় তা পূর্বে প্রয়োগ করা হলে বিশেষত্বের অর্থ দিয়ে থাকে।) সুতরাং এর অর্থ হবে, 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।' এখানে স্পষ্ট যে, ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয নয়, যেমন সাহায্য কামনা করাও তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে বৈধ নয়। এই বাক্য দ্বারা শির্কের পথ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যাদের অন্তরে শির্কের ব্যাধি সংক্রমণ করেছে, তারা লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা ও অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্যকে দৃষ্টিচ্যুত ক'রে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। তারা বলে, দেখুন! যখন আমরা অসুস্থ হই, তখন সুস্থতার জন্য ডাক্তারের নিকট সাহায্য চাই। অনুরূপ বহু কাজে স্ত্রী, চাকর, ড্রাইভার এবং অন্যান্য মানুষের কাছেও সাহায্য কামনা করি। এইভাবে তারা বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছেও সাহায্য কামনা করা জায়েয। অথচ প্রাকৃত বা লৌকিক সাহায্য একে অপরের নিকট চাওয়া ও করা সবই বৈধ; এটা শির্ক নয়। এটা তো মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এমন এক নিয়ম-নীতি, যাতে সমস্ত লৌকিক কার্য-কলাপ বাহ্যিক হেতুর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এমন কি নবীরাও (সাধারণ) মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, [مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ] অর্থাৎ, কারা আছে যারা আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? (সূরা আলে ইমরান ৫২ আয়াত) আর আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিনদেরকে বলেন, [وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى] অর্থাৎ, তোমরা নেকী এবং আল্লাহভীতির কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। (সূরা মাইদাহ ২ আয়াত) বুঝা গেল যে, এ রকম সাহায্য (চাওয়া ও করা) নিষেধও নয় এবং শির্কও নয়। বরং তা বাঞ্ছনীয় ও প্রশংনীয় কাজ। পারিভাষিক শির্কের সাথে এর কি সম্পর্ক? শির্ক তো এই যে, এমন মানুষের কাছে সাহায্য কামনা করা যে বাহ্যিক হেতুর ভিত্তিতে কোন সাহায্য করতে পারবে না। যেমন, কোন মৃত ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করা, তাকে বিপদ থেকে মুক্তিদাতা এবং প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা, তাকে ভাল-মন্দের মালিক ভাবা এবং বিশ্বাস করা যে, সে দূর এবং নিকট থেকে সকলের ফরিয়াদ শোনার ক্ষমতা রাখে। এর নাম হল, অলৌকিক পন্থায় সাহায্য চাওয়া এবং তাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা। আর এরই নাম হল সেই শির্ক, যা দুর্ভাগ্যক্রমে অলী-আওলিয়াদের মহববতের নামে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে।

'তোমার ইবাদত করি' একথাটুকু বুঝানোর জন্য نَعْبُدُكَ বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু كَ কর্মপদের সর্বনামকে নিয়মমাফিক نَعْبُدُ ক্রিয়ার পরে না বসিয়ে পূর্বে বসানোর মূল কারণ হ'ল বক্তব্যের মধ্যে Emphasis বা জোর সৃষ্টি করা। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আগে বলাই আরবদের বাকরীতি। কেননা 'তোমার ইবাদত করি' বললে

অন্যকেও ইবাদত করার সম্ভাবনা বাকী থাকে। কিন্তু 'তোমারই ইবাদত করি' বললে সে সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। إِيَّاكَ সর্বনাম একই বাক্যে দু'বার অগ্রে বসানোর পিছনেও উদ্দেশ্য হ'ল একথা জোর দিয়ে বলা যে, আমাদের যাবতীয় ইবাদত ও ইস্তি'আনাত বা উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনাকে আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য খাস করছি। অন্য কারু জন্য আমাদের হৃদয়ে কোন স্থান নেই।

তাওহীদ তিন প্রকারের। এখানে মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রকারের কথা উল্লেখ করে দেওয়া সঙ্গত মনে হয়। এই প্রকারগুলো হলঃ তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ), তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (উপাস্যত্বের একত্ববাদ) এবং তাওহীদুল আসমা অসসিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ)।

১। তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর অর্থ হল, এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, মালিক, রুযীদাতা, নিয়ন্তা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। নাস্তিক ও জড়বাদীরা ব্যতীত সকল মানুষই এই তাওহীদকে স্বীকার করে। এমনকি মুশরিক (অংশীবাদী)রাও এটা বিশ্বাস করতো এবং আজও করে। যেমন ক্বুরআন কারীমে মুশরিকদের এ তাওহীদকে স্বীকার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, ''তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন এবং কেই বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তারা বলবে, আল্লাহ।'' (অর্থাৎ, সমস্ত কর্ম সম্পাদনকারী হলেন আল্লাহ।) (সূরা ইউনুসঃ ৩১) অন্যত্র বলেছেন, ''যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।'' (সূরা যুমার ৩৮) তিনি আরো বলেছেন, ''জিজ্ঞেস কর, এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জানো ? তারা ত্বরিৎ বলবে, আল্লাহর; বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ? জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি ? তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না। জিজ্ঞেস কর, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে; যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জানো ? তারা বলবে, আল্লাহর। (সূরা মু'মিনুন ৮৪-৮৯) এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত আছে।

২। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর অর্থ হল, সর্ব প্রকার ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহকে মনে করা। আর ইবাদত সেই সব কাজকে বলা হয়, যা কোন নির্দিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি লাভের আশায় অথবা তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়ে করা হয়। (অন্য কথায়ঃ ইবাদত প্রত্যেক সেই গুপ্ত বা প্রকাশ্য কথা বা কাজের নাম, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।) সুতরাং কেবল নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জই ইবাদত নয়, বরং কোন সত্তার নিকট দুআ ও আবেদন করা তার নামে মানত করা, তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা, তার তাওয়াফ করা এবং তার কাছে আশা রাখা ও তাকে ভয় করা ইত্যাদিও ইবাদত। তাওহীদে উলূহিয়্যাহ হল (উল্লিখিত) সমস্ত কাজ কেবল মহান আল্লাহর জন্য সম্পাদিত হওয়া। কবরপূজার ব্যাধিতে আক্রান্ত আম-খাস বহু মানুষ তাওহীদে উলূহিয়্যাতে শির্ক করছে। উল্লিখিত ইবাদতসমূহের অনেক প্রকারই তারা কবরে সমাধিস্থ ব্যক্তিদের এবং মৃত বুযুর্গদের জন্য ক'রে থাকে যা সুস্পষ্ট শির্ক।

৩। তাওহীদুল আসমা অসসিফাত হল, মহান আল্লাহর যে গুণাবলী ক্বুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিকে কোন রকমের অপব্যাখ্যা এবং বিকৃত করা ছাড়াই বিশ্বাস করা। আর এই গুণাবলীর অনুরূপ অধিকারী (আল্লাহ ছাড়া) অন্য কাউকে মনে না করা। যেমন, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান (গায়বী খবর) রাখা তাঁর গুণ, দূর ও নিকট

থেকে সকলের ফরিয়াদ শোনার শক্তি তিনি রাখেন, বিশ্বজাহানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার সব রকমের এখতিয়ার তাঁরই; এই ধরনের আরো যত ইলাহী গুণাবলী আছে আল্লাহ ব্যতীত কোন নবী, ওলী এবং অন্য কাউকেও এই গুণের অধিকারী মনে না করা। করলে তা শির্ক হয়ে যাবে। বড় দুঃখের বিষয় যে, কবরপূজারীদের মধ্যে এই প্রকারের শির্ক ব্যাপক। তারা আল্লাহর উল্লিখিত গুণে অনেক বুযুর্গদেরকে অংশীদার বানিয়ে রেখেছে।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

স্নেহ ও করুণা এবং কল্যাণ কামনাসহ কাউকে মঙ্গলময় পথ দেখিয়ে দেয়া ও মনজিলে পৌছিয়ে দেয়াকে আরবী পরিভাষায় ‘হেদায়াত’ বলে। হেদায়াত’ শব্দটির দুইটি অর্থ। একটি পথ প্রদর্শন করা, আর দ্বিতীয়টি লক্ষ্য স্থলে পৌছিয়ে দেয়া। যেখানে এই শব্দের পর দুইটি object থাকবে إلى থাকবে না, সেখানে এর অর্থ হবে লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দেয়া। আর যেখানে এ শব্দের পর إلى শব্দ আসবে, সেখানে অর্থ হবে পথ-প্রদর্শন। যেমন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলেছেন, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ “নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্যস্থলে—মনজিলে পৌঁছিয়ে দিতে পারবেন না যাকে আপনি পৌছাতে চাইবেন। বরং আল্লাহই লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন [সূরা আল-কাসাস ৫৬] এ আয়াতে হেদায়েত শব্দের পর إلى ব্যবহৃত হয়নি বলে লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দেয়া অর্থ হয়েছে এবং তা করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধ্যায়ত্ত নয় বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে পথ প্রদর্শন রাসূলে করীমের সাধ্যায়ত্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ “হে নবী। আর আপনি অবশ্যই সরল সঠিক দৃঢ় ঋজু পথ প্রদর্শন করেন [সূরা আশ-শূরা: ৫২]

কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দেয়ার কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তাই তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا “আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে সরল সোজা সুদৃঢ় পথে পৌছিয়ে দিতাম।[সূরা আন-নিসা: ৬৮] সূরা আল-ফাতিহা’র আলোচ্য আয়াতে হেদায়েত শব্দের পর إلى শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ফলে এর অর্থ হবে সোজা সুদৃঢ় পথে মনজিলের দিকে চালনা করা। অর্থাৎ যেখানে বান্দাহ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে শুধু এতটুকু বলে না যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সোজা সুদৃঢ় পথের সন্ধান দিন। বরং বলে, হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে চলবার তাওফীক দিয়ে মনজিলে পৌছিয়ে দিন। কেননা শুধু পথের সন্ধান পাইলেই যে সে পথ পাওয়া ও তাতে চলে মনজিলে পোঁছা সম্ভবপর হবে তা নিশ্চিত নয়। কিন্তু সিরাতে মুস্তাকীম কি? সিরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে, রাস্তা বা পথ। আর মুস্তাকীম হচ্ছে, সরল সোজা। সে হিসেবে সিরাতে মুসতাকীম হচ্ছে, এমন পথ, যা একেবারে সোজা ও ঋজু, প্রশস্ত ও সুগম; যা পথিককে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেয়; যে পথ দিয়ে লক্ষ্যস্থল অতি নিকটবর্তী এবং মনযিলে মাকছুদে পৌছার জন্য যা একমাত্র পথ, যে পথ ছাড়া লক্ষ্যে পৌছার অন্য কোন পথই হতে পারে না।

আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমারও রব তোমাদেরও রব, অতএব একমাত্র তারই দাস হয়ে থাক। এটাই হচ্ছে সিরাতুম মুস্তাকীম-সঠিক ও সুদৃঢ় ঋজু পথ [সূরা মারইয়াম: ৩৬] অর্থাৎ আল্লাহকে রব স্বীকার করে ও কেবল তারই বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন করলেই সিরাতুম মুস্তাকীম অনুসরণ করা হবে। অন্যত্র ইসলামের জরুরী বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আর এটাই আমার সঠিক দৃঢ় পথ, অতএব তোমরা এই পথ অনুসরণ করে চল। এছাড়া আরও যত পথ আছে, তাহার একটিতেও পা দিও না; কেননা তা করলে সে পথগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে-ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদেরকে

উপদেশ দিচ্ছেন এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা ধ্বংসের পথ হতে আত্মরক্ষা করতে পার [সূরা আল-আনআমঃ ১৫৩] একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে যে পথ ও বিধি-বিধান পাওয়া যাবে, তাই মানুষের জন্য সঠিক পথ। আল্লাহ বলেন, "প্রকৃত সত্য-সঠিক-ঋজু-সরল পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব আল্লাহর উপর, যদিও আরও অনেক বাঁকা পথও রয়েছে। আর আল্লাহ চাইলে তিনি সব মানুষকেই হেদায়াতের পথে পরিচালিত করতেন [সূরা আন-নাহ্ল: ৯]

সিরাতে মুসতাকীমের তাফসীর কোন কোন মুফাসসির করেছেন, ইসলাম। আবার কারও কারও মতে, কুরআন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] বস্তুত: আল্লাহর প্রদত্ত বিশ্বজনীন দ্বীনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত রূপ 'সিরাতুল মুস্তাকীম' শব্দ হতে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব কবুল করে তারই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করার পথই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীম এবং একমাত্র এই পথে চলার ফলেই মানুষ আল্লাহর নিয়ামত ও সন্তোষ লাভ করতে পারে। সে একমাত্র পথই মানব জীবনের প্রকৃত ও চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই সে একমাত্র পথে চলার তওফীক প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এই আয়াতটিতে। কিন্তু আল্লাহর নিকট হতে এই পথ কিরূপে পাওয়া যেতে পারে? সে পথ ও পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে আল্লাহ এর তিনটি সুস্পষ্ট পরিচয় উল্লেখ করেছেনঃ

১. এই জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে তা তাদের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে, যারা উক্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে আল্লাহর নিকট হতে নিয়ামত ও অসীম অনুগ্রহ লাভ করেছে।
২. এই পথের পথিকদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হয় নি, অভিশপ্তও তারা নয়।
৩, তারা পথভ্রান্ত লক্ষ্যভ্রষ্টও নয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এ কথা কয়টির বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
৬. তাদের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ;

এটা আল্লাহর নির্ধারিত সঠিক ও দৃঢ় পথের প্রথম পরিচয়। এর অর্থ এই যে, আল্লাহর নিকট হতে যে পথ নাযিল হয়েছে, তা অনুসরণ করলে আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত লাভ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ তা এমন কোন পথই নয়, যাহা আজ সম্পূর্ণ নূতনভাবে পেশ করা হচ্ছে- পূর্বে পেশ করা হয় নি। বরং তা অতিশয় আদিম ও চিরন্তন পথ। মানুষের এই কল্যাণের পথ অত্যন্ত পুরাতন, ততখানি পুরাতন যতখানি পুরাতন হচ্ছে স্বয়ং মানুষ। প্রথম মানুষ হতেই এটা মানুষের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে, অসংখ্য মানুষ এ পথ প্রচার করেছেন, কবুল করার আহবান জানিয়েছেন, এটা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নিকট হতে, অপূর্ব নিয়ামত ও সম্মান লাভের অধিকারী প্রমাণিত হয়েছেন। এই নিয়ামত এই দুনিয়ার জীবনেও তারা পেয়েছেন, আর আখেরাতেও তা তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে।

মূলত: আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের চলার পথ ও অনুসৃত জীবনই হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য একমাত্র পথ ও পন্থা। এতদ্ব্যতীত মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, অনুসরণীয় ও কল্যাণকর পথ আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক কারা এবং তাদের পথ বাস্তবিক পক্ষে কি? এর উত্তর অন্য আয়াতে এসেছে, "যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের ভাল হত এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত। এবং তখন আমি আমার কাছ থেকে তাদেরকে নিশ্চয় মহাপুরস্কার প্রদান করতাম এবং তাদেরকে নিশ্চয় সরল পথে পরিচালিত করতাম। আর কেউ আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ (যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন) তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী! এগুলো

আল্লাহর অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট [সূরা আন-নিসাঃ ৬৬-৭০) এ আয়াত থেকে সঠিক ও দৃঢ় জীবন পথ যে কোনটি আর আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকগণ যে কোন পথে চলেছেন ও চলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাবার অধিকারী হয়েছেন তা সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানা যায়। তারা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীন।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

৭. যাদের উপর তোমার ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।

যাদের উপর তোমার ক্রোধ আপতিত হয়নি- এটা আল্লাহর নির্ধারিত সিরাতুল মুস্তাকীম এর দ্বিতীয় পরিচয়। আল্লাহ তাআলা যে পথ মানুষের সম্মুখে চিরন্তন কল্যাণ লাভের জন্য উপস্থাপিত করেছেন সে পথ অভিশাপের পথ নয় এবং সে পথে যারা চলে তাদের উপর কখনই আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হতে পারে না। সে পথ তো রহমতের পথ বরং সে পথের পথিকদের প্রতি দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য বর্ষিত হয়ে থাকে, আখেরাতেও তারা আল্লাহর চিরস্থায়ী সন্তোষ লাভের অধিকারী হবে। এই আয়াতাংশের অপর একটি অনুবাদ হচ্ছে, "তাদের পথ নয় যাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হয়েছে।" এরূপ অনুবাদ করলে তাতে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' ছাড়া আরও একটি পথের ইঙ্গিত মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়, যা আল্লাহর নিকট হতে অভিশপ্ত এবং সেই পথ হতে মানুষকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য মনে হয়। কিন্তু এখানে আল্লাহ মূলতঃ একটি পথই উপস্থাপিত করেছেন এবং একটি পথেরই ইতিবাচক দুইটি বিশেষণ দ্বারা সেটাকে অত্যধিক সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। তাই অনেকেই পূর্বোক্ত প্রথম অনুবাদটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। [উভয় অর্থের জন্য দেখুন, যামাখশারী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] প্রথম অনুবাদ বা দ্বিতীয় অনুবাদ যাই হোক না কেন এখানে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে প্রকারান্তরে এমন পথ ও পন্থা গ্রহণ হতে বিরত থাকবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যা আল্লাহর অভিশাপের পথ, যে পথে চলে কোন কোন লোক অভিশপ্ত হয়েছে।

কিন্তু সে অভিশপ্ত কারা, কারা কোন পথে চলে আল্লাহর নিকট হতে অভিশপ্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেয়া আবশ্যক। কুরআন মজীদ ঐতিহাসিক জাতিদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ "আর তাদের উপর অপমান লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের কষাঘাত হানা হয়েছে এবং তারা আল্লাহর অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছে।[সূরা আল-বাকারাহ: ৬১] পূর্বাপর আলোচনা করলে নিঃসন্দেহে এটা বুঝতে পারা যায় যে, এ কথাটি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই মাগদুব বলতে যে এখানে ইয়াহুদীদের বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে সমস্ত মুফাসসিরই একমত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসেও অনুরুপ স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩২,৩৩]

যারা পথভ্রষ্টও নয়- এটি সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর তৃতীয় ও সর্বশেষ পরিচয়। অর্থাৎ যারা সিরাতুল মুস্তাকীম এ চলে আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে পেরেছেন তারা পথভ্রষ্ট নন-কোন গোমরাহীর পথে তারা চলেন না। পূর্বোল্লেখিত আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেরও অন্য অনুবাদ হচ্ছে, তাদের পথে নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, যারা গোমরাহ হয়ে আল্লাহর উপস্থাপিত পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে এ পথ-ভ্রষ্ট লোকদের পরিচয় জানতে পারা যায় যে, দুনিয়ার ইতিহাসে নাসারাগণ হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত এ গোমরাহ ও পথ-ভ্রষ্ট জাতি। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩২,৩৩, ৭৭] কোন মুসলিম যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথাই ঘোষণা করে যে, "হে আল্লাহ আমরা স্বীকার করি, আপনার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে জীবন-ধারা গড়ে উঠে তা-ই একমাত্র মুক্তির পথ। এজন্য আপনার নির্ধারিত এ পথে

চলে যারা আপনার নিয়ামত পেয়েছেন সেই পথই একমাত্র সত্য ও কল্যাণের পথ, আল্লাহ সেই পথেই আমাদেরকে চলবার তাওফীক দিন। আর যাদের উপর আপনার অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে ও যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের যেন আমরা অনুসরণ না করি। কেননা, সে পথে প্রকৃতই কোন কল্যাণ নেই। বস্তুতঃ পবিত্র কুরআন দুনিয়ার বর্তমান বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সর্বশেষ আল্লাহর দেয়া গ্রন্থ। এর উপস্থাপিত আদর্শ ও জীবন পথই হচ্ছে বিশ্বমানবতার একমাত্র স্থায়ী ও কল্যাণের পথ। এর বিপরীত সমস্ত জীবনাদর্শকে মিথ্যা প্রমাণ করে একমাত্র এরই উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদেরকে গঠন করা মুসলিমদের একমাত্র দায়িত্ব। মুসলিমরা আজও সেই দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হলে সূরা আল ফাতিহা তাদের জীবনে সার্থক হবে।

মূলতঃ যারা সূরা আল-ফাতিহার অর্থ বুঝে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করার পর তাদের মন থেকে দোআ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের দোআ কবুল করবেন। হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইমাম গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদদ্বলীন বলে তখন তোমরা 'আমীন' বা 'হে আল্লাহ কবুল কর' একথাটি বল; কেননা যার কথাটি ফেরেশতাদের কথা অনুযায়ী হবে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয় হবে" [বুখারী: ৭৮২, মুসলিম ৪০৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বলীন' বলে তখন তোমরা আমীন বা 'হে আল্লাহ কবুল কর একথাটি বল; এতে আল্লাহ তোমাদের আহবানে সাড়া দিবেন (দোআ কবুল করবেন) [মুসলিম ৪০৪] অন্য একহাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়াহুদীরা তোমাদেরকে সালাম ও আমীন বলার চেয়ে বেশী কোন বিষয়ের উপর হিংসা করে না।" [ইবন মাজাহ: ৮৫৬]

ফুটনোট

- সূরা ফাতিহার প্রসিদ্ধ কয়েকটি নাম হলো-: উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, আস-সাব'উল মাছানী, আল-কুরআনুল 'আযীম, আল-হামদু, সালাত, রুক্বিয়াহ, ফাতিহাতুল কিতাব
- সর্বপ্রথম পূর্ণাংগ সূরা হিসাবে সূরা ফাতিহা নাযিল হয়।
- **সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন - এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ।**
- কুরআন বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হয়েছে, যেকোনো কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করুন। এটি একটি সুন্নাহ, এটি আল্লাহর বারাকাহ নিয়ে আসে এবং এটি আপনাকে আপনার কাজের পিছনের উদ্দেশ্যের কথাও মনে করিয়ে দিবে।
- সূরা আল ফাতিহায় আল্লাহর কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে; আল্লাহ, রব, আর-রহমান, আর-রহিম, মালিক। "আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন" এই দোয়া করার আগে আল্লাহ্ বিভিন্ন নাম/সীফাত উল্লেখ করা হয়েছে, ডাকা হয়েছে। দোয়া কবুলের এইটাও একটা পন্থা আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নামে ডেকে আল্লাহর কাছে চাওয়া।
- **হামদ** অর্থ নির্মল ও সম্ভ্রমপূর্ণ প্রশংসা। গুণ ও সিফাত সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়ে থাকে। তা ভালও হয় আবার মন্দও হয়। কিন্তু হামদ শব্দটি কেবলমাত্র ভাল গুণ প্রকাশ করে।
- 'আলামীন' বহুবচন শব্দ, একবচনে 'আলাম'। সৃষ্টিজগতকে আলাম এবং বহুবচনে আলামীন বলা।

- **'রব'** শব্দের বাংলা অর্থ করা হয় প্রভু-লালন পালনকারী। কিন্তু কুরআনে প্রয়োগভেদে এ শব্দের অর্থঃ-সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন ও আইন বিধান দেওয়া, কোন জিনিসের মালিক হওয়া, লালন-পালন করা, রিযিক দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।
- আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তিনি তিনি কেবল 'রব্বুল আলামিন, আর-রহমান ও আর-রহিমই নন, তিনি "মালিকি ইয়াওমিদ্দিন"-ও। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেবল এই জীবনের লালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই এই বিরাট জগত-কারখানা স্থাপন করেন নি, এর একটি চূড়ান্ত পরিণতিও তিনি নির্ধারিত করেছেন।
- তাওহীদ তিন প্রকারের। এই প্রকারগুলো হলঃ তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ), তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (উপাস্যত্বের একত্ববাদ) এবং তাওহীদুল আসমা অসসিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ)।

এই সূরায় আল্লাহ্‌র যে পরিচয়গুলো ফুটে এসেছে-

- সকল প্রশংসার একমাত্র দাবীদার
- বিশ্বজাহানের রব
- তিনি রাহমান
- তিনি রাহীম
- তিনি মালিকি ইয়াওমিদ্দিন
- একমাত্র ইবাদত পাওয়ার অধিকারী
- তিনি সাহায্য কারী
- তিনি হেদায়াত দানকারী

সিরাতুল মুস্তাকীমের পরিচয়

- তাদের পথ, যাদেরকে আল্লাহ্‌ নিয়ামত দান করেছেন;
- এটা তাদের পথ, যাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ/অভিশাপ আপতিত হয়নি-
- তাদের পথ, যারা পথভ্রষ্টও নয়।

- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এতে আল্লাহর তাওহীদ সাব্যস্ত হয়েছে।
- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এতে রাসূলের আনুগত্যের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে।
- নি'আমতপ্রাপ্তদের উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক তাদের সম্মানিত করা ও প্রশংসা করা হয়েছে।
- সূরা ফাতেহা হচ্ছে দো'আ, এই সূরার মাধ্যমে দোয়ার আদব শিখে দেয়া হচ্ছে তাই এই পদ্ধতি অনুসরণ করে দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে। তবে এর সাথে সাথে স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহ তা'আলা অমনোযোগী অন্তর থেকে দো'আ কবুল করেন না।

যারা সূরা আল-ফাতিহার অর্থ বুঝে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করার পর তাদের মন থেকে দোআ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের দোআ কবুল করবেন। সূরা ফাতিহা আমাদের প্রতিদিন প্রতি রাকাতে নামাজে পড়তে হয় তাই আসুন সূরা ফাতিহা ভালো করে বুঝার চেষ্টা করি এবং এর শিক্ষা ও ফযীলতগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি।

সমাপ্ত

মাউন পরিচিতি

আমাদের সমাজের বিশাল অংশ মানুষ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের দেশে মানুষের সমস্যাগুলো সমাধানে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। যার ফলে দিনে দিনে সমস্যা বাড়ছে। মানুষ অপরাধের দিকে পা বাড়াচ্ছে এবং নৈতিক শিক্ষাগুলো ভুলে যাচ্ছে। আমাদের সমাজে কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মানুষকে ও সমাজকে কল্যাণমুখী করার এবং সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করার কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি নগণ্য। আপনার-আমার এবং আমাদের উপরও সমাজের এবং সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিদের অধিকার রয়েছে যে আমারও সমস্যাগুলোর সমাধানে কাজ করি।

ইসলাম যেহেতু আমাদেরকে একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনা দিয়েছে। যার শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনার আলোকে কাজ করলে একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ এবং ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়া সম্ভবনা। একটি সমৃদ্ধ এবং ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ার স্বপ্নকে সামনে নিয়ে ২০২১ সাল থেকে আমরা মাউন ফাউন্ডেশনের কাজ শুরু করেছি।

আলহামদুলিল্লাহ্, ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি এবং কয়েকটি প্রজেক্ট চলমান। আমাদের প্রজেক্টগুলো হলো-

▣ মক্তব প্রজেক্ট- মক্তবের শিক্ষার্থীদের মক্তব শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলার জন্য আমরা শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন, কায়দা, আমপারা, রেহাল, তাজভীদ ও দোয়ার বই ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করে থাকি।

▣ যাকাত ম্যানেজমেন্ট- ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার জন্য ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থা। যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং এর থেকে উপকৃত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে সঠিকভাবে এর ম্যানেজমেন্ট। যাকাত সচেতনা বৃদ্ধি করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সামগ্রিক বিষয় থাকবে এই প্রকল্পে।

▣ সিস্টার্স কেয়ার প্রজেক্ট- গরীব, অসহায়, অসচ্ছল ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত মহিলাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। সুন্দর এক সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মানে মহিলারা যাতে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে যেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করাই এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য।

▣ জরুরী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- যেকোন প্রাকৃতিক ও সামাজিক দূর্যোগে আক্রান্তদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান, ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম, পূর্ণবাসন কার্যক্রাম সহ দূযোর্গ মোকাবেলায় দ্রুত ও প্রয়োজনীয় সকল প্রদক্ষেপ থাকবে এই প্রকল্পের আওতাধীন।

▣ খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী- রামাদান ফুড প্যাক বিতরণ, ঈদ খাবার সামগ্রী বিতরণ সহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলায় আমাদের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী রয়েছে।

▣ কুরবানী প্রজেক্ট- এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি যেসব গ্রামে বা এলাকায় কুরবানীর গোশত পৌঁছায় না সেসব এলাকায় পৌঁছে দেওয়া এবং গরীব, মধ্যবিত্ত, নিম্ম মধ্যবিত্ত সবার কাছে কুরবানীর গোশত পৌঁছে দেওয়ার।

এছাড়াও কর্দে হাসানা ব্যবস্থাপনা, ইসলামিক ওয়াফক/ইনভেস্টমেন্ট সহ আরো কিছু প্রজেক্ট পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যকে বিভিন্নভাবে নিয়ামত দিয়ে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। কাউকে দিয়েছেন জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, কাউকে দিয়েছে প্রাচুর্যতা এবং কাউকে দিয়েছেন সময়ের নিয়ামত। আমরা প্রত্যকে নিজস্ব যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আলোকে প্রচেষ্টা চালালে ভালো কিছু সমাজ ও উম্মাহকে উপহার দিতে পারবো। ইনশাআল্লাহ্।

মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org